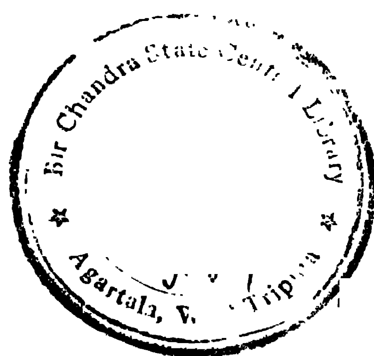
রাশিয়ায় শ্রীকৃষ্ণ
রাশিয়ায় শ্রীকৃষ্ণ
রাশিয়ায় শ্রীকৃষ্ণ
রাশিয়ায় শ্রীকৃষ্ণ
রাশিয়ায় শ্রীকৃষ্ণ
রাশিয়ায় শ্রীকৃষ্ণ
রাশিয়ায় শ্রীকৃষ্ণ
রাশিয়ায় শ্রীকৃষ্ণ
রাশিয়ায় শ্রীকৃষ্ণ

রাশিয়ায় শ্রীকৃষ্ণ

সুরেশচন্দ্র সাহা





মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু
হাওড়া

ব্লক
মডার্ন প্রসেস
কলেজ রো
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯

মুদ্রক
শ্রীবংশীধর সিংহ
বাণীমুদ্রণ
১২ নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা-৯।

কুড়ি টাকা

উৎসর্গ

আচার্যপাদ জয়পতাকা স্বামী

মহারাজেষু

এই লেখকের অন্যান্য বই

প্লাসনস্তের দেশে
ঘুরিফিরি সাগরে
সাত সাগর পেরিয়ে
মিসিসিপি উজিয়ে
চেরিফুলের দেশে
চেরিফুলের দেশে কুড়ি বছর আগে, কুড়ি বছর পরে
অস্ট্রেলিয়ার অন্তরে
মালয় থেকে মালয়েশিয়া
জলতরঙ্গ
শান্তিপুর লোকাল
দেশবিদেশে
রম্যপুরী আমস্টারড্যাম
হিমালয় যখন টানে
গৃহ প্রবেশের রাতে (প্রঃ অঃ)

মুখবন্ধ

আগে রাশিয়া ছিল সাধারণ মানুষের পক্ষে দুঃখের দেশ, ক্লেশের দেশ, মানবাত্মার অবমাননার দেশ। বিপ্লবের পর ঘটল তার মানস মুক্তি। রাশিয়ার নাম হলো তখন সোভিয়েৎ দেশ। ক্রমে সরকারি খরচে দেশের সবার শিক্ষা আর চিকিৎসার ব্যবস্থা হলো, বেকারি বলতেও দেশে আর কিছু রইল না। শেষপর্যন্ত আমেরিকার মতো সোভিয়েৎ দেশও হলো সুপার পাওয়ার।

এ সব আসলে তার বৈষয়িক অগ্রগতি। কিন্তু ভালো খেয়ে ভালো পরে বেঁচেবর্তে থাকার চেয়েও জীবনের অন্য একটি ব্যাপার আছে—সে তার সুমহৎ সত্তার উপলব্ধির পথে এগোবার জন্য অধ্যাত্ম তৎপরতার দিক, যা নিয়ে না-আমেরিকায়, না-রাশিয়ায়, না-কোথাও আহার-নিদ্রা-আমোদ লক্ষিত সাধারণ মানুষ মাথা ঘামায়। বিগত কুড়ি বছর কিন্তু কৃষ্ণভাবনা সঙ্ঘের (ইস্কনের) সংস্পর্শে এসে পাশ্চাত্যের লক্ষ লক্ষ লোক আধ্যাত্মিকতার পথে অনেক এগিয়ে গিয়েছেন, অশান্ত মনে অনেক শান্তি পেয়েছে।

শেষপর্যন্ত নাস্তিকের দেশ লাল রাশিয়াতেও কৃষ্ণভাবনা অনুপ্রবেশ করে ইস্কনের তৎপরতায়। এবং কৃষ্ণভক্ত হবার জন্য বহু লোক কারাদণ্ডিত হয়ে দুঃসহ দুঃখ লাঞ্ছনার মধ্যে দিন কাটাতে শুরু করেন ; তবু কৃষ্ণভক্তি বিসর্জন দেবার কথা তাঁরা ভাবতেও পারেন না। শেষ পর্যন্ত মহামতি গর্বাচভের আমলে তাঁদের দুঃখাবসান হয়—ইস্কন বৈধ ঘোষিত হলে যাঁরা কারামুক্ত তাঁরা সারা সোভিয়েৎ দেশে কৃষ্ণভাবনা, কৃষ্ণভজনা কৃষ্ণপ্রচার করতে শুরু করেন। নিঃশঙ্কায়, নির্ভয়ে সোভিয়েৎ দেশের জেলে কৃষ্ণভক্তদের কঠোর নির্যাতন সইতে হয়েছে ঠিকই কিন্তু তার অর্থ এই নয়, পৃথিবীর অন্য দেশের জেলে কয়েদীরা খুব দুধে-ভাতে থাকে। জেল তো জেলই। গান্ধী নেহেরু নেতাজীরা জেল খেটেছিলেন দেশের স্বাধীনতার জন্য, যে স্বাধীনতা দেবার ইচ্ছা বৃটিশের ছিল না। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রমটাই ছিল বৃটিশ নীতিবিরোধী। স্বাধীনতার ঠিক পরবর্তী অবস্থা দেখুন—কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যোগ থাকলে কারও তখন সরকারি চাকরিই মিলত না। এই বঙ্গভূমিতে এখন তা ভাবা যায় ? আসলে সব কিছু নীতির প্রশ্ন—নীতির পরিবর্তন ঘটলেই অবস্থা পাল্টায়। গর্বাচভের আগে সোভিয়েৎ সরকার কৃষ্ণচেতনা আন্দোলনকে ভালো চোখে দেখতেন না—ঈশ্বর চিন্তার বিরোধিতা করা ছিল তাদের নীতি। গর্বাচভের নীতি তা নয়, কৃষ্ণ-ভক্তরা তাই মুক্তি পেয়েছেন। জেল থেকে। নির্যাতন থেকে। এইসব কথাগুলো ভেবে দেখবার দরকার আছে।

আরও ভাববার কথা, দুঃখ-যন্ত্রণা-নির্যাতনের মধ্যে কারা-বন্দীরা শ্রীকৃষ্ণকে আঁকড়ে থেকেছেন, এমন কি, মুক্তির পর গৃহহীন জীবিকাহীন হয়ে পড়লেও তাঁরা কৃষ্ণনাম জপ-ধ্যান-কীর্তন করা ছাড়েন নি। মহাকাশ যুগের পৃথিবীতে এ এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা !

লেখক

যাঁর অনুপ্রেরণায় ঃ

শ্রীকীর্তিদাস অধিকারী প্রভু

ঋণস্বীকার ঃ

শ্রীঅদ্রিধরণ দাস অধিকারী

শ্রীসঙ্কর্ষণ দাস অধিকারী

শ্রীবঙ্কিম রায় দাস অধিকারী

১

কৃষ্ণভক্ত রাশিয়াতে—সে কি কথা ?

কেন, আমেরিকানরা কৃষ্ণভক্ত হতে পারে ! অস্ট্রেলিয়ানরা হতে পারে—রাশিয়ানরা হতে পারে না ?

কিন্তু রাশিয়ার লোক তো কম্যুনিস্ট—

কম্যুনিস্ট তাই কি ? আমেরিকার লোক তো ক্যাপিটালিস্ট !

এমনি ধরনের কিছু বাকবিতণ্ডা আমাদের কানে এসেছে, এখনও আসে। সম্প্রতি সুবিধাজনক উপলক্ষটিও আবার হাতের কাছে এসে হাজির হয়েছে, সোভিয়েৎ দেশে কৃষ্ণভক্তদের কারামুক্তি এখন বিশ্বময় মানুষের বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। কবে, কখন, কেমন করে রাশিয়ায় ইস্কন অনুপ্রবেশ করেছিল, রুশ কৃষ্ণ সন্ন্যাসীরা কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণধ্যান কৃষ্ণকীর্তন শুরু করেছিলেন, তার রহস্য আমরা অনেকেই জানি না—শুধু জানি কৃষ্ণ ভজতে গিয়ে সনাতন ধর্ম দীক্ষিত ভক্তদের ক্লেশকর কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল। এবং মহামতি গর্বাচভের আ[illegible]ন তাঁদের কারামুক্তি ঘটেছিল। রাশিয়ান কৃষ্ণভক্ত-দের নিয়ে তাই সারা পৃথিবীর মানুষের মনে অনেক প্রশ্ন, অনেক কৌতূহল জেগে উঠেছে।

পাশ্চাত্যের দেশে দেশে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করেছিলেন কৃষ্ণকৃপামূর্তি অভয়চরণ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ; সত্তর বছর বয়সে শুধু কৃষ্ণভক্তির জোরে তিনি আমেরিকা জয় করেছিলেন—দলে দলে আমেরিকান নারীপুরুষ যুবকযুবতী বৃদ্ধবৃদ্ধা তাঁর শিষ্য হয়েছিলেন, ধুতিশাড়ি পরে নিরামিষভোজী হয়ে তাঁরা কৃষ্ণভজনা করতে শুরু করেছিলেন। আর তখনই আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইণ্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনশাসনেস বা ইস্কন প্রভুপাদ স্বয়ং তার প্রতিষ্ঠাতা আচার্য। ইস্কনের শাখা ক্রমে

দক্ষিণ আমেরিকা ইউরোপ অস্ট্রেলিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—কোন্ অজ্ঞাতে সারা পৃথিবী কৃষ্ণচেতনায় জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। এবং তখন থেকেই কিছু কিছু মতলববাজ লোক সাহেব-ভক্তদের সি-আই-এর চর বলতে শুরু করেছিল।

রাশিয়ায় কৃষ্ণভক্তির জোয়ার এসেছিল প্রভুপাদের মস্কো আগমনের দিন থেকেই। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্ডোলজির বিভাগীয় কর্তা অধ্যাপক কটভ্স্কির আমন্ত্রণে প্রভুপাদ সেখানে গিয়েছিলেন। কৃষ্ণ ভাবনার বীজ তখনই সোভিয়েৎ দেশের মাটিতে প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল—তারপর ক্রমে ক্রমে সারা দেশে কৃষ্ণচেতনার আন্দোলন প্রসার লাভ করেছিল। খুবই সঙ্গোপনে। কৃষ্ণভক্তদের সতর্ক পদসঞ্চারে। আমেরিকার প্রথম যুগের কৃষ্ণভক্তদের মতো রাশিয়ানদের বেশির ভাগই বড় ঘরের লোক, অনেকেই ভারি ডিগ্রীধারী শিল্পী বিজ্ঞানী স্থপতি। অনেকেই বেশ চিন্তাশীল মানুষ। সুতরাং সাময়িক হুজুগের বশে কৃষ্ণকে মাথায় তুলে নেবার মতো মোটেই তাঁরা নন। একটা বিশেষ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে—আমেরিকা বা অন্য কোনো দেশে শুধু কৃষ্ণভক্ত হবার জন্যই কাউকে জেলে যেতে হয় নি, কিন্তু রাশিয়ায় হয়েছে। পুলিশ-ভীতি কারাদণ্ড কৃচ্ছ্র সাধন সোভিয়েৎ কৃষ্ণ সন্ন্যাসীদের ছিল সাথের সাথী।

প্রথম দিকে আমাকে রাশিয়ায় যেতে হয়েছিল। প্রভুপাদের 'ভগবদগীতা এ্যাজ ইট ইজ' বইখানা এক রাশিয়ান বন্ধুকে আমি উপহার দেবার চেষ্টা করেছিলাম—আসলে ওটা ছিল রাশিয়ানে অনুদিত সংস্করণ। কারাদণ্ড পাবার ভয়ে বইটি তিনি নিতে সাহস করেন নি। মস্কোতে তখন মিখাইল গর্বাচভ সগৌরবে বিরাজ করছেন, পেরেস্ত্রৈকা, গ্লাসনস্ত কথা দুটো লোকের মুখে মুখে ফিরছে, তাদের মনেও খুব ধরেছে—কিন্তু নিত্য দিনের জীবনে তা কতখানি প্রভাব বিস্তার করবে তা নিয়ে কোনো স্পষ্ট ধারণা কেউ করতে পারছে না। বহু কৃষ্ণভক্ত তখন সোভিয়েৎ কারা প্রাচীরের আড়ালে রয়েছেন, অশেষ লাঞ্ছনার মধ্যেও অবিরাম কৃষ্ণনাম করছেন এবং বাকি দুনিয়ার মানুষ তাঁদের কারামুক্তির দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন।

শেষ পর্যন্ত শুভদিন এগিয়ে এলো   জুন মাসে, গর্বাচভের সুবিবেচনায় রুশ দেশে ইস্কন বৈধ ঘোষিত হলো। সেদিন বিশ্বে সে কি কলরব!

ফেব্রুয়ারীতে কারা মুক্তির পর সোভিয়েৎ ভক্তরা প্রথমে ভারত আগমনের সিদ্ধান্ত করলেন—স্থির হলো, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্যের দেশের ধূলি গায়ে মেখে তাঁরা যাবেন কুম্ভমেলায় যোগদান করতে। দুঃখের কথা, কুম্ভ-মেলায় যাওয়া তাঁদের হলো না—

দোষ তো মস্কোর ভারতীয় দূতাবাসের, ইস্কনের এক বিদেশী সদস্য খুব উষ্মার সঙ্গে আমাকে বললেন—'সেভিয়েৎ সরকারের "অবিলম্বে" পাশপোর্ট প্রদানের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সুর মিলিয়ে ভারতীয় দূতাবাস বললেন, তারাও "অবিলম্বে" ভিসা দেবার ব্যবস্থা করবেন—'

'আসলে ব্যাপারটিকে মস্কোর ভারতীয়রা খুব হাল্কা করে দেখেছিলেন। তারা ধরেই নিয়েছিলেন, সোভিয়েৎ সরকার যে কোনো অছিলায় শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণভক্তদের পাসপোর্ট দেবেন না, সুতরাং ভিসা দেবারও প্রয়োজন পড়বে না—'

'শেষ পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সোভিয়েৎ সরকারের লোক ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে উনষাটটি পাসপোর্ট তৈরী করে ফেললেন—ভারতীয় দূতাবাস স্বভাবতই লজ্জাকর বেকায়দায় পড়ে গেলেন—'

'গর্বাচভই আসল কৃষ্ণভক্ত, ভদ্রলোক এবার আমাকে একটি বেকায়দা প্রশ্ন করলেন—'কিন্তু' শ্রীকৃষ্ণের দেশের লোক এমন ব্যবহার কেন করেছে বলতে পারেন?'

আমি বলতে পারলাম না। কিন্তু সে থাক। আমাদের এখন বিবেচ্য বিষয় সোভিয়েৎ ভক্তদের নেপথ্য ইতিহাস—সেই ইতিহাস অবিচল কৃষ্ণভক্তির ইতিহাস, কারাগারে নির্যাতনের ইতিহাস বহিঃপৃথিবীতে প্রায় অজ্ঞাত সোভিয়েৎ প্রশাসনিক ইতিহাস। কারামুক্ত কৃষ্ণভক্তদের সঙ্গে ব্যবস্থামত সময় এবং বাঞ্ছিত ধৈর্য নিয়ে বসে সেই ইতিহাস শোনার সৌভাগ্য আমার একটু হয়েছে—এবং তাই সবাইকে এখন একটু শোনাতে চাই।

অবশ্য আগে একটুখানি উপক্রমণিকা রচনার প্রয়োজন আছে—বিগত কুড়ি বছর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইস্কন সঞ্চালিত কৃষ্ণচেতনার যে উপপ্লব আমি স্বচক্ষে দেখেছি, তার একটু পরিচয় প্রথমে না দিলেই নয়—সোভিয়েৎ দেশেও কৃষ্ণভাবনার প্লাবন যে অপ্রত্যাশিত নয় সেই কথাটি বুঝতে তা সাহায্য করবে। কৃষ্ণচেতনার কথা আসলে আগুনের ফুলকির মতো, রাশিয়ান ভাষায় যাকে বলে ইস্ক্রা—বিশ্বময় তা যে ছড়িয়ে পড়বে তাতে আর আশ্চর্য কি !

আমি ছিলাম তখন হল্যাণ্ডের আমাস্টারড্যামে যেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে চতুর্দশী ইহুদী কন্যা এ্যানা ফ্র্যাঙ্ক হিটলারী তাণ্ডব স্বচক্ষে দেখেও ডাইরিতে লিখেছিলেন—আমি বিশ্বাস করি অন্তঃকরণের দিক দিয়ে সব মানুষই আসলে ভালো ইত্যাদি।—তাঁর লুকিয়ে থাকা বাড়ি আমি খুঁজে বের করেছিলাম—

অমর শিল্পী রেমব্রাণ্টের বাড়িতেও আমি তখন যাতায়াত করছিলাম অবশ্য কিছু তথ্যানুসন্ধানে। হল্যাণ্ডে তখন সেক্স নিয়ে নরক সৃষ্টি হয়েছে, শহরের পথে পথে অনেক সেক্স-শপ গজিয়ে উঠেছে। রেমব্র্যাণ্ট। এ্যানা ফ্র্যাঙ্ক মাথায় যখন খুব তোলপাড় করছিল, সেক্স-শপ, সেক্স-সিনেমা, সেক্স-লক্ষিত লোকের হালচাল মনে যখন খুব আলোড়ন এনেছিল, ঠিক তখন একদিন আমস্টারড্যামের রাজপথে দাঁড়িয়ে শুনতে পেলাম প্রেমানন্দে গাওয়া একটি সঙ্কীর্তন গান, পার্থসারথির মঙ্গলশঙ্খের মতো। জনাকয় শ্বেতাঙ্গ যুবক হাত তুলে মহানন্দে নেচে নেচে ছন্দে ছন্দে গাইছিলেন—হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রামহরে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রায় পাঁচশ বছর আগে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, কৃষ্ণনাম পৃথিবীর প্রতি গ্রামে, প্রতি শহরের ঘরে ঘরে একদিন গীত হবে। হল্যাণ্ডের প্রাচীন রাজধানী আমস্টারড্যামে দাঁড়িয়ে মনে হলো, সেই দিন কি আগত ঐ !

শেষ সপ্তাহের নভেম্বর মাস। দিন কয়েক আগে বাল্টিক অঞ্চলের পোল্যাণ্ডে বরফপাত হয়ে গেছে। হল্যাণ্ডে তখনও বরফ

না এলেও শীত খুব বেশী। কারও কিন্তু ভ্রুক্ষেপ নেই—গেরুয়া ধুতি পরে, তুলসীর মালা গলায় দিয়ে, কপালে লম্বা তিলক এঁকে শিখাধারী মুণ্ডিত মস্তক স্মিতহাস্য পাশ্চাত্য সন্ন্যাসীরা দিব্য ভাবের আবেশে গেয়ে চলেছেন কৃষ্ণনাম। তাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো, আর পাঁচটি মুখের চেয়ে যেন আলাদা, একেবারে অনাবিল আনন্দে উদ্ভাসিত। মাস চারেক আগে কলকাতার রাজপথে ছোট একটি কীর্তনীয়া দলের পুরোভাগে ধুতি পরা শিখাধারী এক সাহেবকে কৃষ্ণ নাম গাইতে দেখে ভারি কৌতুকবোধ করেছিলাম। মনে মনে বোধহয় বলেছিলাম। যতো সব বুজরুকি! এবার ইউরোপের মাটিতে নিদারুণ আধুনিকতার মধ্যে পাঁচ শত বছর আগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রচলিত খোল-করতাল বাদ্যের তালে তালে গাওয়া কৃষ্ণনাম শুনে মনে হলো, ব্যাপারটি একটু যাচাই করে না দেখলেই নয়—
সেদিন ছিল রবিবার অনেকেই আমস্টারড্যামের শহরতলী ফ্রিজেনস্টেইনের মন্দিরে এসেছেন আমারই মতো রাস্তায় শোনা কৃষ্ণনামের আকর্ষণে। মন্দির বলতে ছোট একটি নবনির্মিত ফ্ল্যাট, ভারতীয় ধরনে মেঝেয় শোবার এবং জোড়াসনে বসবার ব্যবস্থায় দুরস্ত। বড় একটি কক্ষের মেঝেতে পরিপাটি আসনে সর্পাষদ শ্রীচৈতন্যদেবের নিত্য পূজা পাওয়া একখানি ছবি রয়েছে—কাছেই ধূপ-চন্দন পুষ্পপাত্রে ফুল। একটি খোল, নামাবলী ইত্যাদি কিছুই বাদ নেই। কক্ষের দেয়ালে ঝুলছিল শ্রীকৃষ্ণের চারখানি ছবি—মুরলীধারী, রাধিকাবন্ধন, ধেনুপ্রিয় এবং সখা অর্জুনসহ শ্রীকৃষ্ণ। চৈতন্যদেবের ছবির পাশে আরও একটি নিত্য পূজিত ছবি ছিল—প্রভুপাদ অভয়চরণারবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামীর পটচিত্র। তিনি গৌড়ীয় মঠের একাদশ আচার্য এবং ইস্কনের প্রতিষ্ঠাতা—অধুনা বহির্বিশ্বে যে কৃষ্ণনাম প্রচারের মূল নায়ক তা তো আগেই বলেছি।
ফ্রিজেনস্টেইন মন্দিরের অধ্যক্ষ সুবল মহারাজ আমেরিকান এবং স্বয়ং প্রভুপাদের নিকট তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। বাদবাকি সন্ন্যাসীদের কেউ আমেরিকান, কেউ বা ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ। তাঁদেরই একজনের নাম কৃষ্ণদাস, অপর আর একজন ধনঞ্জয়। অবশ্য অনেকের তখনও নাম-

করণ হয় নি। স্কটল্যাণ্ডের লোক ধনঞ্জয় আগে ছিলেন কাস্টম্‌স্ অফিসার তাঁর স্ত্রীও লণ্ডনের একটি মঠের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। ধনঞ্জয়কে প্রশ্ন করলাম—কি করে হঠাৎ এর মধ্যে জড়িয়ে পড়লেন? সঙ্গে সঙ্গে জবাব এলো—'যেমন করে আজ আপনারা এখানে এসেছেন, রাস্তায় কৃষ্ণনাম শুনে।' নিজের কথার সূত্র ধরে আবার তিনি বললেন—লণ্ডনের রাস্তায় প্রথম যেদিন কৃষ্ণনাম শুনেছিলাম, তার সুরটি বড় ভালো লেগেছিল। অবাক হয়ে দেখেছিলাম কৃষ্ণনামে আত্মহারা সন্ন্যাসীদের, বেশ লক্ষ্য করেছিলাম তাঁদের মুখ গভীর প্রশান্তি আর অনাবিল আনন্দে ভরা—সমাজ-সংসার-পরিজনের চিন্তার ছাপ তাতে একটুও নেই। তারপর থেকে সেই মুখ যতবার মনে পড়েছে, ততবার আমার মন অকারণ খুশিতে ভরে উঠেছে। পরের অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছেন—

ধনঞ্জয়ের কথা শুনে মনে পড়ল আমাদের দেশের অতি পরিচিত একটি কথা—পূর্ব জন্মে থাকলে ভাগ্য, বিষয় ছেড়ে হয় বৈরাগ্য!

বিশেষ কোনো জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা নয়। বেদবেদান্তের কোনো গুহ্যাতি গুহ্য আলোচনা নয়। বিশেষ কোনো প্রচারের চেষ্টাও নয়—ফ্রিজেনস্টেইনের মন্দিরের ঘণ্টা কয়েক চলল শুধু হরেকৃষ্ণ সঙ্কীর্তন, খোল-করতাল আর তান-পুরা বাজিয়ে। অবশ্য তারই মাঝে চলছিল নানা আলোচনা, প্রশ্নোত্তর। মনে হলো, বেদ উপনিষদ ভগবদগীতা ইত্যাদি যে শুধু পড়া আছে তাই নয়। বিষয়বস্তু তাঁদের ধ্যানে-ধারণায় একেবারে সম্পৃক্ত হয়ে আছে। কথায় কথায় কত সহজে সন্ন্যাসীরা সমাধি, মায়া, গুরু, কর্ম, বেদান্ত, অদ্বৈতবাদ, প্রসাদম ইত্যাদি শব্দগুলো উচ্চারণ করছিলেন এবং তাঁদের অর্থসঙ্গত ব্যবহারও করছিলেন। আমি কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলাম—'সন্দেহ নেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতার শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তাঁর পরবর্তী কালে আরও একজন শক্তিশালী অবতার পুরুষ বাংলায় তো আবির্ভূত হয়েছিলেন—'

ধনঞ্জয় সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন—'কিন্তু তাঁর কথা তো কোনো শাস্ত্র গ্রন্থে উল্লেখ নেই, যেমনটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব সম্বন্ধে শ্রীমদ-ভাগবতের একাদশ অধ্যায়ে নিশ্চিত ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে—কলিযুগে

সর্বগুণময় যে ভগবানের আবির্ভাব ঘটবে তাঁর গাত্রবর্ণ হবে স্বর্ণ দ্যুতিময়, মুখে তাঁর সদা উচ্চারিত হবে কৃষ্ণনাম।'

আকাশে তখন পুঞ্জীভূত ঘন মেঘ জমে রয়েছে। ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে—প্রবল শীতের তাণ্ডব চলছে। এদিকে মন্দিরের মধ্যে ধূপ-ধুনোর গন্ধে, কীর্তনে, কৃষ্ণ কথার আলোচনায় কৃষ্ণচেতনার একটি ভাবপ্রবাহ বইছে। সুবল মহারাজ বললেন—আপনারা কি সারাটা দিনের মধ্যে শুধু ঘণ্টাখানেক সময় শ্রীকৃষ্ণের জন্য ব্যয় করতে পারেন না? কারও জবাব নেই।

সুবল মহারাজের মুখটি তখন খুব জ্যোতিষ্মান দেখাচ্ছিল। গভীর প্রত্যয়ে এবার তিনি বললেন—ঠিক আছে, কোনো বাঁধাধরা নিয়মের দরকার নেই—উঠতে-বসতে-শুতে আপনারা যখন যেখানে খুশি উচ্চারণ করবেন শুধু কৃষ্ণের নাম—কৃষ্ণ নামে সব পাপ তাপ দূর হয়ে যায়। অথচ কোনো পয়সা খরচ নেই। তাঁর কথার ভঙ্গিতে মাধুর্যে সরলতার পরিস্ফুটনে মনে হলো, সবার প্রাণেই কথাগুলো খুব ধরেছে, সবার মন-চিন্তা ঐদিকে কেন্দ্রিত হচ্ছে।

চৈতন্যদেবের মধুময় জীবন কথা, সরল সুন্দর বাণী, কৃষ্ণনামের সঙ্কীর্তন ষোড়শ শতাব্দীর ভারতবর্ষকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন; এখন তা-ই আবার পাশ্চাত্য দেশে প্লাবন ঘটাতে চলেছে। আমেরিকার অশেষ ভোগ-ঐশ্বর্য। এবং কামাচার কণ্টকিত সমাজ থেকে কিছুদিন আগেই বের হয়ে এসেছিল নবীন একটি দল, যাকে বলে হিপ্পি সম্প্রদায়। হিপ্পিরা কিন্তু পথের সন্ধান করতে গিয়ে পথ হারাল, আত্মোপলব্ধির শর্ট-কাট পথ খুঁজতে গিয়ে প্রেম ও সুন্দরের সন্ধান আর তারা পেল না। হল্যাণ্ডের ফ্রিজেনস্টেইনে বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের দেখে কিন্তু মনে হলো, কৃষ্ণচেতনার আন্দোলন একটা সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাস মাত্র নয়—হয়তো এর মধ্য দিয়েই পশ্চিম জগতের সত্য সন্ধানীরা একদিন পথ খুঁজে পাবেন। আর আমরা? আমরা হয়তো তখন অশেষ তর্কে প্রবৃত্ত হব—আমরা ওঁদের পথ দেখিয়েছি, নাকি ওঁরা আমাদের এখন পথ দেখাচ্ছেন!

সপ্তাহের অন্যদিনে সন্ন্যাসীরা বেশির ভাগ সময় বাইরে কাটান। প্রচারের কাজে ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু রবিবার অন্য কথা—রবিবারে মহাসমারোহে মহাপ্রভুর ভোগ হয়, নামকীর্তন হয়, সমাগত সর্বজনে প্রসাদ বিতরণ হয়। সেদিন মন্দিরের মধ্যে যখন সঙ্কীর্তন খুব জমে উঠেছিল, আর ফাঁকে ফাঁকে নানা আলোচনা চলছিল, তখন ভোগ রান্না অনেক দূর এগিয়েছে। ভোগের ঘর থেকে আলু-ছেঁচকিতে জিরে-লঙ্কা ও সম্বরার ঝাঁঝ আসছিল। সবাই খুব কাশছিলেন। ধনঞ্জয় বললেন—কৃষ্ণ ভাবনা আন্দোলনের সঙ্গে খাদ্যা-খাদ্যের সম্বন্ধটা খুব গভীর। পেঁয়াজ রসুন মাছ মাংস বর্জিত সাত্ত্বিক আহারই কৃষ্ণচেতনা উন্মেষের উপযোগী এবং রান্নার প্রণালী আর তার নানা উপকরণেরও অনেক গুণ আছে। যে জিরের ঝাঁঝে আপনারা এখন কাশছেন, তা আসলে খাদ্যের মধ্য দিয়ে অন্তরসুদ্ধি করতে সাহায্য করে, ভেতরের সব ক্লেদ ঝাঁঝিয়ে তাড়িয়ে নির্গত করে দেয়। আমাদের পরমা-রাধ্য গুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদের প্রদর্শিত প্রণালীতেই আমরা রান্না করি—আর আমাদের সব রান্নাই তো আসলে ভোগ রান্না—'

ধনঞ্জয়ের কথাগুলো সমাগত আগন্তুকরা খুব মনোযোগ আর উৎসাহ নিয়ে শুনছিলেন।

এবার ঠাকুরের সামনে রাখা হয়েছে লুচি, পায়েস, আলুছেঁচকি, মটরশুঁটির সিঙাড়া, গুঁড়ো দুধ আর চিনি মাখনে তৈরি লাড্ডু। এটি আসলে সন্দেশের বিকল্প। ধনঞ্জয় পূজায় বসলেন। পূজার শেষে ভোগ নিবেদন করলেন। কৃষ্ণ নামের সঙ্কীর্তন তো চলছিলই। আমস্টারড্যামের শহরোপ-কণ্ঠে ফ্রিজেনস্টেইনের মন্দিরে ইংরেজ, ফরাসী, আমেরিকান, ওলন্দাজ, ইহুদী এবং জার্মান মানুষের মিলিত কণ্ঠের কৃষ্ণনাম শুনে মনে হলো, চৈতন্য যুগের নদীয়ার পথে দাঁড়িয়ে যেন কৃষ্ণনাম শুনছি। যথারীতি ভোগ নিবেদনের সময় পরিষ্কার বাংলায় সন্ন্যাসীরা গাইলেন—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ/শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ—'

পরবর্তী গান—'ভজ গোবিন্দ, গোবিন্দ, গোপাল।' শেষ পর্যন্ত 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।' কীর্তনের শেষে সবাই মাটিতে মাথা

ঠেকিয়ে প্রণত হলেন। সুবল মহারাজ খোল-ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে বললেন—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ কি, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কি, শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ কি ; বাকি সবাই সমস্বরে উচ্চারণ করলেন জয়, জয়, জয়। তার পর অবিচ্ছিন্ন করতাল ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারিত হলো সম্মিলিত কৃষ্ণ জয়ধ্বনি, প্রভুপাদ জয়-ধ্বনি।

সুদূর পূব বাংলার এলাসিন গ্রামে প্রতিবছর আট ষোড়শ অথবা চব্বিশ প্রহর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্তনের শেষে 'মচ্ছব' হতো—আর সেই উপলক্ষে নানা-রকমের ভোগ-সমর্পণ গান আমরা শুনতে পেতাম। দুরন্ত তমো এবং রজোগুণ আশ্লিষ্ট ইউরোপে কৃষ্ণচেতনায় উদ্বুদ্ধ ভক্তদের মধ্যে বসে ভোগ নিবেদনের গানে সেদিন যেন এলাসিনের সেই অপূর্ব সুরটিই শুনতে পেলাম। অভিনন্দন জানাবার মতো করে সন্ন্যাসীদের বললাম—'ভারতের শ্রীকৃষ্ণ এবং হিন্দুর সাধন ভজন পদ্ধতি আপনারা তো খুব সুন্দর ভাবে আত্মসাৎ করেছেন—'

সঙ্গে সঙ্গে ধনঞ্জয় প্রতিবাদ করে বললেন—'শ্রীকৃষ্ণ ভারতের নয়, সমগ্র জগতের ; সাধন ভজন পদ্ধতি হিন্দুর নয়, বৈদিক !'

এবার শুরু হলো প্রসাদ বিতরণ ; তবে সেই প্রসাদ কণিকামাত্র নয়, যার যত ইচ্ছা মাত্র। সবাই কোলের উপর প্লাস্টিকের প্লেট রেখে প্রচুর প্রসাদ খেলেন, পায়েস খেলেন হাত চেটে। ইউরোপ আমেরিকার সাহেবদের রান্না পায়েসে ছিল ভোগের প্রসাদের মধুর স্বাদ !

প্রসাদ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ভক্তদের ধারণা দেখলাম অতিশয় স্পষ্ট, তাঁরা বললেন—'প্রসাদ আত্মার খোরাক, দেহের খোরাক, মন ও চেতনার খোরাক—শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত হয় বলে প্রসাদে তার করুণার ছোঁয়া লাগে এবং সেই কারণে তা কৃষ্ণচেতনার উন্মেষক—'

জানি না এতো সব কথা মনে রেখে খাস চৈতন্য-ভূমিতে কজন আমরা প্রসাদ খাই। ওঁদের প্রসাদ খাওয়া দেখে আমার কিন্তু সেদিন মনে হলো, একটি পরম সত্যকে যেন ঐ কৃষ্ণভক্তরা হাত দিয়ে ধরে ফেলেছেন। এবং সরল ভক্তির সঙ্গে, দিব্য আনন্দের সঙ্গে তা দেহের রক্তধারার মধ্যে

সঞ্চালিত করে দিচ্ছেন মুখের ভেতর দিয়ে, যে মুখ কৃষ্ণনাম, চৈতন্য নাম, গৌর ভক্তবৃন্দের নাম করে ধন্য হয়।

ঐদিন শক্তি প্রমত্ত ইউরোপে অমন ভক্তি প্লাবিত কৃষ্ণকীর্তন দেখে আমার মনে একটি প্রশ্ন এসেছিল—ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকার অনেক দেশেই তো শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভবিষ্যৎ বাণী সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু কম্যুনিস্ট দেশে, বিশেষ করে সাম্যবাদের তীর্থভূমি রাশিয়ায় কি তা সম্ভব?

আশ্চর্য, এর মাত্র সাত মাস পর রাশিয়ায় গিয়ে স্বয়ং প্রভুপাদ কৃষ্ণ চেতনার বীজ বপন করে এসেছিলেন!

২

হল্যাণ্ডে ইস্কনের কৃষ্ণ সন্ন্যাসীদের প্রেমভাক্তর যে আন্তরিকতা আমি দেখেছি তাতে আমার বিস্ময়ের সীমা ছিল না—তাঁদের বাক্যে, মনে-চিন্তায় যে একাগ্রতা ছিল তার তুলনা খুঁজে পাই নি। হল্যাণ্ডের পর পৃথিবীর অন্য অনেক দেশে আমি গিয়েছিলাম। এবং একটি কথা সর্বত্রই আমি মনে রেখেছিলাম—ইস্কনের লোকদের আরও একটু অনুসরণ করে দেখতে হবে, মন্দিরে মন্দিরে গিয়ে লক্ষ্য করতে হবে, ইস্কনীদের সবাই অত অকপট কিনা, নীতি ও অনুশাসন একই রকমভাবে সবাই সর্বত্র মেনে চলেন কিনা—

একটি কথা এখানে না বললেই নয়—প্রথম দিকে আমি ইস্কনের শুধু দোষ খুঁজে বেড়াতাম, সম্ভবত তাঁদের সি-আই-এ-সংযোগের বহুল প্রচারিত গুজব আমার মনটাকে ঘাটি করে দিয়েছিল। এমনকি হল্যাণ্ডের দুবছর পরও তাঁদের যাচাই করে দেখার মতলবে নিউইয়র্ক ইস্কন-মন্দিরের ডরমেটারিতে আমি ঢুকে পড়েছিলাম, বিনা অনুমতিতে এবং নেহাৎ—না-জানি-কি-দেখতে-পাব, মুখরোচক কোনো কাহিনীর সন্ধান পাব, বোধ হয় সেই আশায়। ঐ মন্দিরেই দুজন শিক্ষানবিশী কৃষ্ণভক্তের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। তরতাজা এই দুই তরুণ সন্ন্যাসী কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন সংস্কৃত পড়তেন। ডরমেটারিতে ঢুকেই আমি দেখতে পেয়েছিলাম, তাঁদের আসনের সামনেকার পুস্তক-দানে চৈতন্য চরিতামৃত খোলা রয়েছে—আসলে পড়তে পড়তে মুখ তুলে আমাকে দেখেই তাঁরা কথা বলতে শুরু করেছিলেন। আমি বাংলার লোক শুনে দুজনেই বললেন—'চৈতন্য চরিতামৃত থেকে গোটাকতক পৃষ্ঠা স্পষ্ট উচ্চারণে একটু যদি পড়েন, আমরা উপকৃত হই—

আমি কিছুই বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করি—কেন ?

'আমরা যে টেপ করে নেবো,' শান্তকণ্ঠে দু'জনেই বলেন—'আসলে সঠিক বাংলা উচ্চারণে আমরা যে চৈতন্য চরিতামৃত পড়তে পারছি না তা বেশ বুঝতে পারি। উচ্চারণটা তাই একটু দুরস্ত করে নিতে চাই—টেপ বাজিয়ে কান খাড়া করে মন লাগিয়ে পড়লে নিশ্চয় অনেক উন্নতি হবে—'

ওঁদের নিষ্ঠা দেখে আমার বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

এ হচ্ছে নিউইয়র্ক মন্দিরে আমার অভিজ্ঞতা। দুবছর পর ঐ মন্দিরে জ্যোতির্ময়ীর সঙ্গে দেখা হলে আরও একটু নতুন অভিজ্ঞতা হলো, যা আগে অন্যত্র আমরা উল্লেখ করেছি।* ফরাসী দেশের উনিশ বছর বয়সী মেয়ে, আগে নাম ছিল তার জোয়েল। সোরবর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে মানবজাতি বিজ্ঞান নিয়ে জোয়েল পড়াশোনা করত। এবং আর পাঁচজনের মতোই আহার নিদ্রা-দেহভোগ-কেন্দ্রিত খুব সাধারণ জীবন যাপনই করত। তবু মনে তার তখন কিছু প্রশ্ন এসেছিল—আমি কে, কেন পৃথিবীতে এসেছি, কোথায় ফিরে যাবো ইত্যাদি, যার জবার কেউ দিতে পারে নি। আর ঠিক তখন প্যারিসের রাস্তায় মুণ্ডিত শীর্ষ সৌম্যদর্শন ইস্কন-সন্ন্যাসীদের মুখে পরম প্রশান্তি লক্ষ্য করে জোয়েল তাঁদের সঙ্গে কথা বলল, তাঁদের পরামর্শেই লণ্ডনে উড়ে গিয়ে প্রভুপাদের সঙ্গে দেখা করল। প্রভুপাদ তাকে দীক্ষা দিলেন, পুরানো দিনের জোয়েল হলো জ্যোতির্ময়ী : প্রভুপাদ বললেন—নাম কর, কৃষ্ণকথা পড়, প্রসাদ খাও—

জ্যোতির্ময়ীর কাহিনী শোনার সময় আমি লক্ষ্য করেছিলাম, ব্রুকলীন, ম্যানহ্যাটন, নিউজার্সির দুরান্ত থেকে শতাধিক হঠাৎ দর্শক এসে লুচি-আলুরদম-পায়েসের প্রসাদ খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহকে প্রণাম করছে, আর জ্যোতির্ময়ী কার যেন অর্দ্ধভুক্ত পরিত্যক্ত প্রসাদের পাত্র কুড়িয়ে কোলের উপর রেখে পরমানন্দে খেয়ে চলেছে! কারণ জানতে চাইলে জ্যোতির্ময়ী বলে—প্রসাদ ফেলতে নেই!

ইস্কনের হরেকৃষ্ণ শিক্ষা-চিন্তা-অভ্যাস এমন অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে সেই পনেরো

---

* মৎপ্রণীত 'মিসিসিপি উজিয়ে' গ্রন্থখানি দয়া করে দেখুন।

ষোল বছর আগেই এমনি করে দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। কিন্তু আমি আরও বছর পাঁচেক আগের কথা একটুখানি বলে নিই—শুধু জপ-তপ-শাস্ত্রপাঠ বা প্রসাদভক্ষণই নয়, ভারতীয় কিছু কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠানও ইস্কনীরা খুব নিষ্ঠা নিয়ে পালন করতে শুরু করেছিলেন। প্রসঙ্গত ১৯৬৭ সালে সানফ্রান্সিসকোয় রথযাত্রার কথা আমরা একটু বলতে চাই। ধুতি, শিখা, খোল, খড়ম, করতাল, উপবীত, ধূপ, নামাবলী, লুচি, পায়েস, এবং মহাপ্রভু মুখের কৃষ্ণনামের সঙ্গে, জগন্নাথ দেবের রথযাত্রার উৎসব স্পৃহাটিকেও ভারত থেকে ইস্কন টেনে এনেছেন, কারণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, আর শ্রীকৃষ্ণই জগন্নাথ দেব—ইস্কনীরা মনেপ্রাণে এই কথা বিশ্বাস করেন।

সানফ্রান্সিসকোয় তখন তিনটন ওজনের বিরাট রথ তৈরী হয়েছিল। ফুলমালায় আর গৈরিক পতাকায় সজ্জিত আড়াইতল বিশিষ্ট সেই রথের সর্বোচ্চ তলায় সুভদ্রা-বলরামসহ জগন্নাথদেব এবং পরের তলায় মখমল জোড়া মহার্ঘ সিংহাসনে স্বয়ং প্রভুপাদকে বসিয়ে দশহাজার উৎসাহী আমেরিকান ও ইউরোপীয় বৈষ্ণবভক্ত সেই রথ টেনেছিলেন। পুরোভাগে একশ ফুটের ব্যবধানে চৈতন্য মহাপ্রভুর দশফুট উঁচু একটি পট রেখে রথের সামনে সেদিন কৃষ্ণ নামের সঙ্গে সঙ্কীর্তনাবিষ্ট সাহেব সাধুরা যে রকম উদ্দাম নৃত্য করেছিলেন, পাশ্চাত্যে, বিশেষত আমেরিকার মাটিতে তা কি করে সম্ভব হয়েছিল, সে কথা অনেকের কাছেই রীতিমত গবেষণার বিষয়। প্রভুপাদ তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে সেদিন বলেছিলেন—'চৈতন্যদেব তাঁর জীবনের শেষ আঠারো বছর পুরীবাসী ছিলেন এবং প্রত্যেক বছরই রথযাত্রা উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। সমুদ্রমুখী রথ টানার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে গোলোক বৃন্দাবন যাত্রা। জগন্নাথদেব তাঁর ভক্তদের খুব ভালবাসেন। তাই এবার তিনি আমেরিকায় এসেছেন তোমাদের দর্শন দিতে। তোমরা তাঁকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ কর—'

কৃষ্ণভাবানন্দে নাচতে নাচতে উদ্বেল জনতা আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনি তুলল—জয় শ্রীকৃষ্ণ, জয় শ্রীচৈতন্য, জয় শ্রীল প্রভুপাদ—জয় গৌরভক্ত বৃন্দ!

মনে রাখতে হবে, এ হচ্ছে ইস্কন প্রতিষ্ঠার পরের বছরের ঘটনা—এত অল্প সময়ের মধ্যে ভারতীয় ধর্মাচার এবং আচরণ ইস্কনীরা কত সহজে রপ্ত করে নিয়েছিলেন।

এবার একটু ক্যানাডার কথা বলি। নিউইয়র্ক মন্দির দর্শনের তিন বছর পর মন্ট্রিয়েলের মন্দির পরিদর্শনের সুযোগ আমার হয়েছিল। গেরুয়াধারী সাহেব-সন্ন্যাসী, শাড়ি-সিন্দুর পরা ললিতা-বিশাখা-বিষ্ণুপ্রিয়া নামধারিণী মেম-সন্ন্যাসিনীদের দেখে আমার মনে হলো; ক্যানাডিয়ান ভক্তদের মতো মনেপ্রাণে অমন করে আর কেউ বোধহয় ধর্মাচরণ করে না, গীতা চৈতন্য ভাগবত বেদ-বেদান্ত পড়ে না। মন্দিরের কক্ষে কক্ষে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি, ঠাকুর দেবতার পট, ধ্যান-জপ-সঙ্কীর্তনের আয়োজন ছিল: যথারীতি প্রসাদ-চরণামৃত-সন্ধ্যারতির ব্যবস্থা ছিল। মন্দিরে সন্ন্যাসী সংখ্যা তখন ষাট এবং পরিবেশটি এমন, যেন পাঁচশত বছর আগেকার চৈতন্যযুগের নবদ্বীপে তাঁরা অধিষ্ঠান করছেন—শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা, শ্রীচৈতন্য তাঁদের মনের দেবতা, প্রাণের বিগ্রহ, প্রেমের ঠাকুর!

মঠাধ্যক্ষ তখন ক্লাশ নিচ্ছিলেন; তাঁর সামনে জন আটেক ব্রহ্মচারী জোড়াসনে বসে গীতা-ব্যাখ্যা শুনছিলেন—তাঁদেরই একজন নিত্যানন্দ। মায়াপুরে তীর্থযাত্রা করতে তিনি একেবারে মনস্থির করে ফেলেছেন—ক্লাশের শেষে কথাপ্রসঙ্গে তাই তো তিনি বললেন। 'গৌর পূর্ণিমার আর তো বেশি দেরি নেই' ব্রহ্মচারী নিত্যানন্দ বললেন—'মহাপ্রভুর আবির্ভাব' তিথিতে মায়াপুর দর্শনের চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কি হতে পারে। তীর্থ করা হচ্ছে ভক্তদের অবশ্য কর্তব্য।'

গৌরপূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী আর প্রভুপাদের আবির্ভাব দিবসে সারা পৃথিবী থেকে ইস্কনের ভক্তরা ভারতে আসেন তীর্থ করতে—মায়াপুর বৃন্দাবন জগন্নাথ পুরী দেখে পুণ্য সঞ্চয় করেন। শ্রীমায়াপুরে তখন ইস্কন বিরোধী পাষণ্ডদের আক্রমণ ঘটে গিয়েছে। নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারীকে বললাম—'কিন্তু এই গোলমালের সময়টাতে—'

'ওসব কিছু নয়,' আমাকে বাধা দিয়ে নিত্যানন্দ বললেন—'ও নিয়ে মাথা

ঘামাবার তো কোনো দরকার নেই—'

তখন তাঁর মনে কোনো উত্তেজনা, কোনো আলোড়নের চিহ্নও ছিল না—চোখে মুখে ছিল ধীর প্রশান্তি।

আমি সি-আই-এ প্রসঙ্গ তুলতেও একটু চেষ্টা করলাম, অন্তত নবীন সন্ন্যাসীর একটু অভিমত জানতে। ব্রহ্মচারী নিত্যানন্দ শুধু একটু হাসলেন, যেন ভাবখানা এই—আমেরিকান সি-আই-এ কি রাজনৈতিক দুষ্কর্ম করার জন্য অন্য কোনো স্থান খুঁজে পায় না যে শেষ পর্যন্ত ইস্কন মন্দিরে ঠাঁই করে নেয়। নিরামিষ খায়, মাথা কামিয়ে হরেকেষ্ট রাধাকেষ্ট করে—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর !—

ইউরোপ, আমেরিকার ক্যানাডার মন্দিরগুলিতে আমার অভিজ্ঞতার কথা বলার পর এবার বলব ক্যানাডার

পর আমি তখন অস্ট্রেলিয়ায়—১৩ই মার্চ মেলবোর্নের মন্দিরে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম তার তুলনা নেই। বসন্ত দিনের বাংলায় তখন হোলি খেলা চলছে, মহাপ্রভুর আবির্ভাব দিবস বলে ভক্তরা পথে পথে কীর্তন করে চলেছেন। অস্ট্রেলিয়ায় তখন শরৎকাল—দিনগুলো সুন্দর, শান্ত, স্নিগ্ধ ! সন্ধ্যাবেলায় মেলবোর্নের মন্দিরে বেদম সঙ্কীর্তন চলছে। শহর-গাঁ থেকে ধুতি-শাড়ি পরা সাহেব-মেম ভক্তরা দলে দলে তখনও আসছেন। মন্দিরে প্রবেশের সময় গা: : ফুল ছিটিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা করা হচ্ছে। মাটিতে সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে তাঁরা প্রণাম করছেন—দেবতাকে এবং সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে। সবার উল্লাস আর উচ্ছ্বাসের শেষ নেই।

মেলবোর্নের ড্যাঙ্ক স্ট্রিটের মন্দিরে দেববিগ্রহ দেখে মনে হলো, একেবারে যেন জাগ্রত ভগবান—রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি। গৌরনিতাইয়ের বিগ্রহ এবার যেন ডেকে কথা বলবেন। কাঁসর ঘন্টা, পুষ্প পাত্র, গন্ধ পুষ্প, পঞ্চপ্রদীপ, এবং মন্দির দেয়ালে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম খচিত অলঙ্করণ, সংস্কৃতে উৎকীর্ণ গীতার বাণী এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র দেখুন—মনে কৃষ্ণ ভাবনা না এসেই যায় না। শ্বেত পাথরের হাতির মাথায় স্থিত সু-অলঙ্কৃত টবে তুলসী গাছও অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলাম—পদ্মদল খচিত চাঁদোয়া, স্ফটিক

কাঁচের ঝাড়লণ্ঠন, ময়ূর-ময়ূরীর পাষাণমূর্তিও হাঁ করে তাকিয়ে দেখবার মতোই বটে। শ্রীখোল, করতাল, হারমোনিয়ামে বৈষ্ণবীয় রীতিতে ফুলের মালা পরিয়ে রাখা হয়েছে। দক্ষিণ গোলার্ধের সুদূর মেলবোর্নে এ এক আশ্চর্য রকমের বৈষ্ণবীয় পীঠস্থান!

দু বছর আগে প্রভুপাদ দেহ রেখেছেন—তাঁর মূর্তিও মন্দিরে নিত্য পূজিত—তাঁরই আপন কৃতিত্বের জোরেই যে সারা বিশ্বে আজ এতো মন্দির, মন্দিরে মন্দিরে এতো ভক্তের আনাগোনা। প্রভুপাদের লেখা বইগুলি থেকে তখনই বছরে তিন-চার কোটি টাকা আয় হচ্ছে এবং ইস্কনের প্রয়োজনে তা ব্যয় হচ্ছে—

সেদিন ভক্তরা মন্দিরে এসেছিলেন অনেক উপহার নিয়ে—মহাপ্রভুর জন্মদিনে তাঁকে উপহার না দিলে কি চলে! উপহারের উপকরণগুলিও ছিল আশ্চর্যকর। একজন ভক্তের হাতে ছিল একটা চাল ধোয়া চালুনী—মহাপ্রভুর ভোগ রাঁধতে চাল ধুয়ে নিতে হবে যে। এছাড়াও ছিল আপাত অকিঞ্চিৎকর কিছু উপহার সামগ্রী—কৌপিন, তুলসীর মালা, নামাবলী। সন্ন্যাসী চৈতন্যদেবের জন্মদিনে সন্ন্যাসীর যোগ্য উপহার এর চেয়ে বেশি মহার্ঘ আর কিই বা হতে পারে!

সেদিনের ইস্কন মন্দিরে ঠাকুরের আরতিটি ছিল দেখবার মতো। পঞ্চপ্রদীপ, শঙ্খ, বস্ত্র, ফুলের আরতি এবং সব শেষে ভক্তদের প্রদীপের শিখা গ্রহণ সমাপ্ত হলে ভক্তরা ধ্বনি দিলেন—শ্রীগৌর হরি কি? শ্রীপুরীধাম কি, গৌরপূর্ণিমা কি, শ্রীল প্রভুপাদ কি—সঙ্গে সঙ্গে মধুর গম্ভীর প্রতিধ্বনি চারদিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে উঠল—জয়, জয়, জয়।

এবার প্রসাদের কথা—লুচি, ভাত, বেগুনভাজা, মুগডাল, আলু ছেঁচকি, মটর শুঁটির সিঙাড়া, বাঁধা কপির রোল, টম্যাটোসহ তিন রকমের চাটনি, রসগোল্লা, সন্দেশ, গুঁড়ো দুধের লাড্ডু, ননীঘন দুধের লসসি ইত্যাদি সবাই অপার্থিব জগতের আহার্য বলে গ্রহণ করলেন। মহাকাশ যুগের অস্ট্রেলিয়াতে দাঁড়িয়ে মনে হলো—আশ্চর্য, এখনও এমনটি ঘটছে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্যের নামে, আর এই মহাভক্ত লোকগুলোর গায়ে মতলববাজরা

সি-আই-এর চর বলে ছাপ দেবার চেষ্টা করছে!

প্রসাদের পর স্লাইডে চৈতন্যজীবনের পটচিত্র দেখানো হচ্ছিল—শ্রীমায়াপুরে তাঁর আবির্ভাব থেকে পুরীর গম্ভীরায় শেষ আঠারো বছরের জীবনের ছবি সবাই তন্ময় হয়ে দেখলেন। তাঁর বাস্তুভিটার অদূরবর্তী নিস্তরঙ্গ গঙ্গার মনোলোভন দৃশ্যপট চোখের সামনে ভেসে উঠতেই ভক্তরা মাটিতে লুটিয়ে প্রণাম করলেন। গঙ্গা হচ্ছে পবিত্র নদী—তার মাহাত্ম্য মনেপ্রাণে কতখানি সুগ্রোথিত থাকলে গঙ্গার চিত্রপট দেখে মাথা এমন অক্লেশে নুইয়ে পড়তে পারে ভাববার মতোই বটে!

মেলবোর্নের এই প্রসন্ন সন্ধ্যায় মন্দিরের গাড়িচালক মিখাইলের সঙ্গে কথা হলো। মিখাইল আসলে রাশিয়ার ছেলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নানা বিরূপ ঘটনার অভিঘাতে তাঁর মা বাবা অস্ট্রেলিয়ায় এসেছিলেন। আর পাঁচজন অস্ট্রেলীয় যুবকের মতোই মিখাইলের অতি সাধারণ সমাজ জীবন কেটে যাচ্ছিল—নারী-সুরা-জুয়া কিছুই বাদ ছিল না। হঠাৎ একদিন গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীদের নগর সঙ্কীর্তন করতে দেখে মিখাইল আকৃষ্ট হলেন—তাঁর যেন মনে হলো, সন্ন্যাসীদের মুখে বেশ শান্তি আর তৃপ্তির ছাপ আছে। অথচ বেদম ভোগের অঢেল উপকরণ করায়ত্ত থাকলেও তাঁর নিজের মনে শান্তি ছিল না, তৃপ্তিও ছিল না। মিখাইল এলেন ইস্কনের মন্দিরে।

মিখাইলের তখন যুবাবয়স—পার্থিব আকর্ষণের সহজলভ্য সব বস্তু আবার তাঁর মনে চাঞ্চল্য আনল—মনের মধ্যে শুরু হলো দ্বন্দ্ব। আশ্রম ছেড়ে মিখাইল আবার চলে এলেন বাবা মায়ের সংসারে। এবং অনতিবিলম্বেই সংসার ও আশ্রম জীবনের পার্থক্য ধরা পড়ে গেল। মিখাইল আবার গিয়ে উঠলেন আশ্রমে।

দুর্ভাগ্যের কথা, অল্পদিনের মধ্যে মিখাইলের মা বাবার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেল। সপ্তাহে তিনদিন আশ্রমে এসে মা তাঁকে দেখে যেতে লাগলেন। 'বাবা ঘোর কম্যুনিস্ট', মিখাইল বললেন—'ধর্মে কর্মে তার বিশ্বাস ছিল না, আমার সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের তার বালাই ছিল না।'

এ হচ্ছে রাশিয়ার বাইরে রাশিয়ার কম্যুনিস্ট। ভারতে তীর্থকামী রুশ কৃষ্ণভক্তদের অপেক্ষা তাদের জাত আলাদা। ঐহিক জীবনে বীতশ্রদ্ধ মিখাইল অবশ্য খাস রাশিয়াতে থাকলেও ঐ কৃষ্ণভক্তদের দলে এসে হয়তো কোন্ অজ্ঞাতে ভিড়ে পড়তেন।

'কিন্তু আবার যদি মন চঞ্চল হয়, মিখাইলকে আমি প্রশ্ন করি—আবার যদি তোমার সংসার করতে সাধ হয়—'

'কৃষ্ণের কৃপায় তা যে আর হবে না তা আমি এখন বেশ বুঝতে পারছি', হাসতে হাসতে মিখাইল জবাব দেন—

'এবার আমি সত্যি সত্যি পথের সন্ধান পেয়ে গিয়েছি। ধর্মের মধ্যে শান্তির স্বাদ পেলে কেউ কি আর সংসারের আকর্ষণ বোধ করতে পারে—'

'এই আশ্রমে আমি একজন শিক্ষানবীশ মাত্র', মিখাইল আরও জানিয়ে দিলেন—'এখনও আমি সাধনভজনের কিছুই জানি না। কিন্তু সংসারে আর আমি ফিরে যাব না। হরে কৃষ্ণ।'

দশ বছর আগে এই ছিল মিখাইলের শেষ কথা। তাঁর ফেলে আসা রাশিয়ায় এখন চল্লিশ হাজার ভক্ত কৃষ্ণ ভজে, চারশত কৃষ্ণভক্ত দীক্ষা নিয়েছেন। তাঁদেরই অনেকে কারা প্রাচীরের আড়ালে বন্দী জীবন-যাপন করেছেন। তাঁদের কথাই এবার আমার বড় কথা।

৩

এবার আমাদের এলাহাবাদ কুম্ভমেলায় চোখ ফেরাতে হবে—কারামুক্তির পর ভারত দর্শনের প্রথম পর্বেই সোভিয়েৎ ভক্তরা এলাহাবাদে তীর্থযাত্রার কথা ভেবেছিলেন। ঐখানে অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর সম্ভাব্য দর্শন এবং গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী সঙ্গমে পুণ্য স্নান ছিল তাঁদের আসল লক্ষ্য। কৃষ্ণ-ভজনার অপরাধে পুলিশী জুলুম এবং কারাগার ও মানসিক হাসপাতালে নির্যাতন ভোগের পর শরীর-মনের ক্লেদ মোচন করতে এই অবগাহন স্নানের যেন দরকার ছিল।

এলাহাবাদ কুম্ভমেলায় ইস্কনের অবশ্য মস্ত একটা ভূমিকা ছিল এবং সেই ভূমিকার মধ্যে ইস্কনকে আমাদের আরও একটু ভালো করে চিনে নেবার সুযোগ ঘটেছিল। শুধু ইস্কন-কৃষ্ণভক্ত নয়, সব আগন্তুকের জন্যই ইস্কনের শিবির দ্বার ছিল অবারিত—

ইস্কনের ভূমিকা নিয়ে ছিদ্রান্বেষীরা তখন কানাকানি শুরু করেছে, অনেক কথাই আমাদের কানে আসছে। কুম্ভ-মেলায় আবার ইস্কন-শিবির কি, প্রশ্নটি তুলে অবশ্য নিজেই জবাব দিলেন এক কট্টর সমালোচক—'ব্যবসা, বুঝলেন মশাই, সব হচ্ছে ব্যবসা—'

সে যাক। কুম্ভমেলায় ব্যাপক অংশ গ্রহণে ইস্কনের যে একটি নেপথ্য ইতিহাস আছে সেইটে একটু বলা দরকার। কুম্ভমেলাতেও

ইস্কন যোগ দিয়েছিল, কিন্তু তার ভূমিকা ছিল স্বল্প, উদ্যোগ ছিল দ্বিধান্বিত। প্রভুপাদ নিজে সেই মেলায় যোগ দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু খুশি হতে পারেন নি—তাঁর ইচ্ছা ছিল, ইস্কনের তৎপরতা আরও ব্যাপক হবে, বহু মানুষের সেবার মধ্য দিয়ে ইস্কন ধন্য হয়ে উঠবে। এবার কুম্ভে ইস্কনের প্রচেষ্টা তাই সর্বাত্মক। বড় বড় শিবির তুলে বিশ্বের ভক্তদের কৃষ্ণের নামে

ডেকে এনে যাতে শিবিরে শিবিরে স্থান দেওয়া যায়, পুণ্য স্নানে তাঁদের সাহায্য করা যায়। এবারের সব তৎপরতা ছিল সেই দিকে কেন্দ্রিত—কারণ তা হলো আসলে কৃষ্ণ সেবাই।

এবারের এলাহাবাদে ইস্কনের খুব উদ্যম ছিল, কিন্তু হাতে তেমন সময় ছিল না। দেড় মাস পর মেলা শুরু হবে, অথচ শিবির তোলার চার একর জমি পাওয়া গেল ৩০শে নভেম্বর—এলাহাবাদ কুম্ভমেলা প্রশাসন তা সরাসরি মঞ্জুর করলেন। ইস্কন কর্মীরা উঠে পড়ে লাগলেন—তাঁবুর সরঞ্জাম এলো, জল এবং বিদ্যুতের সংস্থান হলো ; তোষক-বালিশ লেপ-কম্বল যোগাড় হলো, বাথ-টয়লেটও তৈরী হয়ে গেল। তা ছাড়া হরেকৃষ্ণ থিয়েটার, ডাইওরামা, ইস্কন-সিনেমা প্রদর্শন ব্যবস্থাও বাদ গেল না। কিন্তু এ তো গেল একদিক—ক্ষিধের অন্ন চাই, পুণ্যার্থীদের প্রয়োজনীয় আহার্য প্রস্তুত থাকা চাই। সুতরাং চাল, ডাল, নুন, তেল, ঘি, দুধ, সবজী ইত্যাদির যোগান যাতে নিয়মিত মেলে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হলো। প্রভুপাদের একটি বিশেষ ইচ্ছার কথাও কর্মকর্তারা মনে রাখলেন—জনসাধারণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণের কথা। এবং তার জন্য রোজ দশ হাজার টাকা ব্যয়ের একটি প্রকল্পও তৈরী হলো। শুধু হালুয়া প্রসাদ তৈরী করতে।

কিন্তু কেন এই প্রসাদ বিতরণ ?

কৃষ্ণের প্রসাদ কৃষ্ণের করুণা, ইস্কনে প্রচলিত দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে ভক্তি রাঘব মহারাজ বললেন—'অনাহুত রবাহুত লোক এগিয়ে এসে প্রসাদ নিলে তাদের কৃষ্ণচেতনা জাগ্রত হবে। এবং তা জাগ্রত করাই তো আমাদের কাজ।

মাত্র দেড় মাসের সময় পেলেও তারই মধ্যে সব ব্যবস্থা সম্পন্ন হলো, দুইশত তাঁবু উঠল নয় লক্ষ টাকায়, জল আর বিদ্যুতের ব্যবস্থা দুই লক্ষ। অবিশ্বাস্য ছয় সপ্তাহের মধ্যেই। চার লক্ষ টাকা আলাদা করে রাখা হলো বিনামূল্যে প্রসাদ বিতরণের জন্য। গোড়ায় কিন্তু সব টাকার সংস্থানও ছিল না, যদিও শেষ পর্যন্ত কোনো অভাবই থাকে নি।

একটি কথা কিন্তু বিশেষ ভাবে ভেবে দেখবার মতো—যে জায়গায় বসে

ইস্কন সব দুরূহ কঠিন কাজ সম্পন্ন করলেন সেখানে কোনো কিছুই অনুকূল ছিল না, স্বাভাবিক ছিল না—আড়াই লক্ষ বর্গফুটের যে জমিতে দুইশত যাত্রীশিবির তৈরী হয়েছিল, তা স্রেফ বালুচর। মধ্যিখানে চড়া জাগিয়ে গঙ্গা এলাহাবাদের এপার-ওপারে দু-দুটো ধারায় বয়ে চলেছেন সুতীব্র জলস্রোত নিয়ে। একবারটি ভেবে দেখুন—এক দেড় ফুট গভীর বালুচর—তার ওপর তাঁবু, রান্না, খাওয়া, শোবার ব্যবস্থা! তার ওপর আবার উৎকট শীত। ধূলিকীর্ণ শয্যায় শয়ন করেও কষ্ট কেউ গায়ে মাখে নি, কারণ সবার লক্ষ্য পুণ্যস্নানে। স্নান করে পরমার্থ লাভ হবে ; দেহ মন প্রাণ নিয়ে আমরা অনন্ত পুণ্যকে স্পর্শ করতে পারব, আমাদের জন্মজন্মান্তরের পাপ স্খালন করে নিতে পারব—এই আমাদের চিরবিশ্বাস।

সমুদ্রমন্থনে একদিন উঠে এসেছিল মধুভাণ্ড, সে কোন্ পুরাণের যুগে। আর সবাইকে ডিঙিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের নন্দন জয়ন্ত আগ বাড়িয়ে অমৃত-কুম্ভ ধরে বগলদাবা করে ইন্দ্রলোকের দিকে দেছুট। তস্কর সুলভ পলায়নের পথে বার চারেক তাকে থামতে হয় প্রয়াগ, উজ্জয়িনী, নাসিক এবং হরিদ্বারে। ফোঁটা কয়েক অমৃত নাকি এই স্থানগুলোতে চলকে পড়ে গিয়েছিল। যে লগ্নে যে তিথিতে পৃথিবীর মাটিতে এই অমৃত স্পর্শ ঘটে, তারই স্মরণ করে আজও বিশ্বের লোক এই চারিতীর্থে এসে সমবেত হয়। পুণ্য নদীতে স্নান করে। স্নান করে ধন্য হয়। প্রতি বারো বছরে একবার করে ফিরে আসে এই পুণ্য দিনটি। ইন্দ্রলোকে পৌঁছাতে জয়ন্তর সময় লেগেছিল এক বছর। মর্ত্যের হিসেব মতো যা হচ্ছে আসলে বারো বছর। চার তীর্থে আজও তাই প্রত্যেক তিন বছর পর পর কুম্ভ স্নানের ভিড় জমে।

ঐ কথা বলতে আমাদের দ্বিধা নেই দেবরাজ ইন্দ্রের এই জয়ন্ত ছেলেটার একটুও ডেমোক্র্যাটিক ধ্যান-ধারণা ছিল না—নইলে একই সঙ্গে মেহনত করে সমুদ্র মন্থন করা দানবদের বঞ্চিত করতে কেনই বা তার মধুভাণ্ড নিয়ে এমন চম্পট প্রদান?

পাল্টা প্রশ্ন ওঠে—কেন নয়? অমৃত খেয়ে অমরত্ব পেয়ে দানবরা মিলে

দেবতাদের গলা কাটবে, ঘর বাড়ি জ্বালাবে তাঁদের ঘর সংসার লণ্ডভণ্ড করবে, আর দেবতারা মুখ বুজে তাই সইবেন—তাও কখনও হয়? জয়ন্তর বাস্তব জ্ঞানটি যে টনটনে ছিল তা বলতেই হয়।

এলাহাবাদের প্রাচীন নাম ছিল প্রয়াগ—যজ্ঞের প্রকৃষ্ট স্থান বলে তার এই নাম। যুগে যুগে প্রয়াগের পুণ্যভূমি মুনি-ঋষি সাধু-সন্তদের পায়ের ধূলোয় পবিত্র হয়ে আছে। এই প্রয়াগ তীর্থে মহারাজা হর্ষবর্ধন দানসত্র খুলে নিঃস্ব হয়ে পড়তেন, এমন কি একদিন নিজের গায়ের কাপড় দান করার পর ভগিনী রাজ্যশ্রীর নিকট একটি কাপড় চেয়ে নিয়ে তাঁকে পরতে হয়েছিল। এই প্রয়াগের দশাশ্বমেধ ঘাটে চৈতন্য মহাপ্রভু রূপ গোস্বামীকে দর্শন দিয়েছিলেন—বাংলার মন্ত্রীত্ব ছেড়ে এইখানে এসে তিনি চৈতন্য চরণে আশ্রয় পেয়েছিলেন। সুতরাং কুম্ভ-মেলার উপলক্ষ ছাড়া এখানে এলেও তীর্থের ফল লাভ হতে পারে।

অনেকের মনে একটি প্রশ্ন দেখা দিতে পারে—কয়েক ফোঁটা অমৃত প্রয়াগের ভূমি স্পর্শ করেছিল তো সেই কবে কোন্ সে অচিন্ত্য দেব যুগে—প্রয়াগের মাটিতে এখন তার তো কোনো চিহ্নই নেই। আজও তবু কেন সবাই ছুটে আসে এইখানে, পুণ্য স্নানের নামে? কারণটি এই অমৃতের বিনষ্টি নেই—পুণ্য স্নানের মহালগ্নে এখনও নাকি সেই অমৃত গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সঙ্গমের জলে দীপ্যমান হয়ে ভেসে ওঠে। শাস্ত্র তাই বলে। লোকেও তাই বিশ্বাস করে। সোভিয়েৎ জেলের সদ্য মুক্ত কৃষ্ণ সন্ন্যাসীদেরও সেই বিশ্বাস দেখে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ।

গঙ্গা যমুনার আপন আপন ধারা আমরা স্পষ্ট দেখতে পেলাম—গঙ্গার আবিল জলে নীল যমুনার স্রোত এসে মিলেছে, কিন্তু মিশে যায় নি। আর তাই দেখে সবাই ভাবে সরস্বতী কোথায়, কোথায়ই বা গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সঙ্গম রেখা? কিন্তু সরস্বতীজী তো অদৃশ্য, গঙ্গা যমুনার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তরালে, বালুস্তর নিহিত ফল্গুধারার মতো। তার ডাণ্ডর সাইজের প্রমাণ আছে কিনা কে জানে, তবে পুরাণের সূত্র এখানে উল্লেখ করবার একটু অবকাশ আছে—

শ্রীকৃষ্ণ যুগ তখন অতিক্রান্ত। ঘোর কলি দ্রুত এগিয়ে আসছে, পাপাত্মা লোক আসর জমিয়ে বসতে শুরু করেছে—অন্যায় অপকর্ম করেও সরস্বতীর জলে স্নান করে যাতে পাপ স্খালন করে নেওয়া যায় সবাই তার মতলব আঁটছে। ব্রহ্মার নন্দন সনৎকুমারের কাছে ব্যাপারটি তেমন ভালো ঠেকে না—কায়দা করে সরস্বতীকে তিনি লোকচক্ষুর আড়ালে হটিয়ে দেন। তাতে আর যাই হোক, দুরাচারীদের পক্ষে ফাঁকি দিয়ে পাপ-মোচন করে নেবার পথ বন্ধ হয়ে যায়। নইলে এই হত্যা লুণ্ঠন অপকর্মের যুগে অবস্থাটি এখন কি দাঁড়াত ভাববার মতো।

স্নান যোগের একদিন আগেই আমরা সঙ্গম স্থানটি দেখে এসেছিলাম, কিন্তু স্নানের সময় ঘাটে গিয়ে তার আর কোনো হদিস পাই নি। নৌকোয় উঠে আমরা সঙ্গমে গিয়ে স্নান করে এসেছিলাম। বালুচরে তাঁবু তুলে অশ্বমেধ যজ্ঞের মতো বৃহৎ অনুষ্ঠান ইস্কন-সন্ন্যাসীরা যে সম্পন্ন করেছেন তা আসলে ভক্তি বিশ্বাস সঙ্কল্পের জোরে। টাকার জোর অবশ্য থাকা চাই। আশ্চর্য, সে টাকাও তখন তেমন ছিল না—

'এই মুহূর্তের হিসাবে আমাদের লাখ তিনেক টাকার ঘাটতি আছে', দিল্লী শাখার ইস্কন-প্রধান রামপরাশর প্রভু বললেন—'অবশ্য চিন্তার খুব কারণ নেই; শেষ পর্যন্ত একটা ব্যবস্থা হবেই, হয়তো সাহায্য এসে পৌঁছাবে কোনো অচিন্ত্যনীয় উৎস থেকে।'

পার্লামেণ্ট সদস্য এবং শেষ পর্যন্ত মধ্যপ্রদেশের এক প্রয়াত মন্ত্রীর পুত্র রামপরাশর এক দীপ্তিমান যুবক। স্বর্ণ পদক বিভূষিত বি-ই-মেক রামপরাশর শিকাগোতে কম্পিউটর-বিজ্ঞানে এম-এস করেছিলেন। আর শিকাগোতেই তিনি প্রভুপাদের 'ভগবদগীতা এ্যাজ ইট ইজ' বইখানা পড়ে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। আমেরিকায় বিপুল অর্জনের কথা ভুলে রাম পরাশর ইস্কনে গিয়ে ভিড়েছিলেন পরমার্থ সন্ধানে—বাড়ি-গাড়ি-নারী বিজড়িত নিরাপদ জীবনের সম্ভাব্যতা কাটিয়ে।

দিল্লী-মধ্যপ্রদেশ-আমেরিকায় এখন পরাশরজীর ব্যস্ততার অন্ত নেই; তবু কিন্তু কুম্ভমেলায় এসেছেন, কারণ কাঁধে অনেক দায়িত্ব ছিল, আর তার

জন্য এলাহাবাদে না এলেই নয়। তিন নম্বর শাস্ত্রী ব্রিজের অদূরে ইস্কন শিবিরে বসে একের পর আর একজনের সঙ্গে তিনি কথা বলে চলেছেন ফোনে, বেশির ভাগ ইউরোপ কিংবা আফ্রিকা কিংবা আমেরিকার মানুষের ট্রাঙ্ক-টেলিফোনের জবাব দিতে—ফোন তুলে হ্যালোর বদলে বলছেন 'হরে কৃষ্ণ'। অপর প্রান্তে কৃষ্ণচেতনার প্রবাহযন্ত্র যোগে চালান করে দেবার মতো।

বিশ্বের কত বিদ্বান, কত বিত্তবান, হৃদয়বান, এবং কত আহার নিদ্রা বিষয় বুদ্ধি সর্বস্ব সাধারণ মানুষও প্রভুপাদের সংস্পর্শে এসে শ্রীকৃষ্ণের শরণ নিয়েছেন। তাঁদের কৃষ্ণ-শরণের নেপথ্য কথা আজ দিকে দিকে সরস কাহিনীর মতো চিত্তাকর্ষক।

আমার কথাগুলো শুনে ফোনে মুখ রেখেই পরাশরজী বললেন—'বেশ তো আপনি একবারটি দিল্লীতে আসুন। হয়তো অনেক সাহায্যই করতে পারব—আপনি অনেক কিছু লিখতে পারবেন।'

আমার সঙ্গে পরাশরজীর কথা কিন্তু এগোয় না, একটু এগোয় তো আর চলতে পারে না, অন্যের কথায় মন দিতে গিয়ে গোল বেঁধে যায়—

দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবান থেকে এলাহাবাদে এসেছেন ইস্কনের আজীবন সদস্যা প্রমীলা প্যাটেল এবং তাঁর সঙ্গে মধ্যবয়সী অপর এক মহিলা। স্নান সেরে প্রমীলা প্যাটেল যাবেন দিল্লীতে, অপর মহিলা কলকাতা হয়ে মায়াপুরে। পরাশর প্রভুর এবার তাই কলকাতার সঙ্গে ফোন-সংযোগের দরকার হয়ে পড়েছিল।

'হ্যাঁ, এবার আপনার কথা বলুন,' ফোন ছেড়েই পরাশরজী আমাকে বললেন—আমি ভাবছি কিঁ—

কিন্তু তাঁর ভাবনা আর আমার সমস্যা চাপা পড়ে গেল। দক্ষিণ আমেরিকার চিলি-ব্রাজিল-ইকুইয়েডর থেকে সমাগতা জনাকয়েক কুম্ভ স্নানযাত্রিণী তাঁর সঙ্গে কথা বলতে এগিয়ে এলেন। ইস্কনের আজীবন সদস্যা এই মহিলারাও পুণ্যস্নান সেরে মায়াপুরে যেতে চান। এক ফাঁকে তাঁদের কারও কারও সঙ্গে আমি কথা বললাম।

'জন্ম জন্মান্তরের ভাগ্যের জোরে কুম্ভ মেলার প্রয়াগে এসেছি,' কথা প্রসঙ্গে এক মহিলা বললেন—'আর শ্রীমায়াপুর দেখব না, গৌরপূর্ণিমায় সেখানে থাকব না, তাও কখনও হয়—'

'গৌরপূর্ণিমা' কথাটা তিনি যথাযথ উচ্চারণ করলেন। আমি হতভম্ব হয়ে ভাবতে লাগলাম, কোথায় দক্ষিণ আমেরিকার ইকুইয়েডর, আর কোথায় রাজনৈতিক কলহভঙ্গুর হতদরিদ্র ভারতবর্ষের দূর-গ্রাম মায়াপুর! বৈষ্ণবীয় ভক্তি বিশ্বাস ওঁদের রক্তের কণায় এমন করে মিশে গিয়েছে, মনে হয় যেন ওঁরা সব জন্ম-যোগী—মধ্যাকাশে ডিম ফুটে বেরিয়েই হোমা পাখি যেমন মায়ের দিকে ছুটতে থাকে, ওঁরাও কৃষ্ণচেতনা নিয়ে জন্মলাভ করে ভারতের দিকে ছুটে এসেছেন। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য দেশের ধুলি গায়ে মাখতে।

পুণ্যস্নানে এসে ডুব দিয়ে উঠেই কেউ আর এলাহাবাদ ছাড়ার কথা ভাবে না—মেলা-তামাশা-প্রদর্শনী ইত্যাদি কত কি দ্যাখে। ইস্কনের প্রদর্শনী-শিবিরও খুব লোক টানছে: চৈতন্যলীলার কিছু কাহিনী সেখানে মূর্তি সহযোগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। একটি চিত্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এগিয়ে চলেছেন, ঝাড়িখণ্ডের বনভূমি বাঘ, সিংহ, সাপ, হরিণ, হনুমান, এমনকি পাখিরা পর্যন্ত তাঁকে অনুসরণ করে চলেছে পারস্পরিক হিংসাদ্বেষ ভুলে। তাদের সবার মুখে আবার শোন. াচ্ছে হরেকৃষ্ণ নাম। প্রসঙ্গত কে একজন টিপ্পনী কাটল—পশুপাখি আবার কথা বলতে পারে নাকি!

'কেন নয়, এক ভক্তগোছের লোক বললেন—'ভগবান চৈতন্যদেবের সান্নিধ্য পেয়ে দেহভাব যে ওদের লোপ পেয়েছিল, জেগে উঠেছিলেন আত্মা। সুতরাং হরি গুণগান করতে আর অসুবিধা কোথায়!

ঝাড়িখণ্ড পর্ব শেষে এক পথের মোড়ে প্রভুপাদের একটি মর্মর মূর্তি দেখা যাচ্ছে; মর্মরমূর্তি তো নয়, ঠিক যেন জীবন্ত মানুষ। হিন্দুস্থানী গুজরাটি মারাঠী মানুষরাও তাঁকে চিনতে ভুল করছে না। তাদেরই একজন বললেন—'ইয়ে মহাত্মা তো বাঙ্গালকা—'

এই সব কিছু নিয়েই কুম্ভমেলা। বহুবিচিত্র মানুষের মেলা। এ শুধু স্নানের ব্যাপার নয়. হরেক মানুষ. হরেক মন। হরেক মতের মুখোমুখি হয়ে আপন

ক্ষুদ্রতাকে বিসর্জন দেবার সুযোগ এখানে পাওয়া যায়। নিজেকে পবিত্র করে নেওয়া যায়।

এই মেলাতেই লক্ষ্য করলাম, কিছু লোক সাধু সঙ্গের জন্য বড়ই লালায়িত, সাধুর খোঁজে তারা হন্যে হয়ে ফেরে। এই নিয়ে আমার এক সহযাত্রিণীর সঙ্গে কিছু কথাও হলো। 'কুম্ভমেলায় এলেন, স্নানও করলেন, বোধহয় একটু বেকায়দায় ফেলতেই তিনি বললেন—'সাধু সঙ্গ করেছেন তো? নইলে কিন্তু পুরো ফল মেলে না—'

একটু ভাবনাতেই পড়লাম—মেলায় আবার সাধু সঙ্গ কি? কোথায়ই বা সাধুরা থাকেন? কি করে তাঁদের দেখা—

মনের ভাবনা চেপে আমি বললাম—'নাহ সাধুসঙ্গ হয়নি তো—ভদ্রমহিলা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে আমাকে দেখলেন।

এরপর সাধুর সন্ধান আমাকে করতেই হয়। একটা সন্ধান পেয়ে আমি এগিয়ে চলেছি দেবরাহা বাবার আশ্রমের দিকে। হাজার কয়েক লোকের দেবরাহা-বাবা-দর্শনার্থীর ভিড়ের মধ্যে আমি ভিড়ে পড়েছি। ছয়শত বছর বয়সী সাধুবাবা তখন গঙ্গাতীরে টং বেঁধে বাস করেন, মাঝে মাঝে দর্শকদের ধন্য করেন।

'কি যে বলেন,' সাধুর বয়স আশীর বেশি নয় বলতেই চার কিমি দূরের সাধু-শিবির প্রত্যাগত এক কলেজ ছাত্র আমার কথার প্রতিবাদ করলেন—'বাবা তো অনেকবার পুরোনো দেহ পাল্টে নতুন দেহ ধারণ করেছেন—'

তা একটা যুক্তি বটে!

দুর্ভেদ্য জনতা, দুর্লঙ্ঘ বাধার দুর্গপ্রাকার ডিঙিয়ে সাধুবাবার খুব কাছে গিয়ে আমি প্রশ্ন করলাম—'ভারতের দুঃখদুর্দশার অবসান কবে হবে?'

'হবে হবে,' টঙের ওপর থেকে বিবসন বৃদ্ধ বললেন—'গো-রক্‌চা করতে হবে—'

আর প্রশ্ন করতে আমার উৎসাহ রইল না। ভাবলাম, ইস্কনেই তো কত সাধু রয়েছেন কত দূরদূরান্ত থেকে তাঁরা এসেছেন কুম্ভমেলায়। তাঁদের সঙ্গে কথা বললে কি হয় না? গঙ্গার বালুচরের শিবিরে শিবিরে দেশ-

বিদেশের কতই সাধু রয়েছেন ; আমার পাশের শিবিরে রয়েছেন প্রাক্তন পুলিশ অফিসার চৌধুরী মশাই। সমস্ত জনকোলাহল এড়িয়ে আপন শিবিরের নিভৃত কোণে সন্ধ্যা-সকালে তিনি ধ্যানে বসেন—মনে হয় যেন নির্বিকল্প সমাধিতে তাঁর মন ডুবে যায়—

শুভ্র বালুস্তরের পরে গেরুয়া আসন বিছিয়ে বসে টিকিধারী সাহেব সাধুরা নামাবলী গায়ে গীতা ভাগবত আলোচনা করেন, একেবারে নিয়ম করে। রোজ সন্ধ্যায়। আমার শিবিরের কাছেই। তাঁদের সঙ্গে আমি কথা বলতে শুরু করলাম—

'আর্থিক দিক দিয়ে ভারতবর্ষ গরিব হতে পারে', ইটালীর শ্রীদাম দাস বললেন—'কিন্তু ভারত তো পরমার্থিক সম্পদের আকর। প্রভুপাদের করুণায় এই পুণ্যময় মহান ভারতে আমরা আসতে পেরেছি—'

পা-দেবে-যাওয়া বালুস্তরের উপর বসবাসের শিবির, অপ্রতুল জলের ব্যবস্থা, অনাধুনিক শৌচাগার ইত্যাদিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে নের্পোল্‌স্‌ মন্দিরের আশ্রয়তত্ব দাস কোনো আমলই দিলেন না—যেন এসব কিছুই নয়। 'ভগবানের পবিত্র নাম নিয়ে কত সাধুসন্ত এখানে এসেছেন। আশ্রয়তত্ব প্রভু বললেন—'আমার মস্ত ভাগ্য, তাঁদের দর্শন পেলাম—'

এরপর তিনি হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে লাগলেন।

'পাশ্চাত্যের লোকের পক্ষে এই ব: ্চরে নির্মিত শিবির অবশ্যই আদিম রকমের, বেশ কৃচ্ছ্রতাপূর্ণও', ফ্লোরেন্স মন্দিরের জনার্দন দাস বললেন—কিন্তু অধ্যাত্ম সাধনার পক্ষে এই কৃচ্ছ্রতার প্রয়োজন আছে। আপাত সুখের লোভে পাশ্চাত্যের বেশির ভাগ লোক কিন্তু এই কৃচ্ছ্রতালভ্য আধ্যাত্মিকতা থেকে দূরে সরে থাকে—

ফ্লোরেন্সের সড়কে একদিন হরেকৃষ্ণ সঙ্কীর্তনে আকৃষ্ট হয়ে ইস্কন মন্দিরে গিয়ে আধ্যাত্মিকতার সন্ধান পাওয়া জনার্দন দাসের চোখে মুখে দীপ্তি এবং কৃষ্ণনাম উচ্চারণে গদগদ ভক্তি দেখে আমার মনে হলো, এঁদের ছেড়ে আমরা অন্য সাধুর সন্ধানে বৃথাই ঘুরে ফিরি !

৪

ইস্কনের কথায় মায়াপুর প্রসঙ্গ না উঠেই যায় না, কারণ বিশ্বকৃষ্ণচেতনার নাড়ির যোগ রয়েছে ঐখানে। সোভিয়েৎ কৃষ্ণ ভক্তদের প্রসঙ্গে মায়াপুরের কথাও বার বার এসেছে। সুতরাং 'মায়াপুর ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান' শুধু এই বলে থেমে না গিয়ে মায়াপুর মন্দিরে এখন আসলে কি হয়, কবে কি করে চন্দ্রোদয় মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারপর কি কি ঘটে ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু বলার প্রয়োজন আছে।

আমি মায়াপুরে গিয়েছিলাম শেষ এপ্রিলে ভায়া কৃষ্ণনগর।

চন্দ্রোদয় মন্দির থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার আগে গাড়ি থেকে নেমে আমি চাঁদ কাজীর সমাধি দেখেছিলাম। সমাধির পরে গোলক চাঁপার গাছটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজ হাতে রোপণ করেছিলেন।

তখন বৈশাখের রুদ্র অভিসার চলছে, মায়াপুর জোড়া নদীয়ার মাঠঘাট রোদে ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। অল্প কিছুদিন আগে মন্দিরে ডাকাত পড়েছিল—আগেও দুবার ভয়াবহ আক্রমণ ঘটে গিয়েছে। কাজীর বাড়ি থেকে মন্দিরে যাবার পথে আমরা রিক্সা-চালক কচি শেককে বললাম—এবারের হামলাটা তাহলে—

'সাহেব মঠে তো', আমাকে বাধা দিয়ে নেয়াপাতি হাসি হেসে কচি শেক বলে—'সাহেব সাধুরা তো গুলি চেলিয়েছিল!'

অন্য অনেক কথা ছাপিয়ে সাহেবদের গুলি চালনার কথাটাই তখন মতলববাজ লোকেরা খুব বড় করে প্রচার করেছিল।

ইস্কনের আজীবন সদস্য হিসেবে আমি তখন মন্দির সংলগ্ন গেস্ট হাউসে রয়েছি, সব কিছু দেখতে আর শুনতে খুব ভালো লাগছে। সেদিন ভোর চারটেয় মঙ্গল আরতিতে যোগ দিয়েছিলাম। চন্দ্রোদয় মন্দিরের দিক

দিগন্ত তখন কৃষ্ণনামের সঙ্কীর্তনে জেগে উঠেছে, ঋষিকণ্ঠে সামগান মুখরিত তপোবনের মতো। শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধার রাত-পোশাক পাল্টে দেওয়া হয়েছে। অমন সুন্দর সকালে দেবতাকে ঠিক দেবতার মতোই দেখাচ্ছে।

পাঁচটা বাজতেই মন্দিরে মালা গাঁথার ধুম পড়ে গিয়েছে। ফুলের জন্য চিন্তা নেই—কাছেই বিঘা কয়েক জমিতে এন্তার ফুল ফোটে। মালার ফুল, পূজার ফুল, অতিথি অভ্যর্থনার ফুল। হেড পূজারীর নির্দেশে রোজ তিনটি বিশেষ মালাও গাঁথা হয়—শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা, আর প্রভুপাদের গলায় পরাতে।

ফুলের ঝুড়ি সামনে রেখে কয়েকটি ছেলে আর মেয়ে তখন মালা গাঁথ-ছিল। একটা গন্ধরাজ ফুল দেখিয়ে বললাম—এটা আমাকে দেবে?

নাহ, দিতে পারবো নি—ওরা সমস্বরে জানায়।

মোটে তো একটা ফুল—আমি আবার বলি।

'কিন্তু এখনও তো পূজোয় লাগে নি, প্রসাদী হয় নি,' একটি ছেলে যুক্তি দেখিয়ে বলে—'এ ফুল তো দেওয়া যাবে না।'

ছেলেটির বয়স বড় জোর বছর দশেক—ধুতিপরা তিলক কাটা টিকিধারী ছেলে। কাছেই ইস্কন চালিত গুরুকুলে পড়ে এবং থাকে। সুপ্রাচীন ভারত-বর্ষের বৈদিক যুগের পড়ুয়াদের মতো।

মন্দির, গেস্ট হাউস আর পার্কের চত্বরে চত্বরে ফুলের হাসি আর ধরে না, প্রভাতী হাওয়া তার মধুগন্ধ ছড়ায়। পার্কের কোণে পাথুরে পদ্মফুলের শ্বেতদণ্ডভেদী ফোয়ারা-মুখে জল এবং কাছেই শ্বেত পাথরের শূন্য আসন দেখে মনে হচ্ছিল, ইন্দ্রলোকের দেবতারা রাতে বোধহয় এইখানে ধ্যানে বসেন!

সকাল আটটায় দর্শন-আরতি শুরু হয়ে গিয়েছে, দেব-বিগ্রহের আবার বেশ বদল ঘটেছে! শ্রীকৃষ্ণের সাজে এবার মণিমাণিক্য খচিত রাজবেশ—হাতে মোহন মুরলী, গলায় বনমালা; মুখে মধুর হাসি। রাণীর মতো সেজে রাধারাণীও মৃদু মৃদু হাসছেন। মন্দির জুড়ে ফুল, আতর, ধূপ অগুরুর ঘন গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। হঠাৎ বিগ্রহের সম্মুখবর্তী পর্দা গেল হটে, ভক্তরা

সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে প্রণত হলো, রেকর্ড-করা ক্যাসেটে বেজে উঠল বীটল-নায়ক জর্জ হ্যারিসনের সুরারোপিত ভজন গান—গোবিন্দম্ আদি পুরুষম্ তমহ্‌হম্ ভজামি। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের আত্মার যেন যোগ হয়ে গেল।

দেবতার দিনের পোষাক কুড়ি হাজার, আর রাত-পোশাকের দাম তিনহাজার টাকা। 'কেন নয়,' এক নতুন আগন্তুকের বিস্ময় দেখে একজন কৃষ্ণভক্ত বললেন—'শ্রীকৃষ্ণ পরম ঐশ্বর্যবান, জগতের সব ঐশ্বর্যের মূলে তিনিই রয়েছেন। দরিদ্র বেশ তাঁর মানায় না—

রাজসিক আয়োজনে দিনে রাতে সাতবারে নিবেদিত তাঁর ভোগে ছানা-মাখন-মিষ্টান্ন, লুচি-মণ্ডা-কেক-পুডিং, শুক্ত-ঘণ্ট-শাক-চচ্চড়ি, ঘোল-অম্বল-ফল ইত্যাদি মিলিয়ে একশ আট রকমের বস্তু থাকে, প্রতিবারে গড়ে পনেরো রকম। পূজার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন জনাছয়েক পুরুতঠাকুর। হেড পূজারী জননিবাস প্রভু ইংরেজ লোক, প্রাক-ইস্কন জীবনে ছিলেন এক ডাকসাইটে এঞ্জিনীয়ার। প্রায় প্রত্যেক পাশ্চাত্য ভক্তের জীবন নিয়ে এক একটি রোমাঞ্চকর উপন্যাস লেখা যায়—জননিবাস প্রভুর কাহিনীও তার ব্যতিক্রম নয়। কাগজের দুর্মূল্যের দিনে রচনার কলেবর বৃদ্ধি কাম্য নয়—চিত্তাকর্ষক হলেও অনেক কথা ছাঁটকাট করতে হয়—

'বহু ভাগ্যের জোরে তোমাদের জন্ম হয়েছে ভারতবর্ষে,' কথাপ্রসঙ্গে জন-নিবাস প্রভু বললেন—'সাধন ভজনের বীজ এখানে আকাশে-মাটিতে-বাতাসে ছড়িয়ে রয়েছে। সিদ্ধি এখানে সহজ-আয়ত্ত—'

'দুঃখের বিষয় তা নিয়ে এখানে তেমন কেউ মাথা ঘামায় না। পাঁচ-সাত কি দশহাজার বছর আগে ভারতবাসীর মানসিক স্তর ছিল কত উন্নত—নইলে কি আর বেদ-উপনিষদ গীতা-ভাগবত লেখা হতো, নাকি তার মর্ম তখন সবাই বুঝত—'

'দুহাজার বছর আগে চোখ ফেরাও—খৃস্টের অনুগামীরা ছিল খুব সাধারণ স্তরের লোক। তাদের উপদেশ দিতে যিশু বলেছিলেন—'চুরি করিও না, মিথ্যা বলিও না। চোর-জোচ্চোরের সমাজে কি কেউ আর বেদ-উপনিষদের

মতো উচ্চকটির কথা বুঝতে পারে, আর কে-ই বা সে কথা বলতে যায়—'
'দেড় হাজার বছর আগের আরব মুল্লুকের কথাও বিবেচনা করে দেখতে পারো ; হজরত মোহম্মদ তাঁর অনুগামীদের তখন বলতেন—কাহাকেও মারিও না, কাটিও না, মা-বোনের সঙ্গে যৌনকর্মে লিপ্ত হইও না ইত্যাদি। তখনকার আরব-সমাজের অবস্থা নিশ্চয় অনুমান করতে পারছ—'
জননিবাস প্রভু অনেক কথাই বললেন, আমরা যে নিজেদের জানতে আর চিনতে চেষ্টা করি না তা নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করলেন ; এই ভারতের যে মহান গুরু তাঁর জীবনের ধারা পাল্টে দিয়েছেন। লক্ষ লক্ষ হিন্দু বৌদ্ধ, খৃস্টান, ইংরেজ ফরাসী আমেরিকান, জার্মান অস্ট্রেলিয়ান জাপানী লোক যাঁর ভক্ত রূপে ইস্কনের পতাকা তলে মিলিত হয়েছেন, সেই ভাগবত-মনীষী প্রভুপাদ অভয়চরণ ভক্তি বেদান্ত স্বামীর প্রতি জননিবাস প্রণতি নিবেদন করলেন। দর্শন-আরতি দেখতে এসে আমার ভালো অভিজ্ঞতা হলো—এক শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তর সঙ্গে পরিচয় হলো।
কলকাতার এক সুবর্ণ বণিক পরিবারে গৌরমোহন দের পুত্ররূপে অভয় চরণের আবির্ভাব ঘটে ১৮৯৬ সালে। স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি-এ পাশ করার পর কিছুদিন তিনি অর্থার্জনে লিপ্ত ছিলেন, সংসার ধর্মও পালন করেছিলেন—দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন শ্রীমদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের কাছে। তাঁর নির্দেশ মতোই তিনি পা' দিয়েছিলেন আমেরিকার পথে ; পাশ্চাত্যে কৃষ্ণ কথা এবং বৈদিক ধর্ম প্রচার করতে—
পঞ্চাশোর্ধ্বে অভয়চরণ সন্ন্যাস নিয়ে দীর্ঘদিন বৃন্দাবনে বাস করেছিলেন। এবং সেখানে একটি প্রচার সঙ্ঘ গড়ে তোলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তখন থেকেই তাঁর লক্ষ্য ছিল আমেরিকা। তারপর একদিন দুঃসহ কষ্টের সাগর পাড়ি দিয়ে সেখানে যখন পৌঁছালেন, তখন বয়স তাঁর সত্তর, সম্বল চল্লিশ টাকা, মনের বল অসাধারণ। গেরুয়াপরা তিলক-কাটা বৃদ্ধ সন্ন্যাসী নিউইয়র্কের পার্কে বসে কৃষ্ণনাম করতে করতে একদিন আমেরিকা জয় করলেন। বিস্মিত বিশ্ব আজ অবাক হয়ে ভাবছে—এও কি সম্ভব !
হিপ্পিদের নিয়ে তখন এক কিম্ভূৎ যুগ চলছে, অনেক যুব মনে প্রশ্ন জেগেছে—

আমি কে, পৃথিবীতে কেন এসেছি, সব আছে, তবু মনে কেন শান্তি নেই, সম্ভোগের চূড়ান্ত করেও কেন তৃপ্তি পাই না। কেউ জবাব দেয় নি, দিতে পারে নি—একমাত্র প্রভুপাদের কাছে তাদের সব প্রশ্নের সদুত্তর মেলে। এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর পায়ে মাথা লুটিয়ে তারা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আপন আপন নাম পাল্টে মাথা মুড়িয়ে টিকি রাখেন ; পেশা ছেড়ে সংসার ছেড়ে প্রভু কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গাইতে শরু করেন—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। তাঁদের নিয়েই প্রভুপাদ একটি কৃষ্ণচেতনা সঙ্ঘ গড়ে তার নাম দেন ইণ্টার-ন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনশাসনেস, সংক্ষেপে ইস্কন। ইস্কনের নাম আজ কে না জানে!

শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির উদ্বোধনের আগে কয়েকজন ভক্ত নিয়ে প্রভু-পাদ দুবার আমেরিকা থেকে মায়াপুর এসেছিলেন। দ্বিতীয়বারে তাঁর সঙ্গে ছিলেন একুশ জন আমেরিকান শিষ্য—যতো সব বিদ্বান ছেলে, বিশ্ব-বিছ্যালয়ের ভারি ডিগ্রীধারী। অর্থবান, হৃদয়বান, সংস্কৃতিবান। বর্তমান মেইন গেটের কাছে খড়ের ঘর, খাটা পায়খানা তৈরী করে প্রভুপাদ তাঁদের নিয়ে সেখানে বসবাস করেছিলেন। জমি কেনা এবং মন্দির তোলার তোড়-জোড় চলছিল। বাধা আর বিঘ্নও এসেছিল অনেক। যারা সুযোগ বুঝে খুব চড়াদামে জমি বেচেছিল, পরে তারাই খুব বেশি করে শত্রুতা করেছিল,
উদ্বোধনের পর তাদের কেউ কেউ মন্দিরের ক্ষতিসাধনে অংশ নিয়েছিল।

আজ ইস্কনের নাম, ডাক, গুরুত্বের অন্ত নেই—আমেরিকায় অস্ট্রেলিয়ায় স্পেনে রেডিও কৃষ্ণ সেণ্টার বা আর-কে-সি পর্যন্ত স্থাপিত হয়েছে, তার মাধ্যমে রোজ দু'ঘণ্টার অনুষ্ঠানে কৃষ্ণচেতনা জাগিয়ে তোলার ব্যবস্থা হয়েছে—গীতা-ভাগবত চৈতন্য চরিতামৃত ইত্যাদি বই বিক্রীর মধ্য দিয়ে ব্যাপক প্রচার কার্য তো চলছেই। টীকা সহ ইংরেজীতে ভগবদ গীতা, তিরিশ খণ্ড ভাগবতম, সতেরো খণ্ড চৈতন্য চরিতামৃত ইত্যাদি এবং তৎসহ অনেক মৌলিক রচনা নিয়ে প্রভুপাদের গ্রন্থ সংখ্যা পঁচাশী,
বিক্রীর হিসেবে যার রোজ গড় মূল্য ছিল লক্ষাধিক টাকা। সে যাক—

কিন্তু মোটা ভল্যুমের এত বই লেখা তাঁর পক্ষে কি করে সম্ভব হলো তাই নিয়ে লোকে মাথা ঘামিয়ে কূল পায় না। ইস্কনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শত্রু সংখ্যা বেড়েছে, দুর্নাম রটেছে। গোঁড়ার দল চোখ কুঁচকেছে। সি-আই-এর সঙ্গে যোগাযোগ থাকার যে কল্পিত অভিযোগ উঠেছিল, তার উল্লেখ তো আগেই করেছি। পৃথিবী জুড়ে ভক্তরা সি-আই-এর টাকায় মন্দিরে থেকে এবং খেয়ে গুপ্তচর বৃত্তি করছেন। আর সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সরকার চোখ বুজে সব সয়ে যাচ্ছেন, তাও কখনও হয়। আরও আছে—সি-আই-এর গুপ্তচর হিসেবে মোটা টাকা তাঁরা যদি রোজগার করেনই, তাহলে সেই টাকা খরচ করেন কখন? কোথায়? কিরূপে? মন্দিরের নিরামিষ খাবার খেয়ে গেরুয়া পরে তাঁরা তো কৃষ্ণ নাম, আর কৃষ্ণ প্রচার করে বেড়ান—বিগত কুড়ি বাইশ বছর তাই তো করছেন—

ইস্কনের জনপ্রিয়তা তখন বেদম বেড়েছে—মায়াপুরে মন্দির, গেস্টহাউস হয়েছে, ফলবাগান আর শ্যামশোভা মণ্ডিত মায়াপুরে বৈদিক যুগের হাওয়া বইছে। এটা অনেকের ভালো লাগে নি। সব থেকে বড় কথা, সাহেব লোক যখন মাথা মোড়ায়, টিক রাখে, খোল বাজিয়ে কৃষ্ণনাম করে, বিদ্বেষীরা আক্রোশে ফেটে পড়ে—বিশেষ করে ভিন্ সম্প্রদায়ের কিছু লোক। যে কোনো মুহূর্তে শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কায় ইস্কনকে আত্মরক্ষার ফিকির করতে হয়। শেষ পর্যন্ত শ'পাঁচেক দুষ্কৃতকারী মন্দিরে ঢুকে হামলা শুরু করলে গুলি ছুঁড়ে কৃষ্ণভক্তদের আত্মরক্ষা করতে হয়। আর তখনই মতলববাজরা বিশ্বময় প্রচার করে দেয়, ইস্কনের মায়াপুর মন্দিরে অস্ত্রাগার আছে! এ তো বেশ মজার কথা—তোমরা আক্রমণের দুঃসাহস দেখাবে, মন্দির গুঁড়িয়ে মূর্তি সংহার করবে, আর আমরা বসে বসে মার খাবো! এবং এই স্বাধীন ভারতে!

মায়াপুরে দ্বিতীয়বার গুলি চালনা করতে হয় ২৫শে মার্চ, মধ্য রাতে; চল্লিশ ডাকাতের একটি দল মন্দির প্রাঙ্গনে বোমাবাজি শুরু করে—ভক্তি রাঘব স্বামীর ডান পা খুব জখম হয় এবং পরে পা কেটে বাদ

দিতে হয়। সব চেয়ে দুঃখের কথা, বর্বরের দল রাধারাণীর মূর্তি লোপাট করে। গুলি বর্ষণে অবশ্য হারাই শেক, শেক কেদান প্রাণ হারায়।

ডিসেম্বরে শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী সম্পাদিত ভগবৎ দর্শন পত্রিকায় একটি রোমহর্ষক খবর বের হয়—বাংলাদেশের আলমিনার নামে একটি পত্রিকায় আমীন নামে একজন লোক সম্পাদক আহাম্মদ তৌফিকের কাছে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—'আজকাল ইউরোপ ও আমেরিকায় একটি হিন্দু সম্প্রদায় খুবই পাখ্না সৃষ্টি করেছে এর নাম হরে কৃষ্ণ। অতএব আমি আপনাকে এই দায়িত্ব অর্পণ করছি যে ইসলামের পক্ষে এই জেহাদের ময়দানের দায়িত্ব আপনি গ্রহণ করুন এবং এদের সঙ্গে যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে প্রবন্ধের মাধ্যমে সতর্ক করুন এবং ইউরোপ ও আমেরিকায় এদের প্রভাব বিনষ্ট করার চেষ্টা করুন।'

ভগবদদর্শন লিখেছিলেন—'এই আবেদনের ফলে আলমিনার সম্পাদক হরে কৃষ্ণ আন্দোলনকে আক্রমণ করে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেন—হরে কৃষ্ণ আন্দোলনের বিশ্বব্যাপী প্রচারের ফলে তিনি এতই মর্মাহত হয়েছেন যে হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে তিনি যেখানে যত নিন্দাবাদ পেয়েছেন তা সংগ্রহ করে এই সংখ্যাটিতে ছেপেছেন।'

আলমিনারের এই আক্রমণী সংখ্যাটির এক কপি স্বামীজীকে পাঠানো হয়েছিল। স্বামীজী কিন্তু সংযত সুললিত ভাষায় জবাব দিয়েছিলেন, আলমিনার বা তাদের ধর্মকে বিন্দুমাত্র আক্রমণ না করে। সম্পাদক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেও আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, আলোচনার মাধ্যমে অহেতুক সংশয়ের অবসান ঘটাতে। তার সাড়া মেলে নি!

এই হচ্ছে ইস্কন, এই আমাদের মায়াপুর, এবং ইস্কনকে ঘিরে এতো সব অবাঞ্ছিত অমার্জিত অপরিমেয় বৈরীতা—আর তারই মধ্যে সনাতন বৈদিক ধর্মের জয়যাত্রা, যা শেষ পর্যন্ত সোভিয়েৎ দেশে হাজির হয়ে মধুর গম্ভীর স্বরে বলেছে—খোলো দ্বার!

এবার আমরা সোভিয়েৎ দেশের কৃষ্ণ কথাই আলোচনা করব।

৫

কৃষ্ণচেতনার আন্দোলন, পৃথিবীময় তার অগ্রগতি এবং ভাগবত-মনীষী প্রভুপাদ সম্পর্কে এ পর্যন্ত আমরা যে সামান্য আলোচনা করেছি, সোভিয়েৎ দেশে কৃষ্ণচেতনার ধারা অনুসরণ করতে তা হয়তো খানিক সাহায্য করবে। সোভিয়েৎ কারাগার থেকে কৃষ্ণ ভক্তদের মুক্তি বর্তমান পৃথিবীর এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা, এই যুগের এক বিস্ময়কর ইতিহাস। আরও বিস্ময়ের কথা, কারামুক্তির পর প্রথমেই তাঁরা ছুটে এলেন ভারতবর্ষে, আর সারা পৃথিবীর নজর পড়ল এইখানে—ভারতবর্ষ যে বিশ্ব মানুষের তীর্থভূমি, আধ্যাত্মিকতার আদি নিকেতন, সেই কথাটি সবার বোধহয় নতুন করে মনে পড়ল—

সোভিয়েৎ কৃষ্ণ ভক্তদের নেপথ্য কথা জানতে সবার আগ্রহের তখন সীমা নেই। আমাদের সংবাদপত্রগুলিতে কিছু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ছাপা হলো, দু একজন সোভিয়েৎ কৃষ্ণ ভক্তের সাক্ষাৎকারও প্রচারিত হলো। ভাগ্যের কথা, দু-একজন নয়, ডজন দুয়েক রুশ কৃষ্ণভক্তর সঙ্গে আমার বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ ঘটল ইস্কনের সঙ্কর্ষণ দাস, অদ্রিধরন প্রভু, জয়পতাকা স্বামী মহারাজ এবং কীর্তিরাজ দাসের সৌজন্যে—ভক্তদের পরিবার-পরিবেশ শিক্ষা, কৃষ্ণভক্তির উন্মেষ, সাধনা প্রবুদ্ধ জীবন, কারা-লাঞ্ছনার মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণে অবিচল বিশ্বাস ইত্যাদি সম্বন্ধে অ... কথাই শুনলাম। আমার প্রথম আলোচনা প্রেমাবতীর সঙ্গে—

'আমরা এবার আপন ঘরে ফিরে এসেছি', বিমান বন্দর থেকে কলকাতার ইস্কন মন্দিরে পৌঁছেই প্রেমাবতী বলেছিলেন—জেল থেকে ছাড়া পেলে কে আর কোথায় যায়, নিজের বাড়ি ছাড়া কোথায় গিয়েই বা ওঠে!

সোভিয়েৎ দেশে ইস্কনের প্রথম যুগে প্রথম সারির কৃষ্ণ ভক্তদের মধ্যে

প্রেমাবতীর নাম করতে হয় সর্বপ্রথমে। পূর্বাশ্রমে তাঁর নাম ছিল কিসিলোভা হামিদোভ্না ওলগা। পিতা হামিদ ছিলেন একজন জ্ঞান-তাপস, মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে মনস্তত্ত্ব আর ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক। প্রেমাবতীর পরিবার বাস্কেরিয়া থেকে মস্কোতে এসে বসবাস শুরু করেছিল। ভলগা নদীর অনতিদূরে রাশিয়ান রিপাবলিকের মধ্যে বাস্কেরিয়া আর একটি ছোট্ট রিপাবলিক। ঘরের মধ্যে ঘরের মতো। ওলগা খুব অল্প বয়সেই মস্কোতে এসেছিলেন। তাঁর মা বিদুষী মহিলা, পঞ্চাশ বছর আগে চীন-দেশে তিনি সোভিয়েৎ ডিপ্লোম্যাট হিসাবে কাজ করেছিলেন। হামিদের পরিবার পরিজন শুধু শিক্ষিত নয়, অভিজাত—তবে কিনা ঘোর নাস্তিক। মস্কোর এক বহু বিখ্যাত ইংলিশ মিডিয়াম ইস্কুলে ওলগার পড়শোনার শুরু, শেষপর্ব মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে এম-এ ডিগ্রী লাভ।

কট্টর নাস্তিকতার মধ্যে বেড়ে উঠলেও ওলগার মনে ক্রমে ধর্ম ভাব জাগে, হিন্দুদর্শন নিয়ে তাঁর পড়াশোনা করতে সাধ হয়—অধ্যাত্ম জ্ঞানের ভারতবর্ষ তাঁকে খুব টানে। সুযোগ মিলতেও দেরি হয় না—ইস্কনের কক্ষ পথে ওলগা এসে দাঁড়িয়ে পড়েন। শুরু হয় তাঁর অধ্যাত্ম সাধনার পালা, তারপর একদিন বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষান্ত হয়, নাম হয় তাঁর প্রেমাবতী। পাশ্চাত্য উচ্চারণে আসলে প্রেমবতী হয়েছে প্রেমাবতী, ঠিক যেমন টড হয় টাড।

বৈষ্ণবী প্রেমাবতীর এই স্বল্প পরিচয়ের সূত্র ধরেই আমাদের এগোতে হবে। পথেঘাটে যে সব বৈষ্ণব বৈষ্ণবী সচরাচর আমরা দেখি, প্রেমাবতীরা তাদের মতো রামাশ্যামা গোছের নয়—জ্ঞানে-গবেষণায় চিন্তনে-মননে অনেক এগিয়ে অন্তরতম অন্তরের আহ্বানেই তাঁরা শেষপর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ নিয়েছিলেন।

আমরা সেদিন কলকাতার ইস্কন মন্দিরে রাধাগোবিন্দ বিগ্রহের অদূরে বসেই কথা বলছিলাম। সোভিয়েৎ দেশের কারাগার মুক্ত ঊনষাট জন রুশ কৃষ্ণভক্ত মস্কো থেকে সবে কলকাতায় এসেছেন—তখন তাঁদের ব্যস্ততার শেষ নেই, দুদণ্ড দাঁড়িয়ে কথা বলার অবকাশ নেই। তবু কিন্তু একটুখানি

সময় করে নিয়েছিলেন শাঁখা সিঁদুর পরা প্রেমাবতী দেবীদাসী, বৈষ্ণবীয় অভ্যেসে মালা ফেরাতে ফেরাতেই কথা বলেছিলেন। মন্দিরে ঠিক তখন পূজোর ঘণ্টা বেজে উঠল, প্রেমাবতী এবং অন্য সব ভক্ত সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে প্রণাম করলেন কারণ ভারতীয়রা তাই করেন—তাঁদের দেখেই তো এ সব শিখেছেন!

'আপনি মুসলমানের মেয়ে', আমি সন্তর্পণে বলি—'মূর্তিপূজায় বিশ্বাস—'

'এখন আমি আর মুসলিম কোথায়', আমার কথা পুরো না শুনেই খুব আবেগের সঙ্গে প্রেমাবতী বললেন—'আমার যে এখন নতুন ধর্ম। প্রেম ধর্ম। বিশ্বধর্ম। গিরিধারীলালই এখন আমার উপাস্য দেবতা, আমার প্রেমের ঠাকুর।'

'একবার একটু তাকিয়ে দেখুন তো, মধুর মধুর হাসি আর রূপের ছটায় আলো করা মুরলীধারীর দিকে হাত বাড়িয়ে প্রেমাবতী আবার বললেন—'আমার কৃষ্ণ কি ভালই না দেখতে—চিরযৌবনময়, চিরসুন্দর। আমি যে তাঁর আকর্ষণ এড়াতে পারি না—রোজ সকালে চান করে তাঁর পূজো করি, নাম জপ করি ; অনিমেষে তাঁর দিকে চেয়ে থাকি।'

'আপনি তো ঘোর নাস্তিক পরিবেশে মানুষ হয়েছেন, প্রেমাবতীর চমক ভাঙিয়ে দিয়ে আমি প্রশ্ন করি—' 'শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে শেষপর্যন্ত টানলেন কি করে?'

'আসল কথা, ভোগসর্বস্ব জীবনে আমার বিতৃষ্ণা এসেছিল, মনে তখন প্রশ্ন উঠেছিল আমি কে, কোথা থেকে এসেছি, মৃত্যুর পর কোথায় যাব ইত্যাদি হরেক রকমের প্রশ্ন—'

'কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দেবার কেউ ছিল না, মনেও তাই শান্তি ছিল না—বিক্ষুব্ধ বিপর্যস্ত মন নিয়ে আমার দিন কাটছিল। তখন আমার এক সহপাঠী বন্ধু রুশভাষায় অনূদিত একখানা ভাগবদগীতা আমাকে পড়তে দিলে। ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র, ভারততত্ত্ব ইত্যাদি নিয়ে সে খুব পড়শোনা করত, যথাসম্ভব শুদ্ধাচার পালন করত। তার দেওয়া গীতা পড়েই আমি শ্রীকৃষ্ণের কথা প্রথম জানতে পারলাম। সবকিছু বুঝতে না পারলেও গীতায়

শ্রীকৃষ্ণের উক্তিগুলো আমার খুব ভালো লাগল, খুব নতুন আর আশ্চর্যকর বোধ হলো—অমনটি তো আগে কখনও শুনিনি—'

'শেষপর্যন্ত প্রভুপাদের কিছু বই পড়ে মনে হলো, আমার অনেক প্রশ্নেরই তো জবাব পাচ্ছি মনেও শান্তি পাচ্ছি। বল পাচ্ছি। আর তখনই আমেরিকা থেকে সুইডেন হয়ে হরিকেশ মহারাজ এলেন মস্কোতে, কয়েকজন সোভিয়েৎ কৃষ্ণভক্তকে দীক্ষা দিতে। তাঁদের সঙ্গে আমারও দীক্ষা নেওয়া হয়ে গেল। মনে হলো যেন আমি নতুন জীবন লাভ করেছি—নবজীবনের দুর্লভ অনুভূতির ছোঁয়াচ লেগে, আমার দেহ মন যেন নিটোল প্রশান্তিতে ভরে উঠল, পুরোনো দিনের কিসিলোভা হামিদোভ্না ওলগা মরে গিয়ে জন্ম নিল কৃষ্ণানুরাগিনী প্রেমাবতী—'

'মস্কোতে কয়েকজন কৃষ্ণভক্তের সংস্পর্শে আমি আগেই এসেছিলাম—এবার তাঁদের দলে পুরোপুরি ভিড়ে পড়লুম—তাঁদের নিয়ে গীতা হিন্দু-দর্শন, কৃষ্ণকথা প্রচারে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। আমি বেশ বুঝতে পেরে-ছিলাম, সনাতন ধর্মই হচ্ছে সকল মানুষের ধর্ম।'

কিন্তু প্রচার কার্যের সুযোগ প্রেমাবতীরা খুব বেশিদিন আর পেলেন না ; শুরু হলো ইস্কন-আন্দোলন দমনের সরকারি তৎপরতা। সুতরাং এবারের ইতিহাস ভক্তদের ধর-পাকড়ের ইতিহাস, কারাদণ্ডের ইতিহাস, দুরূহ ক্লেশের মধ্যেও কৃষ্ণ ভজনার ইতিহাস। তখন চলছে—সমস্ত সোভিয়েৎ দেশে দীক্ষাপ্রাপ্ত কৃষ্ণভক্তর সংখ্যা তখন তিন শতাধিক; পঞ্চাশ জনের হাতে আগেই হাতকড়া পড়ে গেছে। প্রথম শৃঙ্খল পরেছেন অনন্ত-শান্তি। সোভিয়েৎ দেশে তিনিই প্রথম স্বয়ং প্রভুপাদের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, তারপর সারা দেশে ঘুরে ফিরে লোকের কৃষ্ণ-চেতনা জাগিয়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এবং নিজের বিপদ নিজেই ডেকে এনেছিলেন।

প্রেমাবতীর সঙ্গে আমার আলোচনা এগিয়ে চলেছে ; তাঁর কৃষ্ণাশ্রয়ী ব্যক্তিগত কাহিনী শোনার আগ্রহে এবার আমি একটি স্পর্শকাতর প্রশ্ন রেখেছি—দীক্ষার পর তাঁর আত্মীয়স্বজন, বিশেষ করে মোল্লা মানুষের

প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে। একটুও না ভেবে, সময় না নিয়ে প্রেমাবতী জবাব দিলেন—

'তারা ? তারা শুধু ভেংচি কাটল, ভয় দেখাল। কিন্তু ডরায় কে ?'

কিন্তু স্বামী, আপনার স্বামী কি বললেন ?

খৃষ্টান পরিবারে তাঁর জন্ম হলেও সেখানে ধর্মের ধার কেউ ধারত না, স্বামী ভেচেস্লাভ রুদেস্কার প্রসঙ্গে প্রেমাবতী বললেন—'ভেচেস্লাভ আমার সঙ্গে দিব্যি সহযোগিতা করতে শুরু করলেন।—এখনও তিনি মস্কোর ইস্কন কলেজে, ইন্টেলেকচুয়াল সমাজে প্রচার করে চলেছেন।'

'আমি আসলে একজন কবি। এবং প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ, নিজের কথা পুনরালোচনায় প্রেমাবতী বললেন—মস্কো হাইস্কুলে আমি ইংরেজী পড়তাম আর কবিতা লিখে সময় কাটাতাম। বাচ্চা বয়স থেকেই আমার কবিতা লেখার কাজ শুরু হয়েছিল—প্রথম কবিতা লিখেছিলাম আমি পাঁচ বছর বয়সে। আসলে কবিতা লিখতে আর আবৃত্তি করতে আমার খুব ভালো লাগে—'

'ছেলেবেলাকার বিশেষ কথা, 'আমার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে প্রেমাবতী বললেন— 'মেয়েদের বদলে ছেলেদের সঙ্গে মেলমেশা করতেই তখন আমি পছন্দ করতাম।'

'দীক্ষার পর অশান্ত মনটা যখন বে· সুস্থির হলো, এবার কারাজীবনের কথা শুরু করতে প্রেমাবতী বললেন—'আমেরিকায় বিষ্ণুপাদের সঙ্গে ফোনে আমি কথা বললাম। অনেক কথাই হলো। শেষ পর্যন্ত তিনি আমাকে চিঠি লিখতে শুরু করলেন। ব্যস ধরা পড়ে গেলাম—'

'কে-জি-বি আগেই আমার পিছু নি·ছিল, এবার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল —তুমি ভগবদগীতা অনুবাদ করছ, কৃষ্ণপ্রচার করে বেড়াচ্ছ, ঠিক কিনা ? এবার একটু বলো দিকিনি, তোমার প্রচার কেন্দ্রগুলি কোথায় ?'

'তুমি না বললেও আমরা ঠিক খবর রাখি,' প্রেমাবতীকে চুপ করে থাকতে দেখে কে-জি-বির লোক আস্ফালন করতে লাগল—'কোথায় কখন তুমি সোভিয়েৎ নীতিবিরোধী ধর্ম-প্রচারের কাজ করছ তার সব খবর আমরা

রোজ পাচ্ছি। সোভিয়েৎ লোকদের বিভ্রান্ত করার এই অপকর্ম থেকে বিরত হও, নইলে—'

'আমি বেশ বুঝতে পারলাম এবার আমার বিচার নিয়ে প্রহসন শুরু হবে', প্রেমাবতী বললেন— 'কিন্তু আমি তখন গর্ভবতী। ভাবলাম, ওরা আমাকে জেলে ঢোকাতে পারবেই না, কারণ সোভিয়েৎ দেশের আইনে গর্ভবতী মেয়ের কারাদণ্ড হতে পারে না।'

'দেখুন বাইরে তখন আমার অনেক কাজ,' জেলে যেতে ভয় হয়েছিল কিনা প্রশ্ন করলে প্রেমাবতী দেবীদাসী বললেন 'সুতরাং জেলে পচে মরবার তো কোনো অর্থ হয় না।'

দুঃখের কথা গর্ভবতী হবার প্রমাণপত্র দাখিল করা হলেও প্রেমাবতীর কিন্তু জেল হয়েছিল, জেলের পর বিচার শুরু হয়েছিল। এবং শেষপর্যন্ত তাঁকে চারবছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

'খাবার তো নয় বিষ, জেলের আহার্য প্রসঙ্গে প্রেমাবতী বললেন—'আমি তা কখনও কৃষ্ণকে নিবেদন করতাম না। অবশ্য লেবার ক্যাম্পে থাকা কালে একবার ভালো একটি আপেল পেয়েছিলাম এবং যথারীতি কৃষ্ণকে নিবেদন করে সেই প্রসাদ খেয়েছিলাম।'

'আমি তখন আমার গিরিধারীলালকে খুব ডাকতাম—তাড়াতাড়ি মুক্তি পেয়ে যাতে আমি তাঁর কাছে তাঁর সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারি।'

'নাহ, জেল-কর্তাদের কেউ আমার গায়ে হাত তোলে নি,' প্রেমাবতী আরও জানালেন—'তবে সহবন্দিনীরা আমাকে খুব পেটাই করেছিল। তার ফলেই বোধহয় পেটের মেয়েটির মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। জেলের মধ্যেই সে ভূমিষ্ঠ হয়, জেলেই তার মৃত্যু ঘটে।'

'ওরা ছিল যতো সব চোর গুণ্ডা, নরঘাতিনী', সহবন্দিনীদের সম্বন্ধে প্রেমাবতীর মন্তব্য—'অবিরাম ওরা খিস্তি খেউড় করত, অশ্রাব্য গালি-গালাজ করত—'

'ভেবে দেখুন, আমি একজন বুদ্ধিজীবিনী, সবচেয়ে বড় কথা আমি একজন কবি—কবিতা লিখে প্রতিযোগিতা ভিত্তিক পুরস্কারও পেয়েছিলাম।

আর আমার ভাগ্যে কিনা এমন তস্করলভ্য লাঞ্ছনা !'
কবিতার খাতা বের করে প্রেমাবতী এবার আমাকে একটি স্বরচিত ইংরেজী কবিতা পড়ে শোনালেন, বাংলা অনুবাদে যা অনেকটা এইরকম—

'আমি বড় আর্ত, আমি ক্লান্ত
আর্ত আর ক্লান্ত, কারণ আমি যে নারী,
মেয়ে মানুষ হয়ে যে আমি জন্ম নিয়েছি—
আমার মোহের ঘোর থেকে, অকিঞ্চনের জঞ্জাল থেকে
হে কৃষ্ণ, আমাকে মুক্ত করে দাও—
হাত ধরে এগিয়ে দাও মোরে
তোমার আপন দেবালয়ের দিকে—
তোমার মধুর সান্নিধ্যের ধারে আমাকে পৌঁছে দাও।'

'পৃথিবীর কেউ কখনও ভাবতে পারে নি, সোভিয়েৎ জেল থেকে আমরা একদিন মুক্তি পাবো', কারাজীবনের স্মৃতিচারণ করতে করতে প্রেমাবতী বললেন—'কিন্তু আমাদের কেন জেলে ঢোকানো হয়েছিল ? কারণ আমরা কৃষ্ণ নাম করি। এমন কড়া প্রহরায় আমাদের রাখা হয়েছিল, যাতে কৃষ্ণ নাম মুখে আনা আর সম্ভব না হয়।'
'সব সময়েই কিন্তু আমার মন বলত, কৃষ্ণ কিছুতেই চোখ বুজে থাকবেন না, ব্যবস্থা একটা কিছু করবেনই করবেন ; সব গোলমাল একদিন মিটে যাবেই।'
'সুইডেন থেকে কীর্তিরাজ প্রভু গর্বাচভ এবং রেগনকে আমাদের সব কথা জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। শেষপর্যন্ত তাঁদের বৈঠকহলে আমাদের কারামুক্তির প্রসঙ্গটিও আলোচিত হয়েছিল। অবশ্য তার আগের ব্যাপার অনেকদূর গড়িয়েছিল, বিশ্বের অনেক ধর্মপ্রাণ মানুষ আমাদের কারামুক্তির জন্য মস্কোর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন ; একমাত্র অস্ট্রেলিয়াতেই এক লক্ষ লোক আবেদনপত্রে সই করে আমাদের কারামুক্তি প্রার্থনা করেছিলেন।'
'আমার কিন্তু মনে হয় গর্ভাবস্থায় আমার কারাদণ্ড হয়েছিল স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের

ইচ্ছায়। আমার কন্যা মারিকার কারাগারে জন্ম এবং মৃত্যুর খবর বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়তেই প্রাক-গর্বাচভ মস্কো বড় বিব্রত বোধ করেন—কম্যুনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাবার পক্ষে এ যে মস্ত মওকা, তাও তারা অনুধাবন করেন। জেলে জেলে অত্যাচারের মাত্রা সাময়িকভাবে কমে যায়।'

'এরই মধ্যে একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে—আমাদের কারা-কষ্টে মহাব্যথিত হরিকেশ স্বামী মহারাজ আমেরিকায় বসে নরসিংহ মন্ত্র জপ করেন; দুদিনের মধ্যে এণ্ড্রোপোপভকে মরতে হয়। যথার্থ কৃষ্ণভক্তকে কেউ কষ্ট দিলে অত্যাচারীকে এই শাস্তিই পেতেই হয়—শুধু ভক্তিভরে নরসিংহ মন্ত্রটি জপ করা চাই।'

'প্রশাসক এবং মানুষ হিসাবে গর্বাচভ খুব উদার এবং বুদ্ধিমান—তাঁর আমলেই ইস্কন বৈধ ধর্মসঙ্ঘ বলে ঘোষিত হলো। আমরাও মুক্তি পেলাম।'

'শুধু দীক্ষিত কৃষ্ণভক্ত কি কথা, প্রেমাবতী তাঁর অপর দুটি মেয়ে সম্বন্ধে বললেন—'আমার সরস্বতী আর ব্রজা পর্যন্ত কৃষ্ণনামের মাহাত্ম্য বোঝে। শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ খেতে তাদের কি ভালোই লাগে। আমিই তো রোজ রাঁধি—ভাত ডাল, সব্জী, হালুয়া, চাপাতি, পুরী, পায়েস; রেঁধে ভোগ নিবেদন করে তবেই আমরা প্রসাদ পাই।'

'আমি বিশ্বাস করি, দিনে দিনে আরও অনেক মানুষ ইস্কনে এসে যোগ দেবে, ইস্কনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রেমাবতী মন্তব্য করলেন—পৃথিবীর চেহারা যাবে পাল্টে; ভগবৎ সেবার মহত্তম স্বাদ সবাই একদিন লাভ করবে।'

'জগন্নাথ পুরী আমার সমগ্র মনশ্চেতনার মধ্যে এখনও স্পন্দন জাগায়। পুরীদর্শনের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে প্রেমাবতী বললেন—'আমার মনে হয় পুরী হচ্ছে একটি সীমারেখা—সুপ্রাচীন অতীতের সঙ্গে বর্তমানের মিলন রেখা!'

৬

রাশিয়ায় শ্রীকৃষ্ণ এবার বহু মানুষের হৃদয়মনে স্থান করে নিয়েছেন, খাস মস্কো শহরের রাজধানীতে এখন তাঁর অনেক ভক্ত। তাঁদেরই একজনের নাম বিশ্বামিত্র দাস। তাঁর নিজের কথাতেই এই আলোচনা শুরু করা যাক—

'আমার জন্ম এক বৈজ্ঞানিক পরিবারে—বাবা ছিলেন বিখ্যাত একজন বায়ো-কেমিস্ট, মা বায়ো ফিউজিসিস্ট। তাঁদের তুজনেরই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রী রয়েছে ; তুজনই সোভিয়েৎ দেশের খুব সম্মানিত নাগরিক। ঐহিক জীবনে শ্রেষ্ঠকাম্য হিসাবে অর্থ, বিদ্যা, সম্পদ সবই তাঁদের আছে, হয়তো প্রয়োজনের চেয়ে কিছু বেশি পরিমাণেই। তুঃখের বিষয়, তুজনেই ঘোর নাস্তিক—ভগবদ কথার ধার কাছ দিয়ে কখনও তাঁরা যান না। বাবা মা তুজনেই চেয়েছিলেন, দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা লাভ করে আমিও একজন বিজ্ঞানবীর হই। সর্বতোভাবে তাঁদের মতো মানুষই হই। কিন্তু সব কিছুর ওপর ছিল স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা।

বিশ্বামিত্রের নাম ছিল তখন ভ্লাদিমির ক্রিষ্টাকি। তাঁকে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল দেশের সর্বোৎকৃষ্ট গণিতবিদ্যালয়ে। সর্ব সাধারণ ঘরের কারও সেখানে প্রবেশ অধিকার নেই। এই ধরনের ইস্কুল মস্কোতে নাকি মোটে তুটি আছে, একটিতে পড়ানো হয় ইংরেজী। ভর্তির জন্য তু জায়গাতেই প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হয়।

গণিত ইস্কুল থেকে আমি পাশ করে বেরোলাম, বিশ্বামিত্র দাস বললেন—'দেশের প্রায় কেউই এই তুটো ইস্কুলের কোনো খবর রাখে না—গণিত পদার্থবিদ্যা ইংরেজী শিক্ষকদের আপন গণ্ডীর লোক ছাড়া এখানে কেউ ঢুকতেই পারে না।'

'একদিন বাবা আমাকে সঙ্গে নিয়ে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে হাজির হলেন। মস্কো নদীর ধারে লেনিন হিল্‌সের মূল ভবনে গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিজ্ঞান ইত্যাদি বিভাগগুলি রয়েছে। লেনিন হিল্‌সে গিয়ে বাবা বললেন—'এই হচ্ছে তোমার আসল জায়গা। বিষয় নির্বাচনের দায়িত্ব তোমার—তবে আমি চাই, তুমি একজন নামজাদা বিজ্ঞানী হবে।'
বায়ো কেমিস্ট্রীতে সেরা নম্বর পেয়ে পাশ করার পরই ভ্লাদিমির পদার্থবিদ্যার ক্লাশে ভর্তি হলেন—পাঁচবছরের পাঠক্রম তিনবছরে শেষ হলো। আর তখনই তাঁকে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা নিতে যেতে হলো। ফিরে এসে আবার শুরু হলো পোস্টগ্র্যাজুয়েট ক্লাশ। এবং তিন বছর পর তা যখন শেষ হলো, তখন তাঁর কানে এলো কৃষ্ণনাম, যমুনা তীরে বংশীধ্বনির মতো। যোগাযোগ ঘটল ইস্কনের সঙ্গে।

ভ্লাদিমির মস্কোর এক যোগব্যায়াম ইস্কুলে হঠযোগ শিখতে শুরু করেছিলেন। সেই ইস্কুলের শিক্ষক ইউরি. মিশিঙ্কো ভারতে এসে চারবছর লক্ষ্ণৌতে যোগ শিক্ষা করেছিলেন। এই ইউরি মিশিঙ্কোর কাছেই ভ্লাদিমির যোগবিদ্যা এবং ভারতের অধ্যাত্ম সাধনার অনেক কথা শুনেছিলেন। মস্কোর যোগবিদ্যালয়টি কিন্তু বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে তার আগেই রাশিয়ায় প্রভুপাদের প্রথম শিষ্য অনন্তশান্তির সাক্ষাৎ ভ্লাদিমির পেয়ে গিয়েছিলেন। এবার তাঁরই প্রত্যক্ষ পরিচালনায় ভ্লাদিমির হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে শুরু করে দিলেন। নিরামিষ খাওয়ার অভ্যাস তো আগেই রপ্ত হয়ে গিয়েছিল।
হঠযোগ শিক্ষক মিশিঙ্কো তাঁকে ঈশ্বর সম্বন্ধে স্পষ্ট করে কখনও কিছু বলেন নি, তবে আহার, নিদ্রা এবং আমোদ প্রমোদ সম্বন্ধে যে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা উচিত, তা প্রায়ই বলতেন। বিশ্বামিত্রের মন-বুদ্ধি-আত্মাকে যে তিনি ভগবদ পথে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই বলেই বিশ্বামিত্র জানালেন।
রাশিয়ার লোকের মধ্যে তখন ধর্মপুস্তক পড়ার খুব একটা ঝোঁক এসেছে, পাগলের মতো সবাই তাই খুঁজে ফিরছে। একটা বাইবেলের দাম তখ:

হাজার টাকা উঠে গিয়েছে, তবু তেমন মিলছে না। গীতার অবস্থাও তথৈবচ।' অবশ্য যে গভীর অধ্যাত্ম জ্ঞান গীতা পড়ে লাভ হতো তার তুলনায় হাজার টাকা কিছুই নয়, বিশ্বামিত্র বললেন—'দাম এখনও তেমন কম নয় তবে পাওয়া যাচ্ছে, এই যা আশ্বাসের কথা।'

তখন একজন শ্রমিকের বেতন ছিল ছুশো রুবল অথচ বিজ্ঞান গবেষকের সহযোগী হিসাবে কাজ করে বিশ্বামিত্র পেতেন দেড়শো রুবল। এখনকার মুদ্রামানের হিসেবে ছু'হাজার একশ টাকার মতো! তবু গীতা, ভাগবৎ এবং ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে অন্য অনেক বই কিনে বিশ্বামিত্র পড়তে লাগলেন। শেষপর্যন্ত প্রভুপাদের 'ভাগবদগীতা এ্যাজ ইট ইজ' পড়ার পর তাঁর স্পষ্ট ধারণা হলো গীতাই সমস্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞানের চরম ও পরম কথা।

বিশ্বামিত্রের দীক্ষা হয় —সুইডেন থেকে হরিকেশ মহারাজ ডাক যোগে দীক্ষার মন্ত্র পাঠিয়ে দেন। কথা ছিল, মহারাজ স্বয়ং মস্কোতে এসে চল্লিশজন ভক্তকে দীক্ষা দেবেন—তিনি এসেছিলেনও, কিন্তু ছু'দিনের মধ্যে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়। বহিষ্কারের সেই আদেশ তাঁর বিরুদ্ধে এখনও বলবৎ রয়েছে, বলবৎ রয়েছে কীর্তিরাজ প্রভুর বিরুদ্ধেও, যদিও সবার অনেক আশা, সেই আদেশ এবার তুলে নেওয়া হবে—আবার তাঁরা রাশিয়ায় যেতে পারবেন।

'দীক্ষার পর আমার মনে হলো, আমি যেন কৃষ্ণের সান্নিধ্যে রয়েছি', ভক্তি আর বিশ্বাসের আবেগে বিশ্বামিত্র বললেন—'সাধনার পথে যেন অনেকদূর এগিয়েছি। হরিকেশ মহারাজ সুইডেন থেকে ফোনে ডেকে আমার সঙ্গে কথা বললেন। তখনকার মানসিক অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করার সাধ্য আমার ঠিক এই মুহূর্তে একটুও নেই—'

'কীর্তিরাজ প্রভুও ফোন করে আমাকে বললেন—এবার শুধু পড়াশোনায় উঠে পড়ে লেগে যাও। প্রভুপাদের বইগুলো খুব মন দিয়ে পড়।'

'আমার দীক্ষার খবর পেয়ে মা বাবার প্রতিক্রিয়া অবর্ণনীয়—তাঁরা একেবারে ভেঙে পড়লেন ; ইস্কন যে আমার বিজ্ঞাননিষ্ঠ জীবন ধ্বংস করে দিতে

চলেছে তা নিয়ে অনেক বিলাপ করলেন ; বিশ্ববিদ্যালয় যে আমাকে ছুড়ে ফেলে দেবে, শেষপর্যন্ত ডক্টরেট ডিগ্রী থেকেও বঞ্চিত করবে তার ভবিষ্যৎ বাণী করলেন—'

'আমি কিন্তু তাঁদের সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা না করে বললাম—তোমাদের কাছে আমি অনেক কিছু পেয়েছি ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে শরণ নিয়ে আমি এমন সম্পদ পেয়েছি যা কখনও তোমাদের ছিল না।'

আমার কথা শুনে মা-বাবা বজ্রাহতের মতো পড়ে রইলেন, কারণ বিজ্ঞানী-রূপে আমার সফল জীবনের সম্ভাব্যতা তাঁদের সমস্ত মনোশ্চেতনাকে এতদিন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।'

বাবামায়ের আশঙ্কা কিন্তু শীগগীরই সত্যে পরিণত হলো,

মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বামিত্রকে বহিষ্কার করল। তার বিভাগীয় কর্তা অগ্নি-শর্মা হয়ে বললেন—'তুমি কৃষ্ণচেতনা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত, তাছাড়া ফোনে সুইডেন আমেরিকা ইংলণ্ডের সঙ্গে কথা বলে চলেছ—তোমার ধৃষ্টতার শেষ নেই। তোমাকে এক মাস সময় দেওয়া হচ্ছে—হয় কৃষ্ণ, নয়তো বিশ্ব-বিদ্যালয় বেছে নাও—'

'ভদ্রলোককে দোষ দিয়ে লাভ নেই', আপন বাবা, মায়ের সম্বন্ধে তাঁর আগের মন্তব্য অনুসরণ করে বিশ্বামিত্র বললেন—'তিনি সামান্য একজন পদার্থবিদ মাত্র—পরমার্থের সঙ্গে আপোষ করা তাঁর পক্ষে তো সম্ভব নয়।'

'আমি তাঁর কথা শুনে আর কিই বা করতে পারতাম, মুচকি হেসে বিশ্বা-মিত্র বললেন—'শেষ পর্যন্ত কিনা কৃষ্ণভক্তদের ডেকে এনে লেনিন হিল্‌সে ঢুকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ভবনে কৃষ্ণকীর্তন শুরু করে দিলাম। তারপর প্রসাদ তৈরী করে সবার মধ্যে বিতরণ করলাম!'

বিদ্রোহ আর কাকে বলে!

ক্যালকুলেটিং-ম্যাথ্‌স্‌-চিফ ভীষণ রেগে গিয়ে বিশ্বামিত্রকে বললেন—'তা হলে এই হচ্ছে তোমার কীর্তিকলাপ? একেবারে খাস বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে তাণ্ডব শুরু করে দিয়েছ।'

তাঁর অবিরাম চীৎকার-চেঁচামেচির জবাবে বিশ্বামিত্র তৎক্ষণাৎ বিজ্ঞান-

গবেষক-সহযোগীর পদে ইস্তফা দিলেন।

সব শুনে বাবামায়ের দুঃখের আর সীমা রইল না ; বিস্ময়ের ঘোরে বিলাপ করতে করতে আবার তাঁরা বললেন—'আহা রে, বাছার চাকরি গেল, পি-এইচ-ডি ডিগ্রীটাও বরবাদ হলো।'

কীর্তিরাজ প্রভু কিন্তু সুইডেন থেকে ফোনে ডেকে খুব উৎসাহ দিয়ে বললেন—'একটুও ঘাবড়াবে না, কৃষ্ণ তোমাকে আধ্যাত্মিক ডিগ্রী দেবেন।'

অনন্তশান্তিও একটি আশ্চর্য কথা বললেন, তিনি যুক্তি দেখিয়ে বললেন যে সি-আই-এর লোক দেশপ্রেমিক আমেরিকান, কারণ তারা আমেরিকার স্বার্থেই কাজ করে। রাশিয়ার কে-জি-বিও একই কারণে দেশ-প্রেমী। কিন্তু কৃষ্ণভক্ত বিশ্বপ্রেমিক—তাঁরা বিশ্বের সব প্রাণীরই বন্ধু।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ হারিয়ে বিশ্বামিত্র তখন অন্য আর একটি অস্থায়ী চাকরি জুটিয়ে নিয়েছেন, ইউ-এস-এস-আর রিভার ফ্লিট ইনস্টিটিউটে চিফ এঞ্জিনীয়ার হিসেবে। কম্পিউটর প্রোগ্রাম নিয়ে ছিল তাঁর কাজ কর্ম। কিন্তু আবার তাঁকে চাকরি খোয়াতে হলো— তাঁকে গ্রেফতার করা হলো। মা বাবা সব শুনে এবার একেবারেই ভেঙে পড়লেন। 'তাঁরা তো নেহাত বস্তু-জগতের লোক,' বিশ্বামিত্র বললেন—'ঐহিক সুখসম্পদ অর্থ প্রতিপত্তি এবং মৃত্যু—এই নিয়েই তাঁদের জীবন। সুতরাং অবাক হওয়ার কি আছে!'

'আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, কৃষ্ণের ইচ্ছা ছাড়া পৃথিবীতে কোনো কিছুই সম্পন্ন হয় না। আমার গ্রেফতারের ব্যাপারে তাঁর নিশ্চয় কোনো উদ্দেশ্য আছে। কারাগার তো তাঁর গৌরব—তিনি নিজে জন্মেছিলেন প্রহরীবেষ্টিত দুর্ভেদ্য জেলখানায়।

'সুদীর্ঘ পাঁচ বছর কারাপ্রাচীরের আড়ালে বাস করে বেশ বুঝে নিয়েছিলাম, কৃষ্ণ কি চান। হরিকেশ স্বামী বিষ্ণুপাদ মহারাজও এই সময় বলেছিলেন—যাঁদের গ্রেফতার হতে হয়েছে তাঁরা ভাগ্যবান—কৃষ্ণের করুণা সবচেয়ে বেশি করে যে তাঁদের ওপর বর্ষিত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।'

'ধর্মের সঙ্গে কারও সম্পর্ক থাকলে সাধারণ সহবন্দীরা ভাবে, লোকটা

সম্মানের পাত্র,' আপন কারাজীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে বিশ্বামিত্র বললেন—'আমার সহবন্দীদের মধ্যেও সেই ভাব ছিল। ২২৭ ধারায় (অবৈধ প্রচার কার্যের জন্য এই ধারার প্রয়োগ হয়—শাস্তি পাঁচবছর কারাদণ্ড) আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে শুনে তারা ভারি অবাক হলো। ভারতবর্ষের কথা আগে তারা কখনও শোনে নি, শ্রীকৃষ্ণ কে তাও জানে না।'

'আমাকে তারা প্রশ্ন করতে শুরু করল, আমি কোন্ ধর্ম পালন করি তাও জেনে নিল। সনাতন ধর্ম, রাশিয়ায় শ্রীকৃষ্ণ, ভগবদগীতা ইত্যাদি নিয়ে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত আলোচনা চলতে লাগল। আমার কথায় যুক্তি, আমার মন্তব্য ইত্যাদি তাদের খুব মনে ধরল। আসলে তারা ছিল সব সরল প্রকৃতির লোক, ধর্মের ব্যাপারে অকর্ষিত ভূঁই—চাষ করলেই সোনা ফলতে পারে।'

'নাহ, জেলের খাবার খুব অখাদ্য ছিল না—পাঁউরুটি, পরেজ ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণেই পেতাম। কৃষ্ণের দয়ায় জেলে আমাকে খুব পরিশ্রমের কাজও করতে হয় নি—দু'বছর তো আমি শুধু রেডিওর যন্ত্রপাতি তৈরী করতাম।'

'শেষপর্যন্ত আমাকে পাঠানো হলো উরালে, কাইজাল নামে এক ছোট্ট শহরের ডরমেটারিতে আমাকে সাত মাস রেখে দেওয়া হলো, শর্তাধীন মুক্তিতে। মা সেখানে দুবার গিয়েছিলেন আমাকে দেখতে। অনেক টাকাও দিয়ে এসেছিলেন। আমাকে দেখতে আরও গিয়েছিলেন সদানন্দ দাসের মা। কৃষ্ণ চেতনার বই, গানের ক্যাসেট, শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিত প্রসাদ তিনি আমার জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন।'

'মায়ের দুঃখ তখন চোখে দেখা যায় না। আমি তো আগেও বলেছি, মা বাবাকে দোষ দেওয়া যায় না। এবং সোভিয়েৎ সরকারকেও দোষ দেওয়া উচিত নয়। তাঁদের আদর্শ আর নীতি আমার উল্টোটা—তাঁদের চিন্তা-চেষ্টা-তৎপরতা ঐহিক। আমার পারত্রিক। সংঘাতটা ঐখানেই।'

দারুণ বিপদের ঝুঁকি নিয়ে বিশ্বামিত্র একটি সাংঘাতিক কাজ করতেন, ডরমেটারির কয়েদী লোকদের কৃষ্ণকীর্তন শোনাতেন, কৃষ্ণনাম জপ করতে শেখাতেন, এমনকি তাদের জন্য প্রসাদ তৈরীও করতেন—ভাত, ডাল,

সব্জী, হালুয়া। প্রসাদ খেতে পেলে তাদের বড় আনন্দ হতো। এ সব খবর কর্তাব্যক্তিদের কানে ঠিক গিয়ে পৌঁছে যেত। তারা তাঁকে দ্বিতীয়বার ধমক দিলেন। তাঁর কাছে ভগবদগীতা দেখতে পেয়ে বললেন—'আমরা বেশ বুঝতে পারছি এখানে তুমি আসলে প্রচারকার্যে লিপ্ত রয়েছ—কৃষ্ণ-প্রচার বন্ধ না করলে তোমাকে আবার কিন্তু জেলে যেতে হবে।'

সত্যি আবার তাঁকে জেলে যেতে হলো, ডিসেম্বরে। এবং তারপর আবার পয়লা এপ্রিল। বিশ্বামিত্রকে তিনবছরের কারাদণ্ড দেওয়া হলো। উরালের জেলেই তাঁকে থাকতে হলো। কিন্তু অভ্যেস যায় না মলে—প্রচারের কাজ বিশ্বামিত্র ঠিক চালিয়ে যেতে লাগলেন।

'প্রচার না করে আমার উপায় ছিল না', বিশ্বামিত্র বললেন—'জেলে ঢুকতেই সহবন্দীরা জিজ্ঞেস করলে তোমার নাম কি, কি অপরাধে জেল হয়েছে ইত্যাদি। স্বভাবতই শ্রীকৃষ্ণ-ভগবদগীতা-প্রভুপাদ সম্পর্কে অনেক কথা উঠল, ক্রমে অনেক আলোচনাই হলো—লক্ষ্য করলাম, শুনতে তাদের বেশ ভালোও লাগছে।'

'ভেবে দেখুন, দেশের নাস্তিক সমাজে লোকগুলো বেড়ে উঠেছে।—কিন্তু মনে মনে সবার ধর্মের প্রতি স্বাভাবিক টান সুপ্ত অবস্থায় ঠিক বজায় রয়েছে ; একটু নাড়াচাড়া পেলেই তা জেগে ওঠে। সাময়িক উচ্ছ্বাসে তারা যে আমার কাছে কৃষ্ণ কথা শুনত, । নয়—জেল থেকে মুক্তি পেয়ে আবার আমাকে দেখতে, আমার কথা শুনতে সবাই মস্কোতে ছুটে গিয়েছিল, ভগবদগীতা এবং অন্য অনেক বই কিনে নিয়ে ঘরে ফিরেছিল। প্রসাদ তৈরী করে আমি তাদের সবাইকে খাইয়ে ছিলাম।'

শুনে অবাক হবেন, দ্বিতীয় পর্যায় কারা[illegible] প্রসঙ্গে বিশ্বামিত্র বললেন—'তখন আমার যক্ষ্মারোগের চিকিৎসা চলছে—জেলে বসে দিব্যি দুধ, মাখন, ফল, সাদা পাঁউরুটি, মিষ্টি ইত্যাদি সবই খেতে পাচ্ছি, জেলে যা কল্পনাও করা যায় না। আসলে কৃষ্ণের চালাকি ছাড়া এ কিছুই নয়, নইলে আমার যক্ষ্মা-চিকিৎসার প্রশ্ন দেখা দেবে কেন!'

ডিসেম্বরে বিশ্বামিত্রের চূড়ান্ত কারামুক্তি ঘটে। তখন

মস্কোতে তাঁর কোনো স্থায়ী ঠিকানা নেই—অবৈধ ইস্কনের সঙ্গে যোগাযোগ থাকার অপরাধে নিজস্ব ফ্ল্যাটটি আগেই বাজেয়াপ্ত হয়ে গিয়েছিল কেবলমাত্র সরকারি হুকুমের বলেই। মস্কো শহরের নাগরিক অধিকারও তাঁকে হারাতে হয়েছিল।

তবু যাক, মস্কোতে তখন মা বাবা ছিলেন—তাঁদের সঙ্গে সাময়িক বসবাসের অনুমতিও সরকার থেকে দেওয়া হলো। সবচেয়ে বড় কথা অস্থায়ী বাসিন্দা বলে ঘোষিত হলেও তাঁকে ভারতে তীর্থযাত্রা করতেও সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। এজন্য এখন তাঁর অবশ্য কৃতজ্ঞতা বোধের শেষ নেই।

'ভাবুন একবার,' ভারত দর্শন প্রসঙ্গে বিশ্বামিত্র বললেন—দু'বছর আগে ছিলাম উরালের বন্দীনিবাসে, এখন রয়েছি ভারতে। বিশেষ করে মায়াপুরে, এই মায়াপুরে একদিন আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, যিনি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। মহামতি গর্বাচভের জন্যই আমাদের মায়াপুরে তীর্থযাত্রা করা সম্ভব হয়েছে। গর্বাচভ বড়ই উঁচুদরের লোক।'

এবার কথা উঠেছিল শ্রীকৃষ্ণের জন্ম স্থান মথুরা নিয়ে, মথুরার কথায় তাঁর দুচোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল। 'আমি জেগে ছিলাম তা কোনো ব্যাপারই নয়; বিশ্বামিত্র দাস বললেন—'স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে মথুরার জেলে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন সেই কথাটি সোভিয়েৎ দেশে ব্যাপকভাবে প্রচার করার দরকার আছে।'

এবার উঠেছে বিশ্বামিত্রের সাংসারিক কথা। স্ত্রী আনন্দচিন্ময়ী দেবীদাসী কাজাকস্তানেব মেয়ে; জন্ম তাঁর খৃস্টান পরিবারে। আনন্দ চিন্ময়ী কৃষ্ণভক্ত হয়েছিলেন। কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে এসে বিশ্বামিত্র তাঁকে বিয়ে করেন। পাশ-করা চিত্রশিল্পী হলেও আনন্দচিন্ময়ীর চাকরি জোটে নি, কারণ তো সেই একই—মস্কোতে কোনো স্থায়ী ঠিকানা নেই। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় রুজিরোজগারের পথ বলতে সবই আবার সরকারি চাকরি। সামান্য সেলাইয়ের কাজ থেকে আনন্দচিন্ময়ীর এখন যৎসামান্য আয় হয়। বিশ্বামিত্র নিজেও প্রভুপাদের রচনাবলী রাশিয়ায় অনুবাদ করতে শুরু করেছেন। এটাও একটা আয়ের পথ বটে।

'এই যে আমাদের এখন জীবিকা বলতে তেমন কিছু নেই, কোনো সম্বল নেই, স্থায়ী ঠিকানা পর্যন্ত নেই, এই বরং ভালো হয়েছে, পার্থিব বিষয়-সম্পদের সব মালিকানা আমাদের ত্যাগ হয়ে গেছে—হয়তো উপনিষদের বাণীই আমাদের জীবনে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। একেবারে প্রথম শ্লোকেই তো উপনিষদের ঋষি বলেছেন—

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধ : কস্য স্বিদ ধনম্।

আমি কিন্তু অবাক হয়ে বিশ্বামিত্রের সংস্কৃত ভাষায় আবৃত্তি লক্ষ্য করছিলাম —রোমান হরফে পাঠ করেও যে বিশ্বামিত্র এমন অনেক শ্লোক নির্ভুল ভাবে মনে রাখতে পেরেছেন, প্রসঙ্গ অনুসারে ব্যবহারও করছেন, ভাবতে আমার ভালো লাগল। জগতে সব কিছুই যে ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং সেই ঈশ্বরই যে সব কিছুর মালিক, তাই ব্যাখ্যা করতে বিশ্বামিত্র বললেন—'ক্যাপিট্যালিস্টরা কোনো কিছুরই মালিকানা দাবী করতে পারে না ; আবার কম্যুনিস্টরা যদি বলে শ্রমিক লোকই সব কিছুর মালিক তাও ঠিক নয়। ভোগের উপাদানগুলি পরমেশ্বর ভগবান নিজে সৃষ্টি করে দিয়েছেন, উপরোক্ত দুই দলের কেউই নয়। যে মাটি, জল, কাঠ, পাথর, লোহা, ইত্যাদি উপাদান দিয়ে আমরা বাড়ি বানাই বা কারখানা গড়ি, সেই মাটি জল-কাঠ পাথর আমরা নিজেরাই তৈরী করতে পারি না—স্বয়ং প্রভুপাদের ব্যাখাও তাই। তা হলে ধনীকরা বা শ্রমিকরা আবার মালিক কিসের ? এই কথাটা মনে রাখলে শান্তি বজায় থাকবে, ক্যাপিট্যালিস্ট-কম্যুনিস্ট উৎক্ষেপ তীব্রতা হারাবে—মালিকানা ত্যাগের আনন্দ নিয়ে আমরা সর্বসময় ভগবানের দান ভোগ করতে পারব, উপনিষদ যাকে বলেছেন তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা।'

ইস্কনের ভবিষ্যৎ আসলে সারা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ, উপসংহারে বিশ্বামিত্র প্রভু বললেন—'অতীতে আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিতরণ করতে অনেক সংস্থাই গড়ে উঠেছিল। এখন ইস্কন একমাত্র আধ্যাত্মিক সংস্থা, যা ভগবান সম্বন্ধে লোককে জ্ঞান দেবার যোগ্যতা অর্জন করেছে।'

৭

রাশিয়ায় কৃষ্ণভক্ত হওয়া, আর অন্য দেশে কৃষ্ণভক্ত হওয়া যে এক নয় তা হয়তো একাধিকবার আমাদের উল্লেখ করতে হয়েছে। ওয়াশিংটনে কিংবা ফিলাডেলফিয়ার সড়কে গেরুয়া পরে তিলক কেটে শিখা দুলিয়ে ধেই ধেই করে নেচে বেড়াও, কৃষ্ণনাম কর, কেউ কিছু বলবে না। প্রাক্-গর্বাচভ সোভিয়েৎ দেশে সেটি হবার জো ছিল না। সেখানে ভগবানের নাম করার অর্থ শুধু একটিই ছিল—তোমার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছে, সুতরাং আসল স্থান হচ্ছে তোমার মানসিক হাসপাতাল। সন্ন্যাস দাসের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি—কৃষ্ণনাম করার অপরাধে মানসিক চিকিৎসার নামে তাঁকে বিস্তর লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে, শারীরিক মানসিক অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে।

পূর্বাশ্রমে সন্ন্যাস দাস ছিলেন সিওরেন কার্পেটিয়ান। জন্ম সূত্রে আর্মেনিয়ান খৃস্টান হলেও তাঁর বাবা মা ছিলেন ঘোর নাস্তিক এবং ঘোর কম্যুনিস্ট। পেরেস্ত্রৈকার পর নাকি এখন তাঁরা খোলস পালটেছেন, কৃষ্ণভাবনাকে ভালো চোখে দেখছেন—এমনকি কৃষ্ণকে গ্রহণ করতেও এখন নাকি তাঁরা প্রস্তুত হয়ে পড়েছেন।

'হতেই হবে, সন্ন্যাস দাস মন্তব্য করলেন—'বেঁচে থাকতে গেলে একটা বিশ্বাসের অবলম্বন চাই, আসলে ধর্ম বিশ্বাস। মা এখন খোলাখুলি বলছেন 'কৃষ্ণ সম্বন্ধে তোমার কথাগুলো যেন ঠিকই মনে হচ্ছে, বাছা।'

'অর্থটি খুবই সোজা—কৃষ্ণ এখন তাঁদের বিশ্বাসে একেবারে পুরোপুরি জন্মে গিয়েছে।'

সিওরেনের বিদ্যারম্ভ হয়েছিল আর্মেনিয়ার এরেবান শহরে, ইস্কুল কলেজের প্রাকার পেরিয়ে শেষপর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার টেকনোলজিতে

তিনি ডিগ্রী লাভ করলেন, তারপর কাজ শুরু করেন একটি ইনস্টিটিউটে —ইনস্টিটিউট বলতে ওদেশের পক্ষে বিশেষ প্রতিষ্ঠান, যেখানে গবেষণার সুযোগ রয়েছে। সেই ইনস্টিটিউটের কর্মস্থলে তাঁর মর্যাদা ছিল। খাতির ও খ্যাতি ছিল।

অবশ্য আগেই তাঁর মনে একটি অধ্যাত্ম চিন্তার উন্মেষ ঘটেছিল। ওদিকে পৃথিবীময় সাধাবণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা তাঁকে খুব ভাবিয়ে তুলেছিল।—পৃথিবীর কত লোক ক্ষুধিত, রোগগ্রস্ত, গৃহহীন —এমন অবস্থায় নিজের ভোগ সুখের জন্য লালায়িত হওয়াটা তাঁর উচিত বলে মনে হয় নি ; মনটা বড়ই সংসার বিমুখ হয়ে পড়েছিল। আর তখনই এক বন্ধু রাজযোগ সম্বন্ধে একটি বই তাঁকে উপহার দেয়। এবং ভগবান সম্বন্ধে সেই প্রথম তাঁর মনে একটা ধারণা জন্মে। অথচ এতদিন শুধু একটি ধারণাই ছিল, যে ভগবান নেই আত্মা বলেও কিছু নেই। এবার কিন্তু সেই মনটি বলতে শুরু করল ভগবান আছেন, আত্মা আছেন। এবং এই কথা মেনে নিলে কোনো মহাভারতই অশুদ্ধ হয় না!

অধ্যাত্মপথে যাত্রার এই শুরু। বাজযোগ ছাড়া সিওরেন আরও বইপত্র খুঁজতে লাগলেন। বিপ্লবের আগে মুদ্রিত সরকারি সংস্করণের একটি রাশিয়ান গীতা তিনি পেয়েও গেলেন—কিন্তু তাতে না ছিল তেমন কোনো ব্যাখ্যা, না তেমন কোনো টীকা-টিপ্পনী। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর মনে ধারণাটা তখনও সজাগ রয়েছে এবং সেটি মনের মধ্যে পুষে রাখতে তাঁর ভালোও লাগছে—সাধারণ স্তর থেকে একটুখানি উন্নত স্তরে পৌঁছানো গেছে বলে তাঁর যেন মনে হয়। এবার বাইবেল পড়ে তাঁর আরও মনে হয় গীতা আর বাইবেলে হয়তো খুব একটা তফাৎ নেই—দুটোকেই তাঁর ভগবানের বিশেষ দান বলে মেনে নিতে ইচ্ছে করে।

অল্পদিন পরের কথা। এরেবানের এক কৃষ্ণভক্ত প্রভুপাদের একখণ্ড 'ভগবদ গীতা এ্যাজ ইট ইজ' যোগাড় করে এনে দিলে তাঁর সামনে অধ্যাত্ম জগতের সিংহদ্বার উন্মোচিত হয়ে যায়। সিওরেন হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে শুরু করেন ; আমিষ আহার, মদ, জুয়া, অবৈধ যৌনতার সম্পর্ক শূন্য হয়ে সংযত

জীবন যাপন করে।

'বাইবেল কোরাণ এবং বৌদ্ধ ও জরাস্ট্রীয় ধর্মশাস্ত্রাদি পড়ে মনে হলো', শ্রদ্ধার আবেগে সন্ন্যাস দাস বললেন—'ভগবদগীতা অনেক গুণে মহান, অনেক বেশি উচ্চকোটির কথা, সুমহান অধ্যাত্ম দর্শনের কথা গীতায় স্থান পেয়েছে—'

'ক্রমে আমি বেদ, উপনিষদ শ্রীমদ ভাগবতমও পড়লাম। প্রভুপাদের অন্য সব বইও বাদ গেল না। সঙ্গে সঙ্গে প্রচার অভিযানও চলতে লাগল—প্রচার বলতে প্রভুপাদের বই বিক্রী প্রসাদ বিতরণ ইত্যাদি। এবং এই সূত্রে মস্কোতে গিয়ে যোগাযোগ ঘটল প্রেমাবতী ও অন্য অনেক ভক্তের সঙ্গে। মস্কো থেকে আর্মেনিয়ায় ফেরার ছমাসের মধ্যে খবর এলো প্রেমাবতীকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে।'

ঐ সালেই হরিকেশ মহারাজ ডাকযোগে সিওরেনকে দীক্ষা দেন, নাম হয় তার সন্ন্যাস দাস। সারা রাশিয়ায় কৃষ্ণ ভক্তদের নিয়ে তখন পুলিশী তাণ্ডব চলছে। শেষপর্যন্ত ২রা নভেম্বর কে-জি-বির লোক এসে তাঁকেও ধরে নিয়ে জেলে পুরে দিলে। অবশ্য আগেই এর আঁচ করতে পেরে সন্ন্যাস দাস বাড়ি থেকে পালিয়ে যান—কে-জি-বি অগত্যা শ্রীকৃষ্ণের ছবি এবং বিগ্রহ, প্রভুপাদের সব বই ধূপশলা ইত্যাদি লোপাট করে নেয়।

'শেষপর্যন্ত এরেবানের এক সড়ক ধারে ওরা আমায় ধরে ফেললে, গ্রেফতার প্রসঙ্গে সন্ন্যাস দাস বললেন—'আর সেই দিনটি ছিল আমার গুরুদেবের আবির্ভাব তিথি।'

সন্ন্যাস দাস জবরদস্ত কৃষ্ণভক্ত—তাঁর উজ্জ্বল দুটি কালো চোখ, প্রশস্ত ললাট, তীক্ষ্ণ নাক, আকর্ণপ্রসারিত জোড় ভুরু। বেশ তেজী পুরুষ হলেও তিনি খুবই বিনয়ী। পুলিশের ধরপাকড় কিংবা জোর-জুলুম তাঁর কাছে কোনো ব্যাপারই নয়। পুলিশ অবশ্য তেমন কোনো খারাপ ব্যবহার তাঁর সঙ্গে করে নি।

'তবে কিনা জেলে খাওয়ার মতো একরকম কিছুই পেতাম না', জেল

জীবনের প্রসঙ্গে সন্ন্যাস দাস বললেন—'রসদ বলতে একদম-কাঁচা তুশো গ্রাম বাঁধাকপি—সঙ্গে না-রুটি, না-পরেজ, না-কিছু। শীগগীরই খুব দুর্বল হয়ে পড়লাম, দেহটা হাড়ডিসার হলো, তার জন্য জেল কর্তারা বোধহয় কিছু ঘাবড়েও গেলেন।'

'আর আমি রাত্রিদিন অবিরাম কৃষ্ণনাম জপ করতে লাগলাম—তাই শেষ পর্যন্ত আমাকে রক্ষা করল। আমি নিশ্চিত প্রমাণ পেয়েছি জপ করা বন্ধ করলেই শরীর খারাপ হতো, মনও খুব ভেঙে পড়ত।

সন্ন্যাস দাসের বিচার শুরু হলো আরও চার মাস পর, প্রমাণের অভাবে তাঁর কারাদণ্ড হলো না, কিন্তু স্থান হলো মানসিক হাসপাতালে। অভিযোগের রকম সেই একই—নিশ্চয় মাথার গোলমাল আছে—মাথা ঠিক থাকলে কেউ কৃষ্ণনাম করে না! সরকার পক্ষের মস্ত সুবিধা এই, কাউকে মানসিক হাসপাতালে ঢোকাতে হলে কোনো প্রমাণ দাখিলের দরকার পড়ে না—বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা এবং ভালো ডিগ্রী থাকা সত্ত্বেও যে লোক ভগবান ভগবান করে, তার মাথা খারাপ নয় তো কি! সরকারের তখন সাফ কথা—মানসিক চিকিৎসার দরকার আছে!

শুধু সন্ন্যাস দাস নয়, অন্য অনেক কৃষ্ণ সন্ন্যাসীকেই মানসিক হাসপাতালে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল, তবে বিভিন্ন শহরে। তাঁদের কারও সঙ্গে একই হাসপাতালে কখনও থাকতে হয়েছিল কিনা জানতে চাইলে সন্ন্যাস দাস বললেন—'এরেবানের মানসিক হাসপাতালে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল শচীসূত, আত্মানন্দ এবং তাঁর ভাই কমলমালার সঙ্গে, নভেম্বরে।'

'শচীসূতের কথাই আজ বিশেষ ভাবে মনে পড়ছে—ধর্ম জগতে তিনি এক মস্ত শহীদ। শচীসূত (সাকিস ওগদ ঝনান) রাশিয়াতে জন্ম নিলেও আচার-আচরণে ছিলেন বৈষ্ণব শিরোমণি। শয়নে স্বপনে তিনি ভগবানের নাম জপ করতেন। প্রসাদ গ্রহণের পর অন্য ভক্তদের থালাবাসন মেজে ধুয়ে দিতে তাঁর খুব তৃপ্তি হতো—কৃষ্ণভক্তের সেবা মানেই তাঁর কাছে ছিল কৃষ্ণ সেবা।'

'প্রভুপাদের বই বিতরণের সময় শচীসুতকে কে-জি-বি ধরে ফেলে, দু'বছর কারাদণ্ডের ব্যবস্থা পাকা করে বসে—কৃষ্ণকে ত্যাগ করলে শীগগীরই মুক্তি পাবে, নইলে সারা জীবন জেলে থাকতে হবে। কোনো কৃষ্ণভক্ত কি কৃষ্ণকে কখনও ত্যাগ করে, নাকি ত্যাগ করতে পারে ?'

'শচীসুতকে শেষপর্যন্ত সাইবেরিয়ার শ্রম-শিবিরে নির্বাসিত করা হয়। দুঃসহ ক্লেশের মধ্যে সেখানে তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাঁর মৃত্যু একজন ধর্মবিপ্লবীর মৃত্যু—। শহীদের মৃত্যু।'

এবার মানসিক হাসপাতালে সন্ন্যাস দাসের দিকে ফিরে তাকানো যাক : ডাক্তার তাকে সাইকোলেপটিক ইনজেকশন দিয়েছেন—তাঁর মনঃসংযোগ ক্ষমতা লোপ পেয়েছে, অস্বস্তি আর রুগ্নতাবোধ সব সময় তাঁকে পাগল করে তুলছে ; চিন্তা-ভাবনা করা, ওঠা বসা, শোওয়া, বিশ্রাম নেওয়া পর্যন্ত গুলিয়ে যাচ্ছে। মন সব সময় অকারণে চঞ্চল হয়ে উঠছে। দিনে তিন তিনটে ইনজেকশন কাঁহাতক আর সহ্য করা যায় ? এবার আত্মহত্যার চিন্তা এসে তাঁর মনে বাসা বেঁধেছে ; সন্ন্যাস দাসের যেন কেবলই মনে হচ্ছে, বেঁচে থেকে কি লাভ !

এমনি করে ঠিক যেন আধো ঘুমে আধা জাগরণে পুরো একটি মাস কেটে গিয়েছে। কৃষ্ণনাম করার কথা তাঁর মুহুর্মুহু মনে পড়েছে, কিন্তু হয়ে ওঠে নি—'কৃষ্ণ' শব্দটাই যেন ঠিকমতো উচ্চারণ করা যাচ্ছে না ; জিহ্বা জড়িয়ে আসছে। ডাক্তারবাবু ঘুঘুর মতো বসে সব লক্ষ্য রেখেছেন। আধা সহানুভূতি আধা কৌতূহল মিশিয়েই যেন তিনি প্রশ্ন করলেন—তুমি কি এখনও জপতপের কথা ভাবতে পারছ, সিওরেন ?

'ভাবতে পারছ' কথাটায় তার কিন্তু কৌতুকের সুর বেরিয়ে এলো।

দেহ এবং মনের সব জোর মিলিয়ে সন্ন্যাস দাস বললে—নিশ্চয় !

'তা বেশ, তা বেশ,' সত্যি এবার কৌতুক করতে করতে ডাক্তার বললেন—'তা হলে তো আরও ইনজেকশন দিতে হবে দেখছি !'

মানসিক হাসপাতালে আসার আগে জেলের মধ্যেই সন্ন্যাস দাস বিপ্লব শুরু করেছিলেন। জেলবাবুরা সন্ধানী চোখে বেশ দেখতে পেয়েছিলেন,

জেলে কৃষ্ণনাম তো করেনই, অধিকন্তু দেয়াল জুড়ে তিনি কয়েদীদের উদ্দেশ্য করে লিখে রাখেন—'তোমাদের উচিত সদাসর্বদা হরে কৃষ্ণ মহা-মন্ত্র জপ করা।'

জেল থেকে সন্ন্যাস দাস অনেকের কাছেই কৃষ্ণভক্তি-উত্তেজক চিঠি লিখতেন। তাঁর এক গুচ্ছ এমন চিঠি ওপর মহলে দাখিল করে জেল সুপার লিখে-ছিলেন—'রাশিয়ার এমন সুন্দর কম্যুনিস্ট সমাজকে এই লোকটা কৃষ্ণের নামে দূষিত করে তুলছে।'

জেল-কর্তৃপক্ষের কাছে ব্যাপারটি ছিল উভয় সঙ্কটের মতো—বে-আদপ কৃষ্ণভক্তকে শাস্তি না দিলেও চলে না, আবার শাস্তি দিতে গেলে বিশ্বজুড়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে, বিদেশের সোভিয়েৎ দূতাবাসের সামনে লোকে বিক্ষোভ জানায়।

শেষ পর্যন্ত মানসিক হাসপাতালের ব্যাপার নিয়ে সত্যি একটি অঘটন ঘটল, জনৈক আমেরিকান সাংবাদিক ওয়াশিংটন পোস্টে একটি প্রবন্ধ ফাঁদলেন—অন্য অনেক নির্মম নির্দয় ব্যবহারের বর্ণনার সঙ্গে হাসপাতালে কৃষ্ণভক্তদের ধরে ধরে নারকোটিক ইনজেকশন দিয়ে উন্মাদ করে তোলার রোমহর্ষক বিবরণও সেই প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছিল। সব জানতে পেরে মানসিক হাসপাতালের কর্তারা ঘাবড়ে গিয়ে এই ইনজেকশন দেওয়া বন্ধ করে দিলেন, আর সেই মওকায় সন্ন্যাস দাস মানসিক হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে গেলেন!

জানুয়ারীতে মুক্তি পেয়েছিলাম', সন্ন্যাস দাস মনের আবেগে বললেন—'ঠিক একবছরের মাথায় আমরা চৈতন্য জন্মভূমি মায়াপুরে এসে গিয়েছি। রোজ এখানে গীতা-ভাগবতের ক্লাশ করছি, নিত্য নতুন অনেক কিছু শিখছি—আমাদের কৃষ্ণচেতনা আরও জাগ্রত হচ্ছে, জাগ্রত হবার নিত্য নতুন পথও তৈরী হচ্ছে।'

'তাছাড়া পৃথিবীর অনেক কৃষ্ণমন্দির থেকে অনেক গুরুমহারাজ এসেছেন গৌর পূর্ণিমা উপলক্ষে। তাঁদের দেখার সুযোগ পাচ্ছি, রোজ তাঁদের কারও না কারও বক্তৃতা শুনছি, গীতা ভাগবতের ব্যাখ্যা শুনছি। এই সৌভাগ্যের

কথা জীবনে কখনও কল্পনাই করি নি।'

'কারামুক্তির পর যে পুণ্যভূমি ভারতের মাটি স্পর্শ করতে পারব, আমাদের যে এমন করে ভারত দর্শন ঘটবে, তাও কখনও কল্পনা করি নি। প্রভুপাদের জন্মভূমি কলকাতা, মহাপ্রভুর জন্মভূমি মায়াপুর, শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসের বৃন্দাবনের ধূলি মাথায় নিয়ে আমাদের মনে হয়েছে, শ্রীভগবানের সঙ্গে আমাদের যেন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে গেছে।'

'আমরা আবার আসব, আবার আমরা কলকাতা-মায়াপুর-বৃন্দাবনের ধূলি মাথায় মাখব,' সন্ন্যাস দাস বললেন—'রাশিয়ার কয়েদমুক্ত ভারত তীর্থযাত্রী পরবর্তী দলের তালিকায় আমার নামটি দেখতে পেলে কৃতার্থ হব।'

৮

কৃষ্ণভক্তদের মধ্যে আত্মানন্দ মস্ত বড় এক বিদ্রোহী পুরুষ, দীর্ঘমেয়াদী কঠোর কারা লাঞ্ছনার ভাগীদার—কৃষ্ণভাবনার সক্রিয়তম প্রচারক। জন্ম তাঁর আর্মেনিয়ার এরেবান শহরে; পূর্বাশ্রমের নাম ছিল ওগানে সাইকেন। এরেবানের নাম শুনেছি আমরা আর এক বৈষ্ণব কৃষ্ণদাসের কথা প্রসঙ্গে। আর্মেনিয়ার রাজধানী এরেবানে জন্ম হলেও ওগানে সাইকেনকে মস্কোয় যেতে হয়েছিল উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করতে; শেষ পর্যন্ত তিনি মস্কোতেই স্থাপত্য-পদার্থবিদ হিসেবে উচ্চতম ডিগ্রী লাভ করেছিলেন। তাঁর পিতৃদেব ভ্লাদিমির সাইকেনও বেশ ভারি মাপের লোক, টেকনিক্যাল সায়ান্সে ডক্টরেট ডিগ্রীধারী। এখনও তিনি আর্মেনিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্টিফিক স্টাডিস এণ্ড বিল্ডিং টেকনোলজির প্রেসিডেন্ট।

ওগানে সাইকেনের ঠাকুর্দা ছিলেন খ্যাতনামা বলশেভিক নেতা, ১৯৩০ সাল পর্যন্ত আর্মেনিয়া রিজিয়নের কর্তাব্যক্তি। ব্যবহারিক জীবনে ওগানেরও খুব উচ্চবৃত্তে বিচরণ করার কথাই ছিল, কিন্তু বাদ সাধলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ—ওগানের কথায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে রক্ষা করলেন। শ্রীকৃষ্ণের শরণ নেবার পর নাম হলো তাঁর আত্মানন্দ।

কিছুদিন আগে আর্মেনিয়ায় যে বিধ্বংসী ভূমিকম্প হয়, তাই নিয়ে শুরু হলো আমাদের আলোচনা, অবশ্য কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণচেতনার প্রেক্ষিতেই।

'আর্মেনিয়ায় তখন আমাদের ভক্ত সংখ্যা ষাট, আত্মানন্দ বললেন—'ভূমিকম্পের অনেক আগেই আমরা মস্কোতে চলে গিয়েছিলাম—আসলে কৃষ্ণ আমাদের মস্কোতে সরিয়ে নিয়ে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন।

'কিন্তু আপনাদের অনেকের অনেক আত্মীয় পরিজনও তো আর্মেনিয়ার এরেবান আর অন্য অনেক জায়গাতেই ছিলেন। তাদের ?'

'তাদের কারও গায়েও আঁচড় লাগে নি, কারও ধনসম্পত্তির ক্ষতি হয় নি, কিংবা বাড়ি ঘরে একটুও ফাটল ধরে নি,' আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আত্মানন্দ বললেন—'মজার কথা, সারা আর্মেনিয়া জুড়ে কিন্তু হাজার হাজার লোক মরেছে, কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে।'

'আরও একটি মজার গল্প বলছি—ভূমিকম্পের তোড়ে এরেবানের একটা ইস্কুলবাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়লে তার সব লোকই চাপা পড়ে মরল, শুধু একজন বাদে—তিনি আমাদেরই এক কৃষ্ণভক্তের দূর-আত্মীয়!

'তা হলে তো বলতেই হয় কৃষ্ণ বড় স্বজন-পোষক—হাসতে হাসতে আমি মন্তব্য করি—'নিজের লোক ছাড়া—'

হাসতে হাসতেই আমাকে বাধা দিয়ে আত্মানন্দ প্রতিবাদ করেন—'কৃষ্ণ বড় দয়াময়। ভক্ত বৎসল। আর শুধু ভক্তকে নয়, তাঁর চৌদ্দ গুষ্টিকে তিনি রক্ষা করেন।'

আত্মানন্দ এবার একটু নিজের কথা বলতে লাগলেন—'মাত্র বারো বছর বয়সে স্বাস্থ্যের কারণে আমি যোগ শিক্ষা শুরু করেছিলাম। ধর্ম সম্বন্ধে কোনো কথাই তখন আমার মনে ওঠে নি। আরও একটু বড় হয়ে জর্জ হ্যারিসনের রেকর্ডে হরে কৃষ্ণ গান শুনে না-কিছু বুঝলাম, না-তেমন ভালো লাগল।'

কিন্তু কথায় বলে পূর্ব জন্মের সুকৃতি—তাই কমলমালাকে সঙ্গে নিয়ে আত্মানন্দ একদিন আর্মেনিয়ার একাডেমি অব সায়ান্সে গিয়ে হাজির হলেন, আধ্যাত্মিক বিষয়ের বইপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করলেন। তারপর ক্রমে বাইবেল আর কোরাণ পড়লেন; বুদ্ধ আর জরাথুষ্ট্রের বাণীতেও কিছুদিন ডুবে রইলেন—সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান জগতে অধুনাতম অগ্রগতির ইতিহাসও তাঁর পড়া হয়ে গেল। এবং একটি অভিনব রচনা পাঠের সুযোগও তিনি গ্রহণ করলেন—সে হচ্ছে আত্মা নিয়ে গবেষণাধর্মী এক রচনা।

আসলে তাঁর মনটি ছিল তখন খুবই অশান্ত। এই সময়ে মহাভারত, ভগবদগীতাও তিনি পড়লেন, উপনিষদও বাদ গেল না—সামান্য একটু ভালো লাগলেও সব যেন পরিষ্কার হলো না। আর তখন যোগাড় হয়ে

গেল প্রভুপাদের 'ভগবদগীতা এ্যাজ ইট ইজ', আত্মানন্দ মনের আনন্দে বললেন—'পড়ে মনে হলো প্রভুপাদ যেন শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের দিন থেকেই তাঁর নিজস্ব সংবাদদাতা নিযুক্ত হয়েছিলেন—নিজে দেখেশুনে, গভীর চিন্তা করে তাই কৃষ্ণ কথার অমন প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করতে পেরেছেন। আসলে ভগবদগীতা আমার মনের গভীরে দাগ কেটে ফেলল।'

'প্রভুপাদ সম্বন্ধেও মনে দারুণ রেখাপাত ঘটল, 'আত্মানন্দ অকপটে স্বীকার করলেন—'অথচ আগে নাম শুনলেও মনে হয় নি, তিনি অমন মহামতি, অমন তত্ত্বজ্ঞানী, অমন গুরু, নেতা, আচার্য। আমার মন বলল, তাঁর মাধ্যমেই বিশ্বে এবার নবযুগ আসছে, জাগ্রত কৃষ্ণচেতনার মধ্য দিয়ে বিশ্বে নতুন এক সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটতে চলেছে—যে কৃষ্ণচেতনা সারা আমেরিকাকে আগেই আপ্লুত করে ফেলেছে।'

'অথচ আমেরিকা সম্বন্ধে আমার ধ্যান ধারণা ছিল কিন্তু অন্যরকম—আমি মনে করতাম। আমেরিকায় বড় জোর শিব কিংবা দুর্গার উপাসনা চালু হতে পারে। আরও ধন দাও, শক্তি দাও, শত্রু-জয়ের সামর্থ্য দাও রকমের প্রার্থনা ভোলা মহেশ্বর হয়তো পূরণ করেও দিতে পারতেন। কিন্তু সেখানে যে উচ্চমার্গের বৈদিক ধর্ম ও সভ্যতা প্রচারের ক্ষেত্র তৈরী হতে পারে আমি কিন্তু ভাবতেই পারি নি।'

সদগুরুর সন্ধান মিলতেই ওগানে সাইকেন দীক্ষা নিলেন; আমেরিকা থেকে হরিকেশ স্বামী বিষ্ণুপাদ পরমহংস তাঁকে দীক্ষা দিলেন ডাকযোগে—নাম যে আত্মানন্দ হলো, সে কথা আমরা আগেই বলেছি।

আমি অবশ্য নিরামিষ খেতাম', আত্মানন্দ বললেন—'এবার শুরু হলো স্বহস্তে রেঁধে ... আহার্য কৃষ্ণে নিবেদন করে প্রসাদ গ্রহণ।'

'এই সব খবরাখবর নিয়ে বাড়িতে দারুণ প্রতিক্রিয়া হলো, বাবা মা খুব আঘাত পেলেন', আত্মানন্দ বলতে লাগলেন—'আমাকে সংসারে ফিরিয়ে নিতে তাঁরা চেষ্টার ক্রটি করলেন না।'

'আশ্চর্যের কথা, বাবা নিজে বৈদিক ধর্ম ও সভ্যতার একজন মস্ত বড় স্তাবক;

অথচ কৃষ্ণভক্ত হতে গিয়ে আমি যাতে সংসার না ছাড়ি তাই ছিল তাঁর প্রাণের সাধ, মনের বাসনা।'

সোভিয়েৎ দেশে তখন ব্রেজনেভের যুগ চলছে, কৃষ্ণভক্তদের নিয়ে সরকারি মহলে চলছে দারুণ হৈ চৈ—তাঁদের ওপর নির্যাতনের আর শেষ নেই, অত্যাচারের অবধি নেই। ব্রেজনেভের পর এলেন এণ্ড্রোপোপভ—তাঁর আমলে হরেকৃষ্ণদের ক্লেশ আরও বাড়ে, শেষ পর্যন্ত চরমে ওঠে। তাঁরা নিরামিষ খান, কৃষ্ণনাম জপ করেন—সরকারি কর্তাদের মতে এ দুই-ই শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। আরও মারাত্মক অভিযোগ, ভগবৎগীতার মূলকথা আসলে অলীক, তা আসলে মায়া (Hallucination), শ্রুতি-বিভ্রম ছাড়া কিছুই নয়। এটি দেশের পক্ষে ক্ষতিকর তো বটেই, কারণ পরিণামে তা সৎ নাগরিকদের মধ্যে মানসিক রোগের সৃষ্টি করতে থাকবে, সমাজের সর্বনাশ করবে—কর্তারা তাই তো বললেন।

'প্রেমাবতী এবং অন্য অনেক কৃষ্ণভক্তকে তো আগেই জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আত্মানন্দ একটু বিজয়ের হাসি হেসে বললেন—কিন্তু ফলটা কি হলো? ইস্কন, প্রভুপাদ, কৃষ্ণচেতনার পক্ষে সারা সোভিয়েৎ রাশিয়াতে অবিশ্বাস্য এবং অভূতপূর্ব প্রচারকার্য ঘটল, কৃষ্ণের দিকে আরও অনেক বেশি লোক আকৃষ্ট হলো।

'শুনেছি প্রেমাবতী গর্ভবতী ছিলেন', আমি যোগ করি—'প্রচলিত কানুনের বিরুদ্ধে তবু তাঁকে জেলে ঢোকানো হয়েছিল। প্রচারকার্যের পক্ষে এটাও হয়তো মস্ত একটি কারণ।'

'প্রেমাবতী গর্ভবতী ছিলেন না, আত্মানন্দ আমাকে সংশোধন করে বললেন—'গর্ভবতী হবার জন্য তাঁকে বোধহয় সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। আগেই তিনি বুঝে নিয়েছিলেন, কঠোরতম শাস্তি তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে।'

আদালতে উপযুক্ত প্রমাণ দাখিল করে তাঁর উকিল বললেন—'সোভিয়েৎ দেশে তো গর্ভবতীর জেল হয় না, তাছাড়া তিনমাস পরই যে তাঁর বাচ্চা হবে।'

'বেশ তো, না হয় জেলের মধ্যেই বাচ্চা হবে—অমায়িকভাবে ওরা জানিয়ে

দিলেন। বিচারাসনে তখন এক মহিলা ছিলেন। সওয়াল জবাবের সময় তিনি প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। প্রেমাবতীর মতো মহাশিক্ষিতা আলোকপ্রাপ্তা মহিলার বিরুদ্ধে এমন বে-নজির কারাদণ্ড তাঁর স্নায়ুকে বোধহয় বিকল করে দিয়েছিল।'

'সন্তান সম্ভবা প্রেমাবতীর কারাদণ্ডের ঘোষণা একদিক দিয়ে ভালোই। সোভিয়েৎ দেশের লোক জানতে পারল, তাঁর অপরাধটা আর কিছুই নয়, তিনি ভগবদগীতা অনুবাদ করেছেন।'

'মুখ ফুটে বলতে না পারলেও জনসাধারণ ভাবলেন, সরকারি কর্তারা নিতান্তই বর্বর—একটা বইয়ের অনুবাদ করা কখনও অপরাধ হতে পারে না। এণ্ড্রোপোপভের আমলে ব্যক্তি স্বাধীনতা বলতে যে কিছুই নেই, সেই মোক্ষম কথাটি তারা বুঝে ফেললেন।'

'ওদিকে প্রেমাবতীর কারাদণ্ডের খবর পেয়ে গুরু মহারাজ ভীষণ রেগে গেলেন, আমেরিকায় বসে তিনি জপ করতে লাগলেন নরসিংহ মন্ত্র—'

'ভক্তের কষ্ট ভগবান সইতে পারেন না', ভক্তের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা দিতে আত্মানন্দ বললেন—'বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত যদি কখনও নরসিংহ মন্ত্র জপ করে, অত্যাচারীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে—বিচিত্র নয়, নরসিংহ মন্ত্র জপ করার পর এণ্ড্রোপোপভ মাত্র দু'দিন জীবিত ছিলেন।

কথাটা অবশ্য প্রেমাবতীও আমাকে বলেছিলেন। মায়াপুরে দ্বিতীয়বারে তাঁর সাক্ষাৎকারে।

প্রেমাবতীর পর তাঁর নিজের দিনও যে ঘনিয়ে আসছে আত্মানন্দও তা বুঝতে পেরেছিলেন। আর্মেনিয়াতে তখন দশ-হাজার ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ ছাপা হয়ে গিয়েছে। তার সঙ্গে আত্মানন্দের প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। সে কথা কর্তাদের কানে ঠিক তখন পৌঁছে গিয়েছে। শাস্তি পেতে কি আর বিলম্ব হতে পারে—অন্য কুড়িজন কৃষ্ণভক্ত-সহ আত্মানন্দকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো।

দুজন বন্দীর জেলে মৃত্যু ঘটে। চারজন এঞ্জিনীয়ার কৃষ্ণভক্তকে সাজা দেওয়া কর্তাদের পক্ষে সম্ভবই হয় নি, কারণ তাঁরা বিজ্ঞান সম্মত যুক্তিতর্ক তুলে

প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, যে উৎকৃষ্টতর সমাজ গড়ে তুলতে কৃষ্ণ-চেতনার প্রয়োজন আছে।

মানসিক হাসপাতালে আত্মানন্দকে ওরা জোর করে নিষিদ্ধ খাদ্য খাওয়ায়, নারকোটিক ইনজেকশন দেয়—ফলে তাঁর মস্তিষ্ক বিকল হয়ে পড়ে। ডাক্তারবাবুরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন, আত্মানন্দ কৃষ্ণনাম ভোলেন নি, এমন কি তাঁর সহ-রোগীদের মধ্যে এই কৃষ্ণনাম প্রচার করতেও তাঁকে দেখা যাচ্ছে—শতকরা সত্তরজন মনো-রোগীই তখন নামকীর্তন, নাম জপ করছেন! কিন্তু অত্যাচারের মাত্রা বাড়ানো সম্ভব হয় না, কারণ বিশ্বময় তখন তোল-পাড় চলছে সোভিয়েৎ কৃষ্ণভক্তদের ওপর জুলুম বাজি নিয়ে।

আত্মানন্দসহ সব কৃষ্ণভক্তদের ইরেবান, মস্কো, বাকু, কাজান, টিবিলিসি ইত্যাদি জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু সেখানেও তাঁরা সহবন্দীদের কানে কানে কৃষ্ণমন্ত্র দেন। কৃষ্ণভক্তদের অনুকূলে ক্রমবর্ধমান সহানুভূতি দেখে আর্মেনিয়ার সরকার কিন্তু ক্ষেপে যান, সাত হাজার গীতা, উপনিষদ সহ পঞ্চাশ হাজার বৈদিক ধর্ম গ্রন্থাদি পুড়িয়ে দেন, জগন্নাথ দেব ও কৃষ্ণের মূর্তি ধ্বংস করে ফেলেন। ভক্তেরা বিচার প্রার্থনা করে কৃষ্ণের কাছে।

'তিন দিনের মধ্যেই কিন্তু ফল পাওয়া যায়', আত্মানন্দ জানিয়ে দিলেন—'হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে পাবলিক প্রসিকিউটর মারা যায় ; তদন্তকারীর শাস্তি হয় অন্য কায়দায়—গাড়ি দুর্ঘটনা ঘটিয়ে তিনজন পথচারীকে ঘায়েল করার অপরাধে তার বিচার হয়—শেষ পর্যন্ত সাত বছরের কারাদণ্ড মেলে।'

জেল কর্তারা রোজ আমাদের ভয় দেখিয়ে বলত, আত্মানন্দ কিন্তু তাদেরই উক্তি উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন—'কেষ্ট-ফেষ্ট ছেড়ে দাও, নইলে সারাজীবন জেলে থাকতে হবে।'

'নিজেদের মধ্যে আমরা তখন বলাবলি করতাম, প্রচারকার্য করতে গিয়ে আমাদের জেল হয়েছে—সুতরাং কৃষ্ণ এবং গুরু মহারাজ নিশ্চয়ই আমাদের রক্ষা করবেন।'

'আত্মার অস্তিত্ব এবং পুনর্জন্মবাদকে পরিহাস করে আর্মেনিয়ান জজ সাহেব বিচারের দিন বললেন—'আত্মা বলে আবার কিছু আছে নাকি,

হেহ্—শরীর বিনাশ হলেই তো সব শেষ হয়ে যায়—'

'আমি বললাম, আত্মার অস্তিত্ব নিশ্চয়ই আছে—শরীর বিনাশ হলেও তার বিনষ্টি ঘটে না, কারণ আত্মার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, শুরু নেই, শেষ নেই ইত্যাদি। গীতার সংশ্লিষ্ট শ্লোকটিও আবৃত্তি করে আমি তাঁকে শোনালাম—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরানো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

'শ্লোকটি শুনে জজ সাহেব কি বললেন?' আত্মানন্দকে আমি প্রশ্ন করলাম—'তিনি কিছু বুঝলেন?'

'কি আর বলবেন', আত্মানন্দ জবাব দিলেন—জজ মহোদয় মিট মিট করে হাসলেন। আমি তখন গীতার আর একটি শ্লোক আবৃত্তি করে আবার বললাম 'পুরানো কাপড় পাল্টে মানুষ যেমন নতুন কাপড় পরে, আত্মাও তেমনি নতুন দেহ প্রাপ্ত হয়।'

জজ সাহেবের মাথায় কিন্তু অতশত ঢোকে না, বালক ঠকাবার কায়দায় ফের তিনি আত্মানন্দকে বলেন, 'একবার মরে গিয়ে আবার জন্ম নিয়েছে তেমন কাউকে দেখাতে পারে ?'

'নিশ্চয়, হেহ্, কি যে বলেন, আত্মানন্দ হাসতে হাসতে জবাব দেন—'গর্বাচভই্ তো সেই লোক, পূর্বজন্মে ছিলেন লেনিন, এখন গর্বাচভ রূপে জন্ম নিয়ে পৃথিবীতে আবার ফিরে এসেছেন।'

বিচার কক্ষ হাস্যরোলে ফেটে পড়ে।

'আমার জেলজীবনে অনেক অলৌকিক ঘটনাও ঘটতে দেখেছি', আত্মানন্দ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে লাগলেন—'কৃষ্ণনাম' খোদাই করে লিখতে গিয়ে এক ভক্ত দেওয়াল ফুটো করে ফেললেন। আর জেলারবাবু তো রেগে আগুন—কৃষ্ণভক্তকে শায়েস্তা করতে তিনি তাগড়াই একটা কুকুর নিয়ে এলেন, সোজা কথায় তাঁকে কুকুরের কামড় খাওয়াতে। কৃষ্ণভক্ত কিন্তু নির্ভয়ে নরসিংহ মন্ত্র আবৃত্তি করতে লাগলেন। এলসেশিয়ানের পো

ল্যাজ গুটিয়ে দে ছুট !'

'আসলে ব্যাপারটা কি জানেন', আত্মানন্দ এবার মন্তব্য করলেন, 'রাশিয়ান শাসকদের অনেকেরই দ্বন্দ্ব সমস্যাটা ঐ ধর্ম নিয়ে, তারা মানব ধর্ম, মানবিক স্বাধীনতা-টতা মানে না; মুখে কিন্তু সাম্যবাদের খৈ ফোটে। তারা জানে না বৈদিক সমাজ আসলে তো আধ্যাত্মিক সাম্যবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়।'

'ওরা বলে, মানুষ তার যোগ্যতা অনুসারে কাজ করবে। পাঁচ হাজার বছর আগেই কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, কাজের মূলগত যোগ্যতা অনুসারে সমাজে তার স্থান হবে।'

'ওরা বলছে যতটা দরকার, প্রত্যেকে ততটাই পাবে। ঈশোপনিষদ কিন্তু প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছেন, এজগতে সবই ঈশ্বরের সম্পত্তি, তিনিই সবকিছুর নিয়ন্তা। বেশি লোভ না করে যতটা দরকার আমরা যেন তাই গ্রহণ করি।'

'সাম্যবাদীরা কিছুটা এক ধরনের কথা বললেও ঈশ্বরকে তারা কিন্তু মাইনাস করে দিয়েছে। তাদের বক্তব্য আসলে ঘোর বস্তু জাগতিক ; আত্মাকে তারা উপেক্ষা করে।'

'আরও একটি কথা—বাস্তব জীবনে সবাই কিন্তু সর্বশক্তি নিয়োগ করে কাজ করে না। আমরা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সুপারিশে সর্বশক্তি নিয়োগ করে কাজ করবার এবং উৎকৃষ্ট কাজের যোগ্য হবার চেষ্টা করি।'

'সাম্যবাদী রাশিয়ায় সবাই যদি সর্বশক্তি দিয়ে কাজই করবে, তাহলে সলখাজে (সরকার পরিচালিত খামার) উৎপাদন অমন মারাত্মক রকমে কম কেন, দোকানে মাল থাকে না কেন, ক্রেতাদের অমন দীর্ঘ লাইন দিয়ে অত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় কেন ?'

অনেক ধনতান্ত্রিক দেশের তুলনায় বিপ্লবোত্তর রাশিয়া কিন্তু জনগণের জন্য অনেক কিছু করেছে, আমি তর্ক তুলে বলি, 'সবাই ভালো কাজ না করলে কি বিনা পয়সায় শিক্ষা, চিকিৎসার ব্যবস্থা সব মানুষের জন্য করা সম্ভব হতো, নিঃশেষে বেকারি দূর হতে পারত ?'

'উঁহু, আত্মানন্দ প্রতিবাদ করলেন, 'অপরাধের প্রবৃত্তি যেমন পরের জিনিস লোপাট করা, প্রতারণা করা, ইন্দ্রিয়ের সেবা করা, কাজে ফাঁকি দেওয়া ইত্যাদি সাম্যবাদের দেশের মানুষের মধ্যে একটুও কম নয়। এই যে সেদিন আর্মেনিয়ার ভূমিকম্পে এতবড় ধ্বংসলীলা ঘটে গেল, তার মধ্যেও আমরা কি দেখলাম। সাম্যবাদী সমাজেও কত ধনী, কত চোরাকারবারী লুকিয়ে রয়েছে। কোটি কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা, মণ-মণ সোনা-মণি-মুক্তো ধ্বংস-স্তূপে এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে। সকলের সমান হারে শ্রমদানের লক্ষণ এ তো নয়। তাহলে ত্যাগ-শ্রম-সেবার আদর্শপুষ্ট বৈদিক সমাজ গঠনের দিকে মনোযোগ দেওয়াই তো সবার উচিত।'

'সন্দেহ নেই, লেনিন ছিলেন এক মহাপ্রাণ মানুষ, দলিত ক্ষুধিত শোষিত সমাজের কষ্ট লাঘবের জন্য তিনি মার্কস্‌কে ডেকে এনেছিলেন—কাজের ভিত্তিতে তাঁর কিন্তু কোনো বৈদিক আদর্শ ছিল না। অথচ ব্যক্তিগতভাবে তিনি বৈদিক ভারতের একজন সমঝদার ছিলেন—ভবিষ্যতের রাশিয়া এবং ভারতের মধ্যে সহযোগিতার তিনি স্বপ্ন দেখতেন। আর এই সহযোগিতা যে বিশ্বের চেহারা পাল্টে দিতে পারে তাই তিনি বিশ্বাস করতেন, সন্দেহ নেই। গর্বাচভের আমলে তা বাস্তব রূপ নেবে।'

'হয়তো জানেন গর্বাচভের খাস কামরায় একখণ্ড ভগবদগীতা এ্যাজ ইট ইজ রয়েছে। পৃথিবীতে তিনিই এখন সবচেয়ে সম্মানিত নেতা, তাঁর আমলেই আমাদের ওপর থেকে সব বাধা নিষেধ উঠে গেছে। কারা যন্ত্রণা থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছি। নির্ভয়ে কৃষ্ণনাম করছি। সোভিয়েৎ দেশের কম্যুনিস্ট মুখপাত্র ইজভেজতিয়া, ক্রুদ, রাবোচি, সোভিয়েৎস্কা কুলতুরা এখন খোলাখুলি মন্তব্য করছেন, বেদ এবং কৃষ্ণচেতনা সাম্যবাদী সমাজ গঠনের পক্ষে খুবই উপযোগী।'

'গর্বাচভও লেনিনের সেই সূত্রটি গ্রহণ করেছেন, যা কিনা বলেছে, মানব সমাজের সঞ্চিত কিংবা নবলব্ধ জ্ঞান কম্যুনিস্টদের গ্রহণ করতে হবে।'

'আশা করি ভারতের নেতৃবৃন্দও এই কথাটি একটু তলিয়ে দেখবেন। আত্মানন্দ শেষপর্যন্ত মন্তব্য করলেন, 'তা হলে আমরা আরও ঘনিষ্ঠ হতে পারব।'



স্যামোলোভা ভ্যালেন্টিনা কি করে কৃষ্ণভক্ত হলেন, তারপর একদিন পূর্ণমাসী নাম নিয়ে ধন্য হলেন, তার একটি ইতিহাস আছে। এবং তার সঙ্গে জড়িত আছে তাঁর নিজেরই এমন কিছু অভিজ্ঞতা, যাকে ভ্যালেন্টিনা অলৌকিক বলতে চান

উত্তর ককেশাসের স্পিসেভ্‌কা গ্রামে ভ্যালেন্টিনার জন্ম হয় এক ট্রাক-ড্রাইভার পিতার ঘরে। সেই পিতা আবার নাস্তিক, মদ্যপ, উড়নচণ্ডী—মদ খেয়ে এবং না খেয়েও নিজের বৌকে সে পেটাই করত। পিতার তুলনায় মা ছিলেন বিপরীত মেরুর লোক—দয়াবতী, মমতাময়ী, সহানুভূতিশীলা। মেয়েকে তিনি বলেছিলেন, 'কেউ তোমার ক্ষতি করলে তুমি প্রতিশোধ নেবে না, উল্টে তার ক্ষতি করবে না। আখেরে তোমার তাতে ভালো হবে।'

তাঁদের বড়িটা ছিল বেশ নিচু জমিতে। আগে সেখানে মস্ত একটি হ্রদ ছিল। এখন দৃশ্য পাল্টেছে—ঘাসের মাঠ, গমের ভুঁই, গাছ-গাছালি এবং এই সব ঘিরে একটা অনুচ্চ পাহাড় মিলেমিশে আশ্চর্য একটি শ্যামশোভা সৃষ্টি করেছে। তার সঙ্গে যেন মায়াপুরের সাদৃশ্য রয়েছে, মায়াপুরে পাহাড়ের অস্তিত্ব না থাকলেও অন্তত এই কথা ভাবতে পূর্ণমাসীর ভালো লাগে। আম নারকেলের কুঞ্জবন, ফুলের বাগান, অদূর গঙ্গা—সব নিয়ে যে মায়াপুর দেবভূমি!

'অবশ্য মায়াপুরের সঙ্গে আমার গাঁয়ের সাদৃশ্যটা আমার কল্পনা মাত্র, পূর্ণমাসী ব্যাখ্যা করলেন, 'আসলে কল্পনা করতে আমি খুব ভালবাসি। কিন্তু স্পিসেভ্‌কা তো নয়, মায়াপুরই দেবলোক, কারণ এইখানে স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েছিলেন।'

আমার গাঁয়ের পাশ দিয়ে কটি ক্ষীণতনু নদীর আর্ত বিশীর্ণা ধারা তর্‌তর্ করে বয়ে চলেছে। দূর দিগন্তে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে ভাবতাম, ঐখানে না জানি কত কি আছে। নীল নীল আকাশ আর আকাশ আছে ঐ পাহাড় আর গাছ-গাছালির ওপারে। ঠিক যেন মায়াপুরের মতো এমনি একটি নীল আকাশ!

জীবিকার জন্য ভ্যালেন্টিনা প্রথমে মেকানিকের কাজ বেছে নিয়েছিলেন, তারপর একদিন ককেশাসের সদর শহর স্ট্যাবরাপোলের পলিটেকনিকে এঞ্জিনীয়ারিং পড়তে শুরু করেছিলেন। দু'বছর পর ঐ পলিটেকনিকের আর এক ছাত্র স্যামুয়েল আনাতলির সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। কৃষ্ণের করুণা আনাতলি বোধহয় কিছু বেশিই পেয়েছিলেন।

'আনাতলি সব দিক দিয়েই খুব যোগ্য লোক, স্বামীর প্রশংসা করে পূর্ণমাসী (দেবীদাসী) বললেন—'এবং খুবই হৃদয়বান, এঞ্জিনীয়ারিং শিখতে আমাকে বিস্তর সাহায্য করতেন। মার-ধর করা তো দূরের কথা শান্ত-শিষ্ট আনাতলি আমাকে কখনও একটু কটু কথাও বলেন নি। সত্যি এমন লোক আর হয় না। আমাকে ভাগ্যব ী বলতেই হয়।'

বিবাহিত জীবনের শক্ত বনিয়াদে একদিন ফাটল দেখা দিলো, দুর্ভাগ্যবশত এক দুষ্ট বন্ধুর চক্রান্তে, ভ্যালেন্টিনার চরিত্রে সন্দেহ জাগিয়ে তুলতে সেই বন্ধুর ছিল মস্ত ভূমিকা। দীর্ঘ পাঁচ বছরের বিচ্ছেদ নিয়ে ভ্যালেন্টিনা নিজের দেশ-গাঁয়ে পড়ে রইলেন, শেষপর্যন্ত নিজেই স্বামীর সঙ্গে যেচে দেখা করতে গেলেন। অবশ্য নিজের ব্যবহারের জন্য আনাতলি আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করলেন, কিন্তু বিচ্ছেদ-ব্যথিত কথাবার্তায় বেশি সময় নষ্ট না করে বললেন—

'সম্প্রতি সনাতন ধর্মের কিছু নিগূঢ় কথা জানার সৌভাগ্য আমার হয়েছে; আমি জানতে পেরেছি আত্মা কাকে বলে এবং আরও জেনেছি আত্মার মৃত্যু নেই, বিনাশ নেই, আমাদের শুধু দেহটির বিনাশ ঘটে। এবং জন্ম মৃত্যুর বৃত্তের মধ্যে লক্ষ কোটি বার আমাদের শরীর ধারণ করতে হয়।'

'তুমি যদি চাও, আমাদের পুনর্মিলন হতে পারে, তবে আমার মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছে, তোমাকে তা মেনে নিতে হবে, তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে

চলতে হবে।'

আনাতলির কথাটা আমি যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না, পূর্ণমাসী বললেন, 'কিন্তু তা হলে কি হয়, পুনর্মিলনের প্রস্তাবটি আমার খুব ভালো লাগল।'

বিজ্ঞানমনস্ক লোক হিসেবে আত্মার একটি বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা খুঁজে বের করতে আনাতলি খুবই তখন ব্যস্ত ছিলেন। সোভিয়েৎ দেশে এমন কিছু পত্র-পত্রিকা আছে যা মানব জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশেষ আলোচনা করে। সর্বসাধারণের পক্ষে কিন্তু এই পত্রিকাগুলি সহজলভ্য নয়। ঠিক এই ধরনের একটি পত্রিকায় ভ্যালেন্টিনা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, অক্ষয় অমর শাশ্বত আত্মা সম্বন্ধে কিছু বিজ্ঞানসম্মত সুদীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। আনাতলিই রচনাটি তাঁকে পড়তে দিয়েছিলেন, ছবি দেখিয়ে বলেছিলেন, 'এই ছাখো, দেহের মৃত্যুর পর একটি জ্যোতিচ্ছটার মধ্যে দিয়ে, আত্মাটি কেমন মহানিষ্ক্রমণ করছে!

এর পর থেকে এই সব নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আলোচনার মাত্রা গেল বেড়ে, পড়াশোনাও স্বভাবতই বেড়ে চলল। আত্মার অমরতা এবং দেহান্তরে প্রবেশ সম্বন্ধে বইপত্রাদি ইংলণ্ড এবং আমেরিকা থেকে তাঁরা আনিয়ে নিলেন। স্বামী-স্ত্রীর জীবনের ধারায় ক্রমে একটি ব্যাপক পরিবর্তন এলো, ব্যাপক একটি আধ্যাত্মিক তৃষ্ণার ঢেউ—ধর্মগ্রন্থাদির পঠন পাঠনে তাঁরা আত্মমগ্ন রইলেন। তাঁদের এবারের লক্ষ্য হলো, আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যুক্তিসহ প্রমাণ খুঁজে বের করা। আত্মার নিষ্ক্রমণ সংক্রান্ত রচনাটিতে এই নিয়ে তেমন কিছুই ছিল না—যা ছিল তা আসলে যেন ভালো ভালো বক্তৃতার প্রতিলিপি। কিন্তু তা তো যথেষ্ট হতে পারে না—তাঁরা এমন একটি আধ্যাত্মিক সূত্র খুঁজে ফিরছিলেন যা নিশ্চিত করে বলতে পারে—হ্যাঁ, ঈশ্বর আছেন। আত্মাও আছেন।

এই সময় একটি ব্যাপার ঘটল, আনাতলির হাতে একটি ভগবদগীতা এলো যা তুর্কোমেনিস্তান থেকে প্রকাশিত, রুমানিয়ান ভাষায় অনূদিত। তবে পড়ে কিন্তু দুজনের কেউই তেমন কিছু পরিষ্কার করে বুঝতে পারলেন

না। ঠিক তখন বৃন্দাবন দাস, জপা দাস প্রভৃতি সোভিয়েৎ কৃষ্ণভক্তরা মস্কো থেকে স্ট্যাবরাপোলে এসেছিলেন। তাঁদের কাছে আনাতলি আর ভ্যালেন্টিনা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র, কীর্তন, প্রসাদম ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক কথা এই প্রথম শুনলেন। অতি মহার্ঘ বেশভূষায় ঐশ্বর্যের ছটায় বিভাসিত পরম সুন্দর শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহমূর্তির সামনে হরেকৃষ্ণ কীর্তন তুজনেরই খুব ভালো লাগল।

কিছুদিন আগে তুজনেই যেন একটু যিশু-ঘেঁষা হয়ে পড়েছিলেন, ভ্যালেন্টিনার মনটা তখনও অবশ্য কিছু দোতুল ছিল। আনাতলি কিন্তু এবার মন স্থির করে বললেন—শ্রীকৃষ্ণই আমার উপাস্য দেবতা—তাঁর মধ্যে আমি ভগবানের সন্ধান পেয়ে গেছি।

ভ্যালেন্টিনা তখনও কিন্তু মন স্থির করতে পারেন নি। এদিকে তখনই তাঁকে একটি অলৌকিক ঘটনার সামনে এসে দাঁড়াতে হলো। জপা দাসের সঙ্গে কথাবার্তা সেরে বনপথের মধ্য দিয়ে তিনি বাড়ি ফিরছিলেন; হঠাৎ দেখলেন, সমস্ত বনভূমি যেন একটা অপরূপ জ্যোতির আভায় উদ্ভাসিত হয়ে গেছে, দিকদিগন্ত থেকে যেন ভেসে আসছে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রমন্দ্রিত একটি সুমধুর কলরব। ভ্যালেন্টিনা অভিভূত হয়ে গেলেন। তারপর কোন্ অজ্ঞাতে জপ করতে শুরু করলেন হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে!

আনাতলি আর ভ্যালেন্টিনা এবার স্ট্যাবরাপোল ছেড়ে চলে এলেন কুর্জিনোভোতে। ভ্যালেন্টিনার এখন কেবলই মনে হতে লাগল, আনাতলি তাঁর তুলনায় অনেকদূর এগিয়ে রয়েছেন, তাঁর জীবনের স্তরটিও অনেক উন্নত। আরও একটা কথা তখনই তাঁর মনে এলো, আনাতলির সমকক্ষ তাঁকে হতেই হবে!

কুর্জিনোভো গ্রামটি ছিল খুব বিখ্যাত। স্ট্যালিনের আমলে ধর্মীয় নির্যাতনের হাত থেকে পালিয়ে এসে কিছু সাধুসন্ত লোক এই গ্রামটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কুর্জিনোভো ভ্যালেন্টিনার তো খুবই ভালো লাগল। আর কেনই বা নয়—পাহাড় শিখরে কুর্জিনোভোর অবস্থান ছিল খুবই মনোরম। 'আমার স্বপ্নের বৃন্দাবনের মতো, ভ্যালেন্টিনা বললেন, 'সুন্দর একটি নদী, মিষ্টি

মধুর হাওয়া, উদার আলোর আহ্বান মনকে সেখানে ভাসিয়ে দেয়। তবে খৃষ্ট সাধুসন্তদের সংস্পর্শে এসে ফল হলো এই, মনটি আবার খৃষ্টমুখী হয়ে গেল।

'ক্ষতি কি, আনাতলি বললেন—'তোমার মন যা চায় তাই কর।'

কিন্তু তাই করা কি অতই সোজা? ভ্যালেন্টিনার মনের মধ্যে ঝড় বয়ে গেল, খৃষ্ট কিংবা কৃষ্ণ নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হলো। আর তখনই এক গভীর রাতে স্বপ্নে আমি দেখতে পেলাম, পূর্ণমাসী দেবীদাসী প্রায় স্বপ্নের ঘোরেই ধীর কণ্ঠে বললেন, 'মায়াপুরের এক প্রান্তে আমি যেন দাঁড়িয়ে আছি—শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীমতী রাধরাণী আমাকে দর্শন দিলেন। তারপর রাধারাণীজী আমার মাথায় একটি মুকুট পরিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'তোমার সামনে অনেক কষ্ট ভোগ রয়েছে বাছা! এটা তোমার কাজে লাগবে।'

'ব্যস, আমি কৃষ্ণভক্ত হয়ে পড়লাম, যদিও দীক্ষা হয়েছে এই তো সেদিন, হরিকেশ স্বামী মহারাজ ডাকযোগে দীক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু তার আগে নদীতে অনেক জল গড়িয়েছে। সে কথা পরে হবে।'

'দীক্ষার পরের অবস্থা কিন্তু আমার এখনও বেশ মনে আছে, একটি অচিন্ত্যনীয় উল্লাসে আমার তখন মোহাবিষ্ট অবস্থা; শরীর ও মনের মধ্যে দিয়ে আধ্যাত্মিকতার একটা যেন প্রবাহ বইছে। মনের সে কি স্ফূর্তি, সে কি উচ্ছ্বাস! আমার এই অবস্থাটা মোট তিন মাস স্থায়ী হয়েছিল।'

এবার একটু আগের কথায় ফেরা যাক। ভক্ত শ্রীনিবাসের কুর্জিনোভোর বাড়িতে গুরুদেব হরিকেশ মহারাজের জন্মোৎসব পালনের আয়োজন করা হয়েছে। হঠাৎ এলো পুলিশ, বাড়ি ঘেরাও করে বলল, 'বলি, হচ্ছেটা কি, নিশ্চয় কোনো অবৈধ উৎসব?'

ভক্তরা বললেন, 'আজ্ঞে না কর্তা, আমরা এখানে এক বন্ধুর জন্মদিন পালন করছি।'

পুলিশ কিন্তু সবাইকে ধরে নিয়ে গেল। এবং ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে ছেড়েও দিলো। তবে কিনা ঐ ভক্তরা সবাই মার্কামারা হয়ে রইলেন।

দিন কতক পরে আবার বাড়ি তল্লাশ করে পুলিশ গীতা, ভাগবত ইত্যাদি

ধর্মগ্রন্থ লোপাট করে নিয়ে গেল ; জপা দাস, বৃন্দাবন দাসকে গ্রেপ্তার করা হলো। আর বাকি সবাই গেলেন পালিয়ে। আনাতলি, ভ্যালেন্টিনা এবং আরও জনাকয়েক ভক্ত তখনও জেলের বাইরে, তাঁরা সুপ্রিম সোভিয়েতের সর্বোচ্চ আদালতে নালিশ জানাতে মস্কোতে চলে গেলেন। এবং মস্কোর আমেরিকান দূতাবাসেও যোগাযোগ করলেন।

এবার সমন জারি করা হলো আনাতলি আর ভ্যালেন্টিনার ওপর, সরকারি উকিলের সঙ্গে দেখা করার নির্দেশ দিয়ে তাঁদের বলা হলো, ফের নালিশ-ফালিশ করতে গেলে সোজা তাঁদের জেলে পুরে দেওয়া হবে।

এরই মধ্যে তাঁদের বিরুদ্ধে অনেক আজগুবি অভিযোগ খাড়া করা হলো, যেমন—রেডিও সেটের মাধ্যমে বিদেশে গোপন সংবাদ পাচার, রাতভর জেগে অবৈধ প্রচারপত্র ছাপানো, বৈদেশিক মুদ্রা এবং সোনা মজুত! বিচার পর্ব শুরু হতেই দেখা গেল, ভ্যালেন্টিনার বিরুদ্ধে আরও একটি মারাত্মক অভিযোগ রয়েছে, রাশিয়ার সামাজিক কাঠামো পাল্টে দিয়ে তিনি নাকি বর্ণাশ্রম প্রণালী প্রবর্তন করতে কৃতসঙ্কল্প!

বিচার শুরু হলো । কিন্তু তার আগে একদিন পড়ন্ত বিকেলে প্রধান সরকারি উকিল গোপনে বাড়িতে দেখা করে বললেন, 'আমি তোমাদের বাঁচাতে চাই—তোমরা এখান থেকে পালিয়ে যাও, আমার পরামর্শ মতো কাজ কর।'

ভ্যালেন্টিনার কিন্তু মনে হলো, পালিয়ে যাবার অর্থ, নিজেদের দোষ স্বীকার করে নেওয়া। এবং তার নির্গলিতার্থ, অন্য কৃষ্ণভক্তদের বিপদের পথে এগিয়ে দেওয়া। না-পালানোই সাব্যস্ত হলো।

বিচার শুরু হয়েছে ; মিথ্যা অভিযোগ, মিথ্যা সাক্ষী, মিথ্যা প্রমাণ দায়ের করা হয়েছে। তার ওপরও চেষ্টা চলছে তাঁদের ওপর চাপ সৃষ্টি করার। সরকারি উকিল এগিয়ে এসে কারসাজি করে বললেন— দোষ স্বীকার কর, নইলে জেল হবে।'

'আমি তো রাজনীতি করি না', ভ্যালেন্টিনা বললেন, 'কেবল বৈদিক গ্রন্থাদি পাঠ করি, তার মধ্যে তো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম দর্শন বিজ্ঞানের ঐশ্বর্য ছাড়া

আর কিছুই নেই।'

বিচারক দাঁত খিঁচিয়ে উঠলেন। শেষ পর্যন্ত ভ্যালেন্টিনার দু'বছরের কারাদণ্ড হলো। আনাতলির বিচার হলো অন্যত্র। তাঁরও হলো কারাদণ্ড।

কে-জি-বির লোক জেলে এসে ভ্যালেন্টিনাকে বললে, 'কৃষ্ণের নিন্দা করলে এবং কৃষ্ণ চেতনার বিরুদ্ধে বিবৃতি দিলে তোমাকে মুক্তি দেওয়া হবে; নইলে কিন্তু সারাজীবন জেলেই পচে মরতে হবে।'

'কৃষ্ণকে আমি ত্যাগ করতে পারব না,' ভ্যালেন্টিনা সঙ্গে সঙ্গে বললেন— 'তার চেয়ে আমাকে বরঞ্চ গুলি করে হত্যা কর। কৃষ্ণই আমার জীবনের সব।'

কে-জি-বি অফিসার রেগে টঙ হয়ে বললেন, 'জীবনে আর কখনও তুমি স্বামীপুত্রের মুখ দেখতে পাবে না।'

কে-জি-বির কথা আর ফলল কোথায়, বাঁকা হাসি হেসে পূর্ণমাসী বললেন, 'মায়াপুরে এসে শ্রীকৃষ্ণের পায়ের কাছে এবার বসে পড়েছি।'

পূর্ণমাসীর হাসিতে হাসি মেলালেন মস্কোর ইন্টেলেকচুয়্যাল পরিবারের কৃষ্ণভক্ত বিশ্বামিত্র দাস। সাদা ধুতি পাঞ্জাবী পরে জপমালার থলি হাতে কাছেই তিনি বসেছিলেন।

পূর্ণমাসীকে জেলের সহবন্দিনীদের মধ্যে কৃষ্ণ কথা প্রচার করতে দেখে জেলবাবুরা ভীষণ চটে যেতেন, তাঁকে ভীষণ শাস্তির ভয় দেখাতেন। পূর্ণমাসী তো দূরের কথা, অন্য বন্দিনীরাও আর ভয় পেতেন না। মুক্তি পেয়ে যে হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের সামিল হবেন, অনেকে সেই প্রতিশ্রুতি দিতেন। দেয়ালের কান দিয়ে সেই কথা শুনে বাবুদের সে কি আক্রোশ!

গ্যালিনা নামে এক বন্দিনীকে পূর্ণমাসীর কেন যেন সন্দেহ হতো। তার কাছে কৃষ্ণকথা বলাটা যেন ঠিক হবে না বলে তাঁর মনে হতো। একদিন সে বললে—'ভ্যালেন্টিনা, আমার সব কাহিনী তোমাকে শুনতেই হবে।'

কাহিনী বলতে তার অগণিত প্রেমিকের গল্প, প্রেমের গল্প, বিশ্বাস ভঙ্গের গল্প। সেই সব কথা বলতে গিয়ে একদিন সে ভ্যালেন্টিনার কাঁধে একটি হাত রাখে, অনেকটা যেন বিশ্বস্ত বন্ধুর সহানুভূতি আদায়ের কায়দায়।

তারপর গ্যালিনা কিন্তু হঠাৎ তাঁর গলা চেপে ধরে তাঁর শ্বাস রোধের চেষ্টা করে। ভ্যালেন্টিনা (তখনও পূর্ণমাসী হন নি) নমস্তে নরসিংহায় দিয়ে শুরু করে সবটা নরসিংহ মন্ত্র জপ করতে শুরু করেন। কি যেন একটা অদৃশ্য শক্তি গ্যালিনাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে। হতভম্ব হয়ে সে বলে, 'তুমি আমাকে লাথি মারলে কেন।'

মুক্তির পর কুর্জিনোভোর বাড়িতে ফিরে পূর্ণমাসী দেখলেন, ঘরগুলি সব তছনছ হয়ে পড়ে আছে, কাপড়-চোপড় বাসনপত্র আসবাবাদি লুট হয়ে গেছে, ছেলে গৃহহারা হয়ে মাসীর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। এবং নিজের মা-ও মরে গিয়েছেন ! আনাতলি তখনও জেলে। তাঁর মুক্তি মেলে পরের বছর।

জেল থেকে ফিরে এসে স্বামী স্ত্রী কেউই কিন্তু আগের কাজ ফিরে পান নি। পূর্ণমাসী এখন রুটি সেঁকেন, তবে শীগগীরই একটা কাফে খোলার ইচ্ছা আছে, কাফেতে কৃষ্ণপ্রসাদ তৈরী করে বিক্রী করবেন—বললেন, যাহোক করে চলে যাবে।'

'কিন্তু এখন তো গর্বাচভের যুগ', আমি বলি, 'এবার নিশ্চয় একটা কাজ মিলবে, হয়তো আগের কাজই ফিরে পাবেন।'

'মনে হয় আমরা অতিশয় উত্তম কর্মে নিযুক্ত আছি, 'পূর্ণমাসী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, এ হচ্ছে পরমার্থিক কর্ম—এ ছেড়ে জাগতিক কাজের পেছনে ছুটে চলা ঠিক হবে না। এখন থেকে যা কিছু আমরা করব সবই হবে কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণভক্ত সম্পর্কিত কাজ।'

'কৃষ্ণ ভজতে গিয়ে চাকরি গেল, ঘরবাড়ি . াল, জেল খাটতে হলো,' নির্মম বাস্তব সত্যগুলির উল্লেখ করে আমি সন্তর্পণে প্রশ্ন করি—'ঠিক এই ধরনের কোনো কথা কখনও মনে হয় কি, মনে কোনো আফসোস !'

'নাহ্,' সবুজ চোখজোড়া তুলে ধীর শান্ত এবং প্রত্যয়সিদ্ধ কণ্ঠে পূর্ণমাসী বলেন, 'বরং কৃষ্ণের কাছে ফিরে আসতে পেরেছি বলে সব সময় মনে হয়, আমাদের মতো এত বড় সৌভাগ্য লাভ আর কারও কখনও হয় নি। কলকাতা, পুরী, মায়াপুর দেখলাম—আসলে এই সব তীর্থভূমি দেখবার খুব

দরকার ছিল।'

পূর্ণমাসীর ভক্তি-উদ্ভাসিত চোখ তখন জলে ভরে উঠেছে। সিঁথির লাল রেখা, কপালের বড় সিন্দুরবিন্দু জ্বল জ্বল করছে। আত্মতৃপ্ত পূর্ণমাসী যে বড় কৃষ্ণভক্ত!

১০

রাশিয়ার বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ঐরাবৎ দাস মস্ত একজন কৃষ্ণভক্ত। পণ্ডিত লোক। পি-এইচ-ডি ডিগ্রীওয়ালা বিজ্ঞানী। মধ্য এশিয়ার সোভিয়েৎ রিপাবলিকের এক গোঁড়া মুসলিম পরিবারে তাঁর জন্ম, আজার বাইজানের বাকু শহরে। তখন নাম ছিল তাঁর আকিফ ম্যানাকভ। প্রেমাবতী দেবীদাসীর মতো আকিফও ইসলামের ধ্যানে-ধারণায় একান্তভাবে আবদ্ধ না থেকে শ্রীকৃষ্ণের শরণ নিয়েছিলেন, আর তখনই তাঁর নাম হয়েছিল ঐরাবৎ দাস।

এই তরুণ বৈষ্ণবের সঙ্গে কথা বলুন, তাঁর সূক্ষ্ম বিজ্ঞানমনস্কতা নজর এড়াবে না। সদা সর্বদা কৃষ্ণই তাঁর ধ্যান। তাঁর জ্ঞান। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস—তাঁর জীবন। কাছে বসলেই মনে হয়, ঐরাবৎ দাস বড়ই শুদ্ধ শান্ত অন্তরমুখী।

'দেবরাজ ইন্দ্রের সেই হাতিটির নাম নিশ্চয়ই জানেন, 'তাঁর নামের বৈচিত্র্যে আমার ঔৎসুক্য দেখে ঐরাবৎ প্রভু মৃদু হেসে বললেন, 'দীক্ষার পর পরমারাধ্য গুরুদেব এই নামটিই আমাকে দিয়েছিলেন। এটি আমার খুব পছন্দের নাম।'

নামের সঙ্গে ঐরাবৎ দাসের কিন্তু চেহারায় তেমন একটা মিল নেই। তাঁর তনু দীর্ঘগড়নে দৈহিক স্থূলত্ব সামান্যই, বলতে গেলে মানানসই। তাঁর গায়ের রং গৌর, নাক তীক্ষ্ণ, চোখ উজ্জ্বল, ভুরু মোটা—সব মিলিয়ে সুন্দর সুপুরুষ চেহারা। দেহের সোনা-সোনা রঙের সঙ্গে হাতে মালার থলে, মুখে হাসি, মাথায় টিকি, পরণে গেরুয়া কাপড়। লক্ষ্য করে দেখুন, ঐরাবৎ দাসকে একজন বঙ্গীয় গোস্বামী প্রভু ছাড়া কিছুই মনে হতে চাইবে না। সাধারণ কথ্য ভাষায় তাঁর আসলে গোঁসাই-গোঁসাই চেহারা।

বাকু শহরেই আকিফের বিদ্যারম্ভ, শেষ পর্যন্ত মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থশাস্ত্রে পি-এইচ-ডি ডিগ্রী লাভ। বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থশাস্ত্র নিয়ে গবেষণা-

কালে মার্কস-লেনিনও তিনি মনোযোগ দিয়ে পড়েন। কিন্তু যাকে বলে পড়ার আনন্দ, শেখার আনন্দ, তা যেন খুব একটা লাভ হয় না, মনেও তেমন শান্তি পান না।

সোভিয়েৎ দেশে আর এক পণ্ডিতের সঙ্গে আমার একদিন কথা হয়েছিল। খনিজ তেল সংক্রান্ত আলোচনায় সেই অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপক ভারতে, রাশিয়ায়, গোটা পৃথিবীতে এখনও কত তেল খনিগর্ভে আছে, তার আর্থিক গুরুত্বই বা কি ইত্যাদি নিয়ে অনেক কথা বলেছিলেন। ঐরাবৎ দাসের জন্ম তেলের শহর বাকুতে বলে আমার স্বভাবতই তেল সম্বন্ধে জানার কিছু আগ্রহ থাকে। 'কিন্তু তৈল খনির সঙ্গে তো কৃষ্ণের কোনো সম্পর্ক নেই, বিনীত হেসে আমার তৈল-চিন্তা চাপা দিয়ে ঐরাবৎ প্রভু বলেন, 'সুতরাং ওসব কথা থাক!'

মায়াপুর গেস্ট হাউসে ঐরাবৎ দাসের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ। আমার কামরায় ঢুকতেই প্রথমে রাধা-কৃষ্ণের পটে তাঁর নজর পড়ে; সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে তিনি এমনভাবে প্রণাম নিবেদন করেন, যেন চলার পথে শ্রীকৃষ্ণের হঠাৎ-দর্শন মিলেছে। প্রণত ঐরাবৎ দাসের মাথায় এক গুচ্ছ শিখা আমার খুব বড় করে নজরে পড়ে।

'বৈষ্ণবদের শিখা রাখার প্রয়োজন আছে,' আমার দৃষ্টি লক্ষ্য করে ঐরাবৎ প্রভু বলেন—'নিশ্চয় মানেন, মানুষের দেহবোধ বড় প্রবল, কখনও বা মারাত্মক, নিজের কেশ-সৌন্দর্যে কেউ বা আবার নিজেই মুগ্ধ হয়ে পড়ে। বৈষ্ণবদের পক্ষে এমন উৎপাত ছেঁটে ফেলাই তো স্বাভাবিক।'

'নেড়া মাথায় তবে শিখা রাখা কেন? তারও প্রয়োজন আছে—শিখার গৌরবেই তো বৈষ্ণবরা আলাদা সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত। শিখা আসলে বামুনের পক্ষে পৈতার মতো।'

আলোচনা এবার শ্রীরাধার কথায় মোড় নিয়েছে। আধুনিক পণ্ডিতদের কেউ কেউ যে শ্রীরাধার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করেন তার আভাস দিতে ঐরাবৎ প্রভু প্রথমে গম্ভীর হলেন বটে, পরক্ষণেই স্মিত হেসে বললেন, 'আপনি কি, ব্যক্তিগত ভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন?'

'নিশ্চয়ই' আমি বলি, 'মোটে তো পাঁচশ বছর আগের কথা '
'তিনি যে, শ্রীকৃষ্ণের অবতার তা মানেন ?'
'শাস্ত্রেই তো সে কথা স্পষ্ট লেখা আছে,' আমার জবাব সঙ্গে সঙ্গে না পেয়ে ঐরাবৎ প্রভু শ্রীমদভাগবতের একাদশ অধ্যায় থেকে শাস্ত্রবচন আবৃত্তি শুরু করেন—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গোস্ত্র পার্ষদম।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

অর্থাৎ মুখে কৃষ্ণনাম নিয়ে অকৃষ্ণ (গৌরবর্ণ) ধারণ করে তিনি তাঁর সঙ্গে উপাঙ্গ, অস্ত্র এবং পার্ষদগণসহ অবতীর্ণ হবেন। সুমেধা সম্পন্ন ব্যক্তিরা সঙ্কীর্তন যজ্ঞের মাধ্যমে তাঁর আরাধনা করবেন।
'এই ভবিষ্যৎবাণী তো সফল হয়েছে,' ঐরাবৎ প্রভু এবার মন্তব্য করেন— 'স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই তো নদীয়ার মায়াপুরে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।'
'এবং এই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রাধারাণীজীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। এই কথাটা আমরা মেনে নিলেই তো সব ঝামেলা চুকে যায়।'
'শ্রীরাধার মতো কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণ প্রেম তো দুনিয়ায় কারও নেই। তাঁর কাছেই কৃষ্ণভক্তি শিখতে হয়, তাঁর মাধ্যমেই আমাদের শ্রীকৃষ্ণে পৌঁছাতে হয়। এছাড়া কোনো পথ নেই।'
শ্রীরাধার সমস্ত তনুমন যে কৃষ্ণময়, কৃষ্ণসেবায় নিবেদিত, তার সমর্থনেও ঐরাবৎ প্রভু আরও একটি শ্লোক আবৃত্তি করেন—

শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা সুরূপতা
সুশীলতা নর্তন গান চাতুরী।
গুণাদি সম্পৎ কবিতা চ রাজতে
জগন্মনোমোহন চিত্তমোহিনী॥

'শ্রীরাধার প্রেম, সৌন্দর্য, সুস্বভাব নাচেগানে নৈপুণ্য গুণ সম্পদ এবং কবিত্ব জগন্মনোমোহন শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত মুগ্ধ করেই দীপ্তি পায়।'
এবার আলোচনা মোড় নেয় মস্কোর দিকে। কলকাতার মতোই ওদেশে সবাইকেই মস্কো যেতে হয়। পড়তে রাজনীতি করতে, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক

হতে কলকাতায় না এসে যেন আমাদের উপায় নেই—কলকাতা আমাদের উত্থান-অভ্যুদয়ের, আমাদের পতনের লীলাভূমি। সোভিয়েৎ কৃষ্ণভক্তদের মস্কোয় না গিয়ে উপায় নেই—রাশিয়ায় শ্রীকৃষ্ণ মস্কোবাসীদেরই প্রথম করুণা করেছিলেন, প্রভুপাদ গিয়ে মস্কোতেই প্রথম উঠেছিলেন।

উচ্চ শিক্ষার্থে মস্কোতে এসে ঐরাবৎ দাস মার্কস লেলিন পড়েছিলেন, প্রভুপাদের ভগবদগীতা এ্যাজ ইট ইজ, ঈশোপনিষদ, ভাগবতম পড়েছিলেন, কাণ্ট হেগেল প্লেটোর রচনাবলী পাঠ করেছিলেন।

বাইবেল আর কোরাণ বার বার পড়েছিলেন, অন্য সব শাস্ত্রগ্রন্থ, দর্শন, ইজম-তত্ত্ব ইত্যাদি পাঠের পরিপ্রেক্ষিতে।

'সব রকম শাস্ত্র এবং দর্শনাদি পড়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল, ভগবদগীতাই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রগ্রন্থ, জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনের আকর', ঐরাবৎ প্রভু মন্তব্য করেন—'গীতা পড়া থাকলে অন্য শাস্ত্রগ্রন্থ না পড়লেও চলতে পারে।'

বাইবেল আর কোরাণের সঙ্গে গীতার তফাৎ কোথায়? আমি প্রশ্ন করি।

'বাইবেলে স্থান পেয়েছে কিছু ঐতিহাসিক কথা,' ঐরাবৎ প্রভু ব্যাখ্যা করেন—জীবনের কিছু নিয়ম-নির্দেশ, যেমন হত্যা করবে না, চুরি করবে না, মিথ্যা বলবে না—ভগবানকে ভালবাসবে, তাঁর সেবা করবে ইত্যাদি। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্বের বিজ্ঞানসম্মত কোনো ব্যাখ্যা সেখানে নেই।

'কোরাণের ভিত্তি বাইবেলই। কোরাণে স্বীকার করা হয়েছে, আত্মা অবিনাশী ব্যস, ঐপর্যন্তই—গীতার মতো ব্যাখ্যা করে বলা হয় নি, আত্মা অবিনশ্বর তার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, দেহের বিনাশ ঘটলেও আত্মার বিনষ্টি নেই।'

ঐরাবৎ দাস প্রসঙ্গত গীতার সংশ্লিষ্ট শ্লোকটি সুললিত ছন্দে আবৃত্তি করতে লাগলেন—

'অজো নিত্যঃ শাশ্বতো ২য়ং পুরানো।
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।'

শুধু এই নয়, ঐরাবৎ প্রভু আরও বললেন—'আত্মা যে দেহান্তর আশ্রয় করে, তার যে আবার বিধিবদ্ধ প্রণালী আছে, কোরাণ সে বিষয়ে নীরব—

কোরাণ শুধু বলেছেন, দেহের মৃত্যু ঘটলে আত্মাটা থেকে যায়। কিন্তু তার পর কি ঘটে? আত্মা স্বর্গে, না কি নরকে যায়? গীতায় কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন।

বাসাংসি জীর্ণাণি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।

তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণানিণ্যানি সংযাতি নবানি দেহী।

লোকে যেমন পুরোনো কাপড় ফেলে নতুন কাপড় পরিধান করে, আত্মাও তেমনি জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে নতুন দেহে আশ্রয় নেয়—'

'আসলে কোরাণ যেখানে শেষ, গীতার সেখানে সবে শুরু। আর শুধু কোরাণ কেন, আত্মার ধর্ম সম্বন্ধে অন্য সব শাস্ত্রও নীরব—আত্মা অবিনাশী, এই কথাটা বলেই সবাই থেমে গেছেন। বৈদিক শাস্ত্রকাররা কিন্তু ও কথাটা আগেই জেনেছিলেন—তারপর কি হয় সে কথা শ্রীকৃষ্ণ নিজের মুখে বলে দিয়েছেন। কর্ম বলতেও কি বোঝায় একমাত্র গীতা ছাড়া অন্য কোনো শাস্ত্রগ্রন্থ তার ব্যাখ্যা দেয় নি।'

'গীতা পড়েই গীতার জ্ঞানকে আমি ব্যবহার করতে শুরু করলাম, নিজের কথায় মোড় নিয়ে ঐরাবৎ দাস বললেন—'এবং ভক্তিযোগের নিয়মগুলি পালন করতে লাগলাম। তখনই মনে হলো, আমার একজন গুরু চাই—হিন্দু, মুসলিম, খৃষ্টান যে কোনো সম্প্রদায়ের। প্রভুপাদের গীতা পড়ে মনে হলো, তিনিই সেই গুরু হবার যোগ্যতম ব্যক্তি—'

'কিন্তু মুসলমান হয়ে আপনার পক্ষে কৃষ্ণভজনা করা সম্ভব হলো কি করে', আমি এবার প্রশ্ন রাখি—'এবং কৃষ্ণভক্ত হয়ে এতদিন টিকে থাকাই বা সম্ভব হলো কি করে?'

'ইন্টারেষ্টিং প্রশ্ন', মৃদু হেসে কৃষ্ণভক্ত ঐরাবৎ দাস বললেন—'আপনি তো জানেন, আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, ধর্মকে বিচার করি আমি বিজ্ঞানাচার্যের দৃষ্টি ভঙ্গিতে। নিশ্চয়ই স্বীকার করেন, মানুষের অজ্ঞতা বিস্তারের দুটো পথ আছে, তার একটিকে বলা চলে গোঁড়ামি, অপরটি হচ্ছে শাস্ত্র এবং ন্যায়নীতির প্রতি উপেক্ষা। গোঁড়ামি আসলে একটি রোগ যার কোনো ওষুধ নেই। সুখের বিষয়, এই রোগ আমাকে স্পর্শ করতে পারে নি। হজরত

মহম্মদ অবশ্য নিজেও বলেছেন, কেউ যদি ভিন্ন ধর্ম মেনে চলতে চায় তো চলুক তাকে বাধা দিও না, যদিও গোঁড়া লোকেরা উল্টোটাই করছে।—'

'তা হলে এইজন্যই আপনি ইসলাম ছেড়ে কৃষ্ণভক্ত হয়েছেন?'

'ইসলাম ছাড়ার প্রশ্নই আসে না, প্রতিবাদ করে ঐরাবৎ প্রভু বললেন—'ভগবদগীতা আসলে আমাকে প্রকৃত পথের সন্ধান দিয়েছে—সে হচ্ছে সনাতন ধর্মের পথ, অন্য সব ধর্মের সঙ্গে যার পার্থক্য আছে। যুক্তিবাদী মানুষের কাছে এই ধর্মই গ্রহণীয়। কৃষ্ণভক্ত আসলে সত্যিকারের একজন হিন্দু, অথবা খৃষ্টান, অথবা মুসলমান।'

'একটু ব্যাখ্যা করবেন কি?'

'তবে শুনুন, ঐরাবৎ দাস সানন্দে বললেন—'সব ধর্মই তো বলে ভগবানকে ভালবাসবে, তাঁর সেবা করবে, কিন্তু সনাতন পুরুষ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই বলতে পেরেছেন কি করে তা করতে হয়। তিনি বলেছেন—'কর্মণ্যবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন—কাজ করে যাবার অধিকারই শুধু তোমার, তার ফল ভোগের নয়। ফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ কর, তাতে তিনি সন্তুষ্ট হবেন। এবং তাই তোমার হৃদয়ে তোমার সম্প্রদায়ে, তোমার দেশে শান্তি আনয়ন করবে।'

শ্রীকৃষ্ণ আরও বলেছেন, সর্বধর্ম পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। সুতরাং জীবনের সব ভ্রান্ত পথ ছেড়ে এসে তাঁর শরণ নিতে হবে। কারণ ভ্রান্ত পথ তোমাকে পরম সত্যের দিকে, আলোকের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে না।'

খৃষ্ট বা মহম্মদকে ঠিক মতো অনুসরণ করেও অনেকে নিজেদের বলে খৃষ্টান এবং মুসলমান। আমি কিন্তু মিথ্যার আবরণ ভেদ করে এসে কৃষ্ণভক্ত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছি, বলতে পারি প্রকৃত মুসলমান হয়েছি।'

'আমার মা বাবাও তো নিজেদের মুসলমান বলেন, কিন্তু ধর্মের কোনো অনুশাসনই তাঁরা মেনে চলেন না। আমার মনোবিকলন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বোন ইরাদা কিন্তু হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করে কৃষ্ণকে মানে—'

'কোনো মুসলিম প্রথমে কোরাণ, তারপর গীতাপাঠ করলে বেশ দেখতে পাবেন, কোরাণের উক্তি খুব প্রাঞ্জলভাবে গীতায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে

মুসলিম হিসেবে গোঁড়া না হলে ভগবদগীতাকে ধর্মশাস্ত্র বলে তার মানা উচিত। হজরত মহম্মদ নিজেও বলেছেন, কোরাণের আগে যে নব শাস্ত্রগ্রন্থ রচিত হয়েছিল তা যারা মানে না তাদের নরকবাস হবে। সুতরাং বাইবেল, গীতা, উপনিষদকে মুসলমানদের না মানার পক্ষে কোনো কারণ দেখি নি।'

'সনাতন ধর্ম হচ্ছে আত্মসমর্পণের ধর্ম, মানব সমাজের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ আত্ম-নিবেদনের ধর্ম। যারা সনাতন ধর্ম মানেন, তারা সব ধর্মের সব আচরণ বিধিই মেনে চলেন বলা চলে।'

ঐরাবৎ প্রভুকে এবার মালা ফেরানোয় মনোযোগী দেখে বললাম 'দীক্ষার পর আপনার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে প্রতিক্রিয়াটা কি রকম হয়েছিল?'

'ব্যাপারটিকে তারা মোটেই প্রীতির চোখে দেখেন নি, ঐরাবৎ প্রভু জানালেন—'কেউ আবার এমন কথাও বললেন—তুমি একজন বৈজ্ঞানিক—তোমার ধর্মের দরকারটা কোথায়। একান্তই যদি তোমাকে ধর্মের ধার ধারতে হয়, তা হলে ইসলামের শরণ নাও—'

'জবাবে আমি বললাম, কৃষ্ণচেতনা তো সামান্য ধর্ম নয়, এ হচ্ছে যাকে বলে অধ্যাত্মবিজ্ঞান। একজন বিজ্ঞানী হিসেবে তাই-ই তো আমার ধর্ম হওয়া উচিত।'

'বালক বয়সে আমি অবাক হয়ে ভাবতাম, ছেলেবেলার বিশেষ কোনো জীবনস্মৃতি আছে কিনা জানতে চাইলে ঐরাবৎ দাস বললেন—'মরণেই যদি সব শেষ হয়ে যায়, তা হলে মনের জন্মের প্রয়োজন কোথায়? ব্যাখ্যা করে কেউ-ই তা আমাকে বলতে পারে নি। শেষ পর্যন্ত সদুত্তর মিলল প্রভু-পাদের ভগবদগীতা এ্যাজ ইট ইজ থেকে।

'আমাদের ভারত-দর্শন একটা অলৌকিক ঘটনা', কৃষ্ণের পটে চোখ রেখে ঐরাবৎ প্রভু বললেন—'যা একমাত্র উনিই ঘটাতে পারেন। এখানে এসেই মনে হলো, আমাদের ভারত দর্শন করানো তাঁর হিসেবের মধ্যেই ছিল। চৈতন্যভূমি মায়াপুরে এসেই আমি অনুভব করতে পেরেছি, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব-ব্যাপী, সর্বত্র তিনি বিরাজ করেছেন। মায়াপুর আসলে বৈকুণ্ঠধাম।'

'নিত্যানন্দ প্রভু একদিন ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন', 'নিয়তবাহী গঙ্গার দিকে দৃষ্টি মেলে ঐরাবৎ দাস বললেন—'মায়াপুরে সুবিশাল মন্দির হবে আধ্যাত্মিক জগতের রাজধানীতে পরিণত হবে এই মায়াপুর ধাম। তাঁর ভবিষ্যৎবাণী সফল হতে চলেছে—'

'আমরা পরম ভাগ্যবান, স্বয়ং ভগবান যেখানে মানব শিশুরূপে পৃথিবীর আলোয় চোখ মেলেছিলেন আমরা সেই মায়াপুর দেখে গেলাম।'

ঐরাবৎ দাস হাঁটু ভেঙে মাথা মাটিতে লুটিয়ে এবার মায়াপুরের উদ্দেশে প্রণাম নিবেন করলেন।

১১

আগে নাম ছিল তাঁর ভাদিন তুনিয়েভ। দীক্ষার পর বৈদ্যনাথ।

বৈদ্যনাথ দাস তাশখন্দের লোক—তীক্ষ্ণধী. ধীর স্থির, বুদ্ধিমান—মনে হয় কৃষ্ণভক্ত বৈদ্যনাথ যেন নক্ষত্র লোকের উজ্জ্বল একটি জ্যোতিষ্ক। ছাত্র জীবনের শেষ পর্যায়ে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বায়ো-কেমিস্ট্রিতে পি-এইচ-ডি করা সমাপ্ত হলে সম্ভাব্য অর্থ সম্মান সঙ্গতিসমুজ্জ্বল একটা চটকদার জীবনের সিংহদ্বার তাঁর সামনে অবারিত হবার কথাই ছিল। কিন্তু কপাল-লিখন আর এক রকম—একটা কূলকিনারাহীন অজানা চিন্তার গুরুভার ভেতরে ভেতরে তাঁকে অস্থির করে তুলেছিল। ভাদিন আসলে অনেক দিন থেকেই জীবনের অর্থ খুঁজে ফিরছিলেন যার হদিস বিজ্ঞানের গবেষণায় মেলে নি, অশান্ত মনও শান্ত হয় নি।

ভাদিন অবশ্য বালক বয়স থেকেই ভাবতে শুরু করেছিলেন জীবনটা আসলে কি, তার অর্থ ই বা কি। ইস্কুলে, কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময়ে দর্শন শাস্ত্রের অনেক বই সংগ্রহ করেও তিনি পড়ে দেখেছিলেন, কিন্তু মনের মতো জবাব পান নি, মনেও শান্তি আসে নি। ওসব যে নেহাতই শুকনো গ্রন্থ চর্চার পণ্ডিতী কচকচি ছাড়া আর কিছুই নয়, তাই তাঁর মনে হয়েছিল। অবশ্য ব্যাপক পড়াশোনা তাঁর সাময়িক অনুসন্ধিৎসা কিছু মিটিয়েছিল বৈকি!

ভাদিনের বাবাও পণ্ডিত লোক, লেনিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক; ওদিকে আবার একনিষ্ঠ পার্টিকর্মী। এবং প্রচণ্ড রকমের নাস্তিক লোক। এই পরিবেশে গতানুগতিক ভাব ধারার মধ্যে মানসিক উৎক্ষেপ, শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ চেতনায় আকর্ষণ অস্বাভাবিকই মনে হতে পারে; তবু তাই তাঁর জীবনে সত্যি হয়ে দেখা দিয়েছিল।

তাশখন্দ ছেড়ে লেনিন হিলের মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে নিজেকে ভাদিনের ভারি মুক্ত পুরুষ বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু মনের অস্থিরতা, তখনও ছিল পুরোমাত্রায়। আর এই সময়েই তাঁর জীবনে এলো প্রেম, কূলপ্লাবী আবেগ নিয়ে মানবী প্রেমের ঢেউ। ক্ষণেকের জন্য তাঁর মনে হলো, অশান্ত মন এবার শান্ত হবে বহুবাঞ্ছিত প্রশান্তির মধ্যে স্থিতি পাবে। কিন্তু এহ বাহ্য, তিন বছর পর ভাদিন টের পেলেন, এ যে আর এক রকমের জটিলতা, মনের অস্থিরতা, বাড়িয়ে তোলার আর এক যন্ত্র। হাতের গোলাপ থেকে পাপড়ি ছিঁড়ে ফেলার মতো করে ভাদিন রমণীর প্রেম জীবন থেকে ছিন্ন করে দিলেন।

তখন মস্কোতে ভাদিনের অনেক বন্ধু জুটেছে। তাঁদেরই একজন সব সময় তাঁকে ইস্কনের কথা বলতেন, কৃষ্ণ চেতনার কথাও উল্লেখ করতেন কিন্তু দর্শন শাস্ত্র, তার ঐশ্বর্য বা নিগূঢ় মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কোনো কথাই তাঁর কাছে মোটেই শোনা যেত না। কৃষ্ণ কথাই ছিল তাঁর একমাত্র আলোচ্য বিষয়। ভাদিনের মনে হলো যেন সব নতুন কথা। আর এই সূত্রেই ভাদিন হলেন একদিন বৈদ্যনাথ দাস।

'কৃষ্ণ চেতনার ব্যাপারটিকে আমি খুব খতিয়ে দেখলাম,' মায়াপুরে বসে বৈদ্যনাথ দাস বললেন—'কথাটা যেন মনে খুব ধরল। বন্ধুকে আমি বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখতে লাগলাম। আমার বেশ মনে হলো, ওঁর কথা শূন্যগর্ভ নয়, কথায় যেন নিগূঢ় একটি অর্থ আছে, পেছনে কি যেন একটা সত্যের দিকও আছে।'

'আর আপনি, তাই ওঁদের দলে ভিড়ে পড়লেন?'

'ঠিক তা নয়, বৈদ্যনাথ সেদিনের কথায় বললেন—' 'আমার মনে তখনও একটা সন্দেহের ভাব ছিল। দু'বছর আগেই আমি নিরামিষ খেতে শুরু করেছিলাম। একরকম হঠাৎই। ওঁর কথায় বুঝতে পারলাম, কৃষ্ণ চেতনা জাগ্রত করতে নিরামিষ সেবনের যেমন প্রয়োজন আছে, নিয়মিত কৃষ্ণনাম করারও দরকার আছে। ভাবলাম, ওঁর মতো হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করলে কেমন হয়। যথা ভাবনা, তথা কর্ম—'

'কিন্তু তখন তো আপনি হোস্টেলে থেকে খেয়ে পি-এইচ-ডি করছিলেন,' আমি বললাম, 'হোস্টেলে নিরামিষ খাবার পেতেন !'

'তা কি আর পেতাম,' বৈদ্যনাথ বললেন, 'প্রথম দিকটায় খুবই অসুবিধা হতো। শেষ পর্যন্ত রান্না করে খেতে শুরু করলাম—ভাত, ডাল, হালুয়া, আর সামান্য যা কিছু সব্জী মিলত, তাই—গাজর, আলু, বাঁধা কপি। সব্জী বলতে রাশিয়াতে আর কিই বা আছে।'

হাসতে হাসতে আমি বললাম—কেন, স্যালাড খাবার শশাও তো রয়েছে, কাঁচা সব্জীর নামান্তর বলে দিব্যি খাওয়া চলে ?'

রহস্যটি বুঝতে পেরে বৈদ্যনাথও হাসতে লাগলেন। প্রবল শীত আর দুর্যোগের দেশ বলে রাশিয়ার সব জায়গায় সব রকম সব্জী ফলে না, তবে গাজর (Carrot), বাঁধাকপি (Cabbage), শশা (Cucumber), আলুর (Potato) তেমন অভাব নেই। অর্থাৎ cccp মোটামুটি সব জায়গাতেই মেলে।

ওদিকে সোভিয়েৎ দেশের সংক্ষিপ্ত নামও CCCP—সাউজ্ সোভিয়েৎস্কি সোশালিৎস্কি রিপাবলিকিস্কি কথাটার সংক্ষেপ। বলা প্রয়োজন, রাশিয়ান ভাষায় C দিয়ে স এবং P দিয়ে R হয়। CCCP ইংরেজীতে দাঁড়ায় ইউনিয়ন (সাউজ) অব দি সোভিয়েৎ সোশালিস্ট রিপাবলিক। রাশিয়ায় সব্জীর অপ্রাচুর্য নিয়ে ঠেস দিয়ে কৌতুক করতে বিদেশীরা প্রায়ই বলে ক্যাবেজ-ক্যারট-কিউকাম্বার-পটাটোর দেশ ! খাস রাশিয়াতে বসেই। কথাটা তারা প্রায়ই বলে।

বৈদ্যনাথের বয়স বত্রিশ, মুখ গোলগাল, গায়ের রং ফরসা বাঙালীদের মতো। তাঁর পরিষ্কার-কামানো মাথায় লম্বা শিখা, পরনে গেরুয়া ধুতি, হাতে মালার থলে খুব বড় করে চোখে পড়ে। তার ওপর আবার কপালে রয়েছে লম্বা তিলক। সাজ সজ্জায় আচার-আচরণে বৈদ্যনাথ পুরোদস্তুর বৈষ্ণব। জোড়াসনে বসে তিনি আমার সঙ্গে কথাও বলছিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে মালাও ফেরাচ্ছিলেন। বৈষ্ণব ভক্তরা সবাই যে তাই করেন !

'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে আমি তো আগেই শুরু করেছিলাম,' আগের

কথার সূত্র টেনে বৈদ্যনাথ বললেন, 'আমার যেন মনে হচ্ছিল, ভেতরে ভেতরে এটা খুব কাজ করছে, আমি শান্তি ফিরে পাচ্ছি, আমার মনে যেন একটা আনন্দের ঢেউ বয়ে চলেছে।'

'নেহাৎ জড় জাগতিক বিজ্ঞানী এবং অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের অধুনা অনুসারক হিসেবে আমি এখন নিশ্চয় করে বলতে পারি, আমার মধ্যে একটা পরিবর্তন ঠিকই এসেছিল, আমি বেশ বুঝে নিয়েছিলাম, ব্যাপারটি অবহেলা করবার নয়, অতএব নিজের মনকে বোঝাবার মতো আরও তো মালমশলা চাই, এর আরও স্পষ্ট ব্যাখ্যা চাই—'

'রাশিয়ার প্রথম দিকের কৃষ্ণভক্ত জপা দাসের (ইউরিফেদ চেঙ্কো) সঙ্গে আগেই আমার পরিচয় ঘটেছিল মস্কোর আন্তর্জাতিক বই মেলায়। বলতে গেলে হঠাৎই। তাঁর কাছেই আমি প্রথম শুনেছিলাম প্রভুপাদের কথা—পরম বৈষ্ণব প্রভুপাদ যে কৃষ্ণ কৃপামূর্তি, জপা দাস তাও বলেছিলেন।'

'এরপর একদিন প্রভুপাদের ভগবদগীতা অ্যাজ ইট ইজ বইটি আমার হাতে এলো, একেবারে কৃষ্ণের করুণার মতো। আমি রাতদিন তার মধ্যে ডুবে রইলাম। প্রভুপাদের এই গীতা-ভাষ্য পড়েই আমার নিশ্চিত ধারণা হলো. ভগবান সত্যি আছেন। এবং শ্রীকৃষ্ণই ভগবান—তিনি বড় কৃপাময়, আমাদের মঙ্গলের কথা ভেবেই তাঁর বাণী তিনি গীতায় রেখে গেছেন। গীতার মধ্যে স্বয়ং তিনিই বিরাজ করছেন। আমার পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতাগুলোর অর্থও আমি খুঁজে পেলাম। আমার পক্ষে এ যে নবজাগরণ, নবজীবনের অধ্যাত্ম স্পন্দন!'

বৈদ্যনাথের দিকে আমি চেয়ে দেখলাম—তাঁর চেহারায় যেন পরিবর্তন ঘটছে, গীতার মন্ত্র তাঁর শিরা উপশিরার মধ্য দিয়ে যেন এইমাত্র একটা আধ্যাত্মিকতার প্রবাহ চালিয়ে দিয়েছে। বৈদ্যনাথের কি তাহলে এবার ভাব সমাধি হবে? আমি ভাবতে লাগলাম, আর তাঁকে খুব লক্ষ্য করে দেখতে লাগলাম।

বৈদ্যনাথ নিজেকে ক্রমে সংহত করে নিলেন, তারপর আবার কথা শুরু করলেন—'আমার সেই নবজীবনের স্পন্দনের মধ্যে দাঁড়িয়ে চারপাশের

দুনিয়াকে আমি নতুন চোখে দেখতে লাগলাম, নতুন জগতের মূর্তি আমার চোখের সামনে প্রতিভাত হয়ে গেল। মনে খুব স্ফূর্তি নিয়ে আমি কৃষ্ণ ভাবনা সঙ্ঘে যোগ দিলাম। কৃষ্ণভক্তের তালিকায় আমার নাম যুক্ত হলো।'

বৈদ্যনাথের কথাগুলো শুনে আমার মনে হলো, আমি কি একজন নবীন বিজ্ঞানীর সঙ্গে কথা বলছি, নাকি চৈতন্যযুগের কোনো বৈষ্ণবের সঙ্গে! কৃষ্ণভক্তি জাগ্রত হলেই কি এই অবস্থা হয়!

বৈদ্যনাথ তখন অন্য অনেক কথাই বললেন, 'ইস্কনে যোগ দিলে কি হবে, পয়সার প্রয়োজন তখনও আছে ; নিজের সব খরচের জন্য তো আর অপরের ওপর নির্ভর করা যায় না—সুতরাং একটা চাকরি চাই, বিশেষ করে পুলিশের চোখে ধূলো দেবার জন্য আমার বাহ্যিক একটা পরিচয় চাই।'

'রিসার্চ-কর্মী হিসেবে যেমন তেমন গোছের কাজ একটা আমি যোগাড় করে নিলাম। জেলে আমাকে কখনও যেতে হয় নি 'ঠিকই, কিন্তু সব সময় আমাকে খুব সতর্ক থাকতে হয়েছে, উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে চলতে হয়েছে।'

'সময়টাও তখন খুব খারাপ ছিল—ব্যক্তির পক্ষে তো বটেই, সমগ্র দেশের পক্ষেও। দুর্নীতি, স্বার্থান্ধতা, স্বজন পোষণ তখন সোভিয়েৎ সমাজের নানান স্তরে ব্যাপক হারে ঢুকে পড়েছে, অবক্ষয়ের আবর্ত সৃষ্টি হয়ে গেছে। আর তারই মধ্যে বসে প্রায় সবাই একটা পরিবর্তন চাইছিল, একটা যুগ বদলের অপেক্ষা করছিল খুব সঙ্গোপনে, সোরগোল না তুলে, ডাক হাঁক না করে।'

'দীর্ঘদিন মুখে কুলুপ এঁটে থাকতে হলেও অবশ্যম্ভাবী একটি পরিবর্তনের অপেক্ষায় প্রায় সবাই ছিল। এবং সেই পরিবর্তনের সামান্য আভাস এসেছিল ক্রুশ্চেভের আমলে। গর্বাচভই তাকে সর্বাত্মক রূপ দিতে চলেছেন।'

'কিন্তু গর্বাচভ উপলক্ষ মাত্র—পরিবর্তনের যে নিশ্চিত ধারা চলে চলে আপন পথ রচনা করেছিল, গর্বাচভের স্থলে অন্য কেউ কর্তা হয়ে বসলেও এই পরিবর্তন ছিল অবশ্যম্ভাবী—দুদিন আগে আর দুদিন পরে, এই যা মামলা।'

'মহামতি গর্বাচভের ওপর কৃষ্ণের করুণা বর্ষিত হোক—তাঁরই পেরেস্ত্রৈকার কল্যাণে ইস্কন রাশিয়ায় এখন বৈধ প্রতিষ্ঠান, অসঙ্কোচে সংশয়ে আমরা

এখন সারা রাশিয়াতে কৃষ্ণনাম করতে পারছি, কারাদণ্ডের ভয়ে এখন আর কাউকে রাখঢাক করে বলতে ফিরতে হচ্ছে না।'

ভাদিন দীক্ষা পেয়েছিলেন । আমেরিকা থেকে হরিকেশ স্বামী বিষ্ণুপাদ ডাকযোগে দীক্ষা দিয়ে তাঁর নাম রেখে ছিলেন বৈদ্যনাথ দাস। হরিকেশ মহারাজ সুইডেন থেকে কীর্তিরাজ দাসকে সঙ্গে নিয়ে মস্কোয় গিয়েছিলেন । সি-আই-এর চর বলে রাশিয়া থেকে তাঁদের বহিষ্কার করা হয়েছিল। অগত্যা ডাকযোগে দীক্ষা দেবার প্রথা তখন থেকেই চালু হয়েছিল।

কিছুদিন আগে হরিকেশ মহারাজ আবার সুইডেনে এলে বৈদ্যনাথ সেখানে গিয়ে গুরুদেবের দর্শন লাভ করেন। এতদিন পর্যন্ত তাঁর একটি ছবি এবং টেপ করা কণ্ঠস্বর বৈদ্যনাথের নিত্য পূজা পেয়ে আসছিলেন। 'এবার তাঁকে চাক্ষুষ দেখে মনে হলো, গুরু মহারাজ যেন আধ্যাত্মিকতা আর পবিত্রতার ঘন বিগ্রহ,' গভীর আবেগে বৈদ্যনাথ দাস বললেন, 'সারা জীবন আমি যাঁর সন্ধানে ছিলাম ইনিই সেই তিনি, যাঁর কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা যায়।'

কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ভারতে আসতে পেরে সোভিয়েৎ ভক্তরা কি ভাবছেন জানতে চাইলে বৈদ্যনাথ বললেন, 'ভাবছেন. রাশিয়ায় এবার আমরা আর একটি বিপ্লব এনেছি। ১৯১৭ সালে ছিল আমাদের রাজনৈতিক বিপ্লব, ক্ষুধা বেকারি নির্যাতন থেকে মুক্তির বিপ্লব। এবার এসেছে আমাদের ধর্মের বিপ্লব—আমাদের পথের কাঁটা অপসৃত হয়ে গেছে, দুঃসময়ের অবসান ঘটেছে, আমাদের কৃষ্ণভক্তির জয় হয়েছে।'

'কৃষ্ণভক্তরা আরও বলছেন—সারা পৃথিবীই ভেবেছিল, সোভিয়েৎ কারাগারে আমাদের তিলে তিলে মরতে হবে। এমনকি খাস রাশিয়ার লোকও তাই ভেবেছিল। এবার জেল থেকে আমরা শুধু মুক্তি লাভই করি নি, শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি ভারতবর্ষে আসতে পেরেছি। এ বিপ্লব নয়তো কি !'

আমি আবার শুধাই, 'এই ধর্মবিপ্লবের কোনো সুদূর প্রসারী ফল আছে কিনা !'

'অতি অবশ্যই,' আমার প্রশ্নের অর্ধেকটা শুনেই বৈদ্যনাথ দাস বললেন— 'তার ফল এখনই স্পষ্ট অনুমান করতে পারা যাচ্ছে। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পর ধনতান্ত্রিক দুনিয়া সোভিয়েৎ রাশিয়ার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছিল, অনেকে সরাসরি যুদ্ধের মাঠে নেমে পড়েছিল। এবারের বিপ্লবে সারা পৃথিবী এখন কৃষ্ণভক্তদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ধনী-গরিব পণ্ডিত-মূর্খের দুনিয়া তাঁদের সমর্থন জানিয়েছে। সোভিয়েৎ দেশ এবার কৃষ্ণভক্তদের দেশ হতে চলেছে।

'১৯১৭ সালের বিপ্লবের পর রাশিয়ায় নেমে এসেছিল লৌহ যবনিকা। সন্দেহ আর অবিশ্বাস ছিল সবার সাথের সাথী। এবার শ্রীকৃষ্ণর রাশিয়ায় পরস্পরের কাছে সবাই এখন গুরু ভাই।'

বৈদ্যনাথ হঠাৎ চুপ করলেন, তারপর ধর্ম বিপ্লবের নামে জয়ধ্বনি তুলে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে শ্রীকৃষ্ণের পটে প্রণাম নিবেদন করলেন।

'আমার কক্ষ ত্যাগ করার আগে বৈদ্যনাথ একটি আশ্চর্য খবর দিয়ে বললেন দীক্ষার পর পি-এইচ-ডি ডিগ্রীর থিসিস জমা দিয়েছিলাম। কৃষ্ণনাম করার অপরাধে পুলিশের রিপোর্ট অনুসারে সাক্ষাৎ ডিগ্রী দেওয়া হয় নি। পাঁচ বছর পর এবার সেই ডিগ্রী পেয়েছি পেরেস্ত্রৈকার কল্যাণে!'

১২

রাশিয়ার অন্য অনেকের মতো কিতানিনা মুখাইলোভনাও কৃষ্ণভক্ত হয়েছিলেন। তাঁর নেপথ্য ইতিহাসও লাঞ্ছনার ইতিহাস, উদ্বেগ, অশান্তি, কারাবরণের ইতিহাস। পৃথিবীর অন্য দেশের কৃষ্ণভক্তদের ভাগ্যে এই সব লাঞ্ছনা এতটুকুও জোটে নি। রাশিয়ান ভক্তরা এ বিষয়ে কিছু মন্দ ভাগ্য—কৃষ্ণ বিশেষজ্ঞরা কথাটা মোটেই যে স্বীকার করেন না আমরা তা বারবার উল্লেখ করেছি।

সামান্য এক রেল-শ্রমিকের ঘরে কিতানিনার জন্ম হয় ১৯৩৪ সালে। স্ট্যালিনগ্রাড শহরে। বিগত বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা এবং তার নগ্ন করুণ বীভৎসতা ঐখানেই তাঁর চোখে পড়ে—আতঙ্কে উদ্বেগে মৃত্যু চিন্তায় বাল্যের বিষণ্ণ দিনগুলো তাঁর কাটতে থাকে। তারপর জার্মানরা স্ট্যালিনগ্রাড ধ্বংস করলে কিতানিনার পরিবার পশ্চিমে হটে আসে রোস্টভ অঞ্চলের কামেন্স্কে। মা আর ঠাকুমার সঙ্গে কিতানিনা, ওখানেই থাকতেন। কিন্তু দুর্দশা ছিল তাঁদের সাথের সাথী, জার্মান দস্যুরা তাঁর মাকে ধরে জার্মানীতে পাচার করার মতলব করেছিল, ঠাকুমা অনেক কৌশল করে তা ঠেকিয়েছিলেন।

হাই ইস্কুলের পাট চুকিয়ে কিতানিনা মস্কোতে তখন ডাক্তারী পড়ছেন এবং রাজনীতির সঙ্গে অল্পবিস্তর যোগাযোগ রক্ষা করেও চলেছেন। যুব-কম্যুনিস্ট প্রতিষ্ঠান কমসোমলের বহু বাঞ্ছিত সদস্যপদও তিনি পেয়ে গিয়েছেন। কিতানিনার তখন উৎসাহ-উদ্দীপনার অন্ত নেই। ভবিষ্যৎটি বেশ উজ্জ্বলই মনে হচ্ছিল—কোনো দিক থেকে কোনো আশঙ্কা, কোনো দুরদৈবের কথা ভাববার কোনো কারণ ছিল না।

সায়েন্টিফিক ইনস্টিটিউট থেকে পাশ করে বেরোবার বারো বছর পর কিতানিনা

ক্যাণ্ডিডেট-অব-সায়েন্স (ডক্টরেটের ঠিক পূর্ব ধাপ) হয়েছিলেন, মাঝ পথে পড়াশোনায় ছেদ পড়লেও এম-ডি ডিগ্রীর জন্য তৎপরতা এগিয়ে চলেছিল। সায়েন্টিফিক রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে একটি চাকরিও তাঁর জুটে গিয়েছিল। কিতানিনা কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেছিলেন অনেক আগেই, মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে।

এ সব হচ্ছে তাঁর কৃষ্ণ ভাবনা সঙ্ঘের সংস্পর্শে আসার আগের কথা। জন্ম তাঁর ঘোর নাস্তিক পরিবারে—সুতরাং ধর্মের কোনো কথা, কোনো আলোচনা বাড়িতে কখনও শোনাই যায় নি। কিতানিনার শুধু দিদা ছিলেন খৃস্টান। কিন্তু তা কোনো ব্যাপারই নয়। বৃদ্ধার কথা আর কে শোনে, কেই বা তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে প্রভু যিশুর গুণ গায়!

কিতানিনা সর্বপ্রথম রাজযোগ আর হঠযোগের কথা জানতে পারেন, কিছু যোগাভ্যাসকারীর সঙ্গেও মেলামেশা শুরু করেন—ধর্ম সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা পাবার সুযোগ তখনও তাঁর হয় নি। রাশিয়ানে অনূদিত সরকারি সংস্করণের গীতা পাঠের প্রথম সুযোগ ঘটে।

ঐ সময়েতেই দৈবক্রমে অনন্ত শান্তির সংস্পর্শে আসবার সুযোগ ঘটে। অনন্ত শান্তির কথা পূর্বেও আমরা সামান্য উল্লেখ করেছি। সোভিয়েৎ দেশে তিনিই হচ্ছেন প্রথম কৃষ্ণ ভক্ত—তাঁকে দীক্ষা দিয়েছিলেন স্বয়ং প্রভুপাদ। তাঁর সঙ্গে অনন্ত শান্তির দেখা হয় অনেকটা অভাবনীয় ভাবে।

মস্কোতে স্বল্প অবস্থানকালে একদিন তিনি রেড স্কোয়ারে পায়চারি করছিলেন। দুজন তরুণ হঠাৎ তাঁর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁদের একজন ছিলেন ভারতবর্ষের কোনো এক ডিপ্লোম্যাটের ছেলে, অপর যুবক আনাতলি পিনায়েস্লেভ, মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রযুক্তিবিদ হিসেবে তখন কর্মরত।

যুবক দুজন শেষ পর্যন্ত প্রভুপাদের হোটেল কক্ষে দেখা করতে এলেন। প্রভুপাদ তাঁদের পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা বললেন, পরমাত্মার সঙ্গে যে জীবাত্মার সম্বন্ধ রয়েছে তা ব্যাখ্যা করে বোঝালেন। দুজনায় আরও জানতে পারলেন, সারা পৃথিবীতে অনেক শ্রীকৃষ্ণ মন্দির রয়েছে, হাজার

হাজার লোক হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করে চলেছেন। এবং তাঁরা সবাই সংযমী, শুদ্ধাচারী, নিরামিষ ভোজী।

আনাতলি পিনায়েস্লেভ শেষ পর্যন্ত প্রভুপাদের কাছে দীক্ষা নিলেন। নাম হলো তাঁর অনন্ত শান্তি দাস। দশ বছর অক্লান্ত পরিশ্রমে সারা সোভিয়েৎ দেশ ঘুরে ফিরে অনন্ত শান্তি কৃষ্ণ কথা, কৃষ্ণ ভাবনা প্রচার করেন, গীতা, ভাগবৎ ইত্যাদি গ্রন্থাদি বিতরণ করেন। এপ্রিলে কে-জি-

বি তাঁকে বন্দী করে মানসিক হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়।

অনন্ত শান্তি এখন সোভিয়েৎ কৃষ্ণভক্তদের প্রেরণাস্থল।

এই অনন্ত শান্তিই একদিন কিতানিনাকে প্রভুপাদের ইজি জার্নি টু আদার প্ল্যানেট বইটি পড়তে দেন। আধ্যাত্মিকতার পথে কিতানিনার এই হচ্ছে প্রথম পদক্ষেপ। বইখানা পড়ে তিনি খুব অনুপ্রাণিত বোধ করেন; তাঁর মনে একটা আধ্যাত্মিক আনন্দের অনুভূতি জন্মে। ক্রমে আহার-নিদ্রা-ভোগ-বিলাস লক্ষিত গতানুগতিক জীবনে তাঁর বিতৃষ্ণা জাগে—একটা পরিবর্তনের জন্য ভেতরে ভেতরে তিনি ব্যগ্র হয়ে পড়েন।

এবার কিতানিনার সুযোগ হয় প্রভুপাদের ভগবদ গীতা অ্যাজ ইট ইজ বইটি পড়ে দেখবার। সময় নষ্ট না করে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ, নিরামিষ সেবন, সর্ববিষয়ে শুদ্ধাচার অভ্যেস করতে শুরু করে দেন। পঁচিশ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়েছিল, বিবাহিত জীবনের সঙ্গে এতদিন পর্যন্তও তিনি খাপ খাইয়ে চলে আসছিলেন। আর সম্ভব হলো না—এবার ঘটল বিবাহ-বিচ্ছেদ। তখন স্বয়ং হরিকেশ স্বামী রয়েছেন মস্কোতে।

তাঁর কাছে গিয়ে কিতানিনা দীক্ষা নিলেন। নাম হলো তাঁর বৃষ্ণি দেবী দাসী।

'দীক্ষার পর আমার যেন একটা নতুন অভিযান শুরু হলো, বৃষ্ণি দেবী-দাসী বললেন—'হিমালয়ের দুর্গম পথে অভিযাত্রার মতো। একটা যেন বেশ ভারশূন্যতা অনুভব করলাম। শরীর ও মন ভারি হাল্কা বোধ হলো। মনে কিছু শান্তিও পেলাম। বেশ বুঝতে পারলাম, এ হচ্ছে, ভগবদ পদে আত্মনিবেদনের শান্তি।'

বৃষ্ণি দেবীদাসী এবার জীবনের ধারা আমূল পাল্টে দিলেন, নেহাত জড়-জাগতিক বন্ধুদের ধরা ছোঁয়া বাঁচিয়ে দূরে সরে যেতে শুরু করলেন। কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন না, আবার ইস্কনের সঙ্গে যোগাযোগের কথাও গোপন রাখলেন—এমনকি কর্মস্থলেও তা কেউ জানতে পারল না। তাঁর চলাফেরা আর ভাবগতিক লক্ষ্য করে ঘনিষ্ঠ মহলের লোকেরা বলতে লাগল, কিতানিনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, মানসিক হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা না করালেই নয়। এমনকি নিজের যুবক ছেলে বেঁকে বসে বলল—কৃষ্ণের সঙ্গে সব সম্পর্ক তোমাকে ত্যাগ করতে হবে, ইস্কন ফিস্কন ছাড়তে হবে।'

বৃষ্ণির মা-ও ক্ষেপে গেলেন, তিনি বললেন, 'তোমার এ সব হচ্ছেটা কি ? ধর্ম ? এখন কেন ? আগে সত্তর বছর বয়স হোক ? তাছাড়া কৃষ্ণ কেন ? যিশু খৃষ্টই তো আমাদের ভগবান !'

বৃষ্ণির ভ্রূক্ষেপ নেই, নিজের নতুন অভিযাত্রার পথে একলাটি এগিয়ে চলেছেন। রাশিয়ায় কৃষ্ণ ভাবনার প্রথম যুগে এ বড় কঠিন পথ। 'কিন্তু আমি তখন ভাবছি, আমার মোহমুক্তি ঘটে গেছে, বৃষ্ণি বললেন, নিরন্তর অস্বস্তি নিরর্থক দুশ্চিন্তা থেকে বহু বাঞ্ছিত মুক্তি পেয়েছি—মনে বেশ একটা প্রশান্তির আভাস পাচ্ছি।'

বৃষ্ণি দেবীদাসীর তখন দুবার দীক্ষা হয়ে গেছে। অভিজ্ঞ কৃষ্ণভক্তের পক্ষেই এমনটি ঘটে। এবং তখনই তাঁর গায়ত্রী মন্ত্র মেলে। বেশ অনুমান করা যায়, সমস্ত গোপনীয়তা সত্বেও অভিজ্ঞ কৃষ্ণভক্ত হিসেবে বৃষ্ণির তখন নাম হয়ে গেছে, নইলে কি তাঁর ওপর আর কে-জি-বির নজর পড়তে পারে। আসলে কে-জি-বির কাছে বৃষ্ণি মার্কামারা।

কে-জি-বি এসে প্রথম তাঁর মুখোমুখি দাঁড়ায়, গৃহতল্লাসী করে তাঁকে ধরে নিয়ে যায় ; শেষ পর্যন্ত স্থান হয় তাঁর মস্কোর জেলে। কম্যুনিস্ট দল থেকেও তাঁকে বহিষ্কার করা হয়। বাড়িতে কে-জি-বির শুভাগমনের আগে কিন্তু একটি ব্যাপার ঘটে, তাঁর ভূতপূর্ব স্বামী এসে বলে—'কৃষ্ণ-ভক্তদের সব কথা ফাঁস করে দাও ; পুলিশ তোমাকে কিচ্ছুটি বলবে না।

নইলে কিন্তু জেলে যেতে হবে।'

বৃষ্ণি চুপ করে থাকেন। তাঁকে সন্দিগ্ধ দেখে লোকটি আবার বেশ বড় রকম ভয় দেখাবার কায়দায় বলে, 'জেল থেকে কোনোদিনই তুমি বেরোতে পারবে না, আর কখনও কাজও জুটবে না।'

'কিন্তু কৃষ্ণভক্ত কি ভয়ে কখন ভীত হয়, নাকি কৃষ্ণকে ছাড়ে, বৃষ্ণি দেবীদাসী মৃদু হেসে বললেন, 'লোকটির কপালে আগুন দিয়ে কে-জি-বির মুখে ছাই ছিটিয়ে আমি ডবল উৎসাহে কৃষ্ণ ভজনা শুরু করে দিলাম।'

'আমার সরকারি চাকরিটি চলে গেল ; দীর্ঘদিন খালি পড়ে থাকলেও সেই পদে আমাকে আর নিয়োগ করা হলো না।'

'কৃষ্ণ ভজতে গিয়ে এমন দুর্গতি আর লাঞ্ছনা হলো,' আমি এবার প্রশ্ন করলাম, 'মনে কোনো অভিমান এলো না, কোনো—'

'নাহ', আমাকে বাধা দিয়ে বৃষ্ণি চট করে বললেন, 'আমি তো ঐ লাঞ্ছনা গঞ্জনার জন্য সব সময় তৈরিই ছিলাম। আত্মীয়-পরিজন ভেঙে পড়লেও আমি সবই শান্ত ভাবে গ্রহণ করলাম। মন বলল—কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে, তাঁর ইচ্ছাতেই আমার দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হবে!'

'এই জীবন কারও ভালো লাগতে পারে না, কাম্য হতেও পারে না, বন্দীদশা প্রসঙ্গে বৃষ্ণি দেবীদাসী বললেন, 'আমার আবার সব চেয়ে খারাপ লাগত সহবন্দিনীদের। তারা ছিল নিরতিশয় নীচু স্তরের জীব—বিড়ি চরস খেতো, চোরা পথে মদ এনে গিলত, গালিগালাজ ছাড়া কথাই বলত না। তাদের কথ্য ভাষা এবং বিষয়বস্তু ছিল খুবই অকথ্য।'

'ঐ সহবন্দিনীরা নিজেদের মধ্যে সব সময় ঝগড়া করত, চেঁচামেচি মারামারি করত। জেলবাবুরা এত বিব্রত আর বিরক্ত হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁদের ঝগড়া বিবাদ করতে দেখেও এগিয়ে আসতেন না, কাউকে শাস্তি দিতেন না। অথচ আমাকে কিন্তু সব সময় ধমকের সুরে বলতেন, সাবধান, ওদের মধ্যে কৃষ্ণকথা প্রচার করবে না, কাউকে জপতপ শেখাবে না।'

'আত্মীয় বন্ধুদের কেউ এলে যে দুটো ভালো কথা শুনব, ওদের সঙ্গে বাস করে তার উপায় ছিল না—অবশ্য কাউকে তেমন আসতেও দেওয়া

হতো না।'

'আমার গৃহতল্লাসীর সময় কিছু অদ্ভুত ঘটনা ঘটে,' কথা প্রসঙ্গে বৃষ্ণি দেবীদাসী এবার বলেন—'বাড়ির দরজায় এসে পুলিশের লোক বেল বাজিয়েই চলেছে। আমি তো খিল এঁটে ভেতরে বসে আছি। কি আর করবে, ওরা পাশের ফ্ল্যাটের ব্যালকনি দিয়ে আমার ঘরে ঢুকে দারুণ থানা-তল্লাসী শুরু করে। ওয়ার্ডরোবে ভগবদ গীতাখানা পড়ে ছিল, ওদের তা নজরেই পড়ে না। জপমালাটা দেখতে পেয়ে ওরা হাতে তুলেও নিল, তারপর হেলায় একটা বস্তার ওপর ফেলে রাখল। ফাঁকতালে সরিয়ে নিয়ে ওটা কিন্তু আমি বুকের মধ্যে চালান করে দিলাম। ওরা কিছু টেরই পেল না!'

জেল থেকে বৃষ্ণি দেবীদাসীকে শেষপর্যন্ত শ্রম শিবিরে চালান করা হয়। আগেই সেখানে পঞ্চাশ জন বন্দিনীর স্থান হয়েছিল। তাদের দিয়ে মিলিটারি পোশাক সেলাইয়ের কাজ করানো হতো। বৃষ্ণি দেবীদাসী ছিলেন ডাক্তার, কিন্তু উপায় ছিল না। সেলাইয়ের কাজ তাঁকে করতেই হতো। ওপর মহলের নির্দেশ ছিল, ডাক্তারী করার বদলে তাঁকে দিয়ে যেন সেলাইয়ের কাজই করানো হয়।

শেষপর্যন্ত দয়া পরবশ হয়ে ওরা আমাকে একটু অন্য ধরনের কাজও দিয়েছিল, বৃষ্ণি বললেন, 'অন্য সকলের সেলাই করা পোশাকের পাহাড় প্রমাণ স্তূপ বয়ে নিয়ে অন্য জায়গায় জমা করতে আমাকে বলা হলো। বুঝতেই পারছেন, ওটা বড় পরিশ্রমের কাজ। বোঝা বইতে বইতে আমি হাড্ডিসার হয়ে পড়লাম—শক্তি সামর্থ্য আমার লোপ পেয়ে গেল।'

'ওদের মনে বোধহয় দয়া হয়ে থাকবে এবার তাই ওরা আমাকে দিলো সব ইস্তিরি করার কাজ। ভাবুন একবার, আমি কিনা একজন ডাক্তার!

'শ্রম শিবিরের সহকর্মিণীরা একদিন অভিযোগ করল, আমি নাকি নিজস্ব একটা বাথরুম বানিয়ে নিয়েছি, রোজই নাকি আমি স্নান করি। সবার পক্ষে সপ্তাহে শুধু একদিনই ছিল স্নানের সুযোগ। আমিও তাই করতাম, অন্যদিন আসলে শুধু হাত-মুখ-ধোওয়ার বদলে সারাটা শরীর ধুয়ে মুছে

নিতাম—জপতপ করতে নাহলে ভালো লাগত না। তাই এতো সোর-গোল।'

'নালিশ পেয়ে শিবির-কর্তা আমাকে ভয় দেখিয়ে বললেন, গা-গতর ধোওয়া চলবে না। আমিও চেঁচিয়ে বললাম—চলবে, কারণ আমার উপায় নেই। তিনি এদিক ওদিক দেখে একটু মুচকি হেসে চলে গেলেন। ব্যাপারটা ওখানেই শেষ হলো।'

'সবই কৃষ্ণের করুণা। তাঁর করুণাতেই অবস্থার আরও পরিবর্তন ঘটল। ওরা আমাকে এবার ডাক্তারীর কাজেই লাগিয়ে দিলো। শ্রম শিবিরের লোকদের প্রয়োজন মতো আমি চিকিৎসা করতে শুরু করলাম। ইস্তিরির কাজ আর করতেই হলো না।'

'আমি যে কৃষ্ণভক্ত ওখানে কেউ তা জানত না। সবাই ভাবত রাজনৈতিক অপরাধে আমার শাস্তি হয়েছে। আসলে জেল-কর্তারাই এই ধারণাটা সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। যাতে আশেপাশে কৃষ্ণকথা প্রচার না হয়, কয়েদীরা কৃষ্ণ থেকে দূরে সরে থাকতে পারে। তবু তাদের সন্দেহ হয়, ধর্মের সঙ্গে আমার অপরাধের যে সম্পর্ক আছে ওরা সেটা বুঝতে পারে। হয়তো আমার জপতপ করা থেকে, মস্করা করে ওরা আমার নাম দেয় ব্যাপটিস্ট—খৃষ্টধর্মের দীক্ষাদাতা! খৃষ্টধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের কথা তারা শোনেইনি।'

রাশিয়া থেকে কৃষ্ণ সন্ন্যাসীদের প্রথম কলকাতা আগমন প্রসঙ্গে বৃষ্ণি দেবীদাসী বললেন, 'বিমান দমদমের মাটি স্পর্শ করার আগেই আমাদের সবার চোখ আনন্দের অশ্রুতে ভরে উঠেছিল। কত ফুল, কত মালা, হৃদয়ের কত উষ্ণ অনুরাগ নিয়ে আমাদের সবাই অভ্যর্থনা করলেন, কৃষ্ণের নাম গান করে আমাদের স্বাগত জানালেন, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই যেন তাঁর মঙ্গল হস্ত বাড়িয়ে দিয়ে আমাদের গ্রহণ করে নিলেন।'

'মায়াপুরেও আমরা উচ্ছ্বসিত অভ্যর্থনা পেয়েছি। এইরকম অভ্যর্থনার অভিজ্ঞতা আগে আমাদের ছিল না, ফেস্টুন-হাতে অগণিত মানুষের মিছিল, তার পুরোভাগে দুটো সুসজ্জিত হাতি, পশ্চাৎপটে সুবিশাল ফুল-

বাগান, শীতল জলের ফোয়ারা, নারিকেলের কুঞ্জবন। সব মিলিয়ে মনে হলো যেন বৈকুণ্ঠধামে উৎসব চলছে।'

'মায়াপুরের মহাপ্রসাদ তো স্বর্গীয় বস্তু—খেয়ে মনে হলো, শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীতে যখন সশরীরে বিরাজ করছিলেন, একমাত্র তখনই এই রকম প্রসাদ রেঁধে তাঁকে নিবেদন করা হতো।'

প্রবল আবেগ নিয়ে এই শেষ কথাটি বলতে বলতে তাঁর চোখে তখন জল এসে গেছে। বৃষ্ণি দেবীদাসী মাটিতে মাথা নুইয়ে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম নিবেদন করলেন।

১৩

তাশখন্দের আর এক কৃষ্ণভক্ত মাধব ঘোষ দাস, যাঁকে দেখলেই মনে হয় বড়ই যেন অন্তর্মুখী, সত্যম্‌-শিবম-সুন্দরমের সাধনায় আত্মমগ্ন। রাশিয়ার অন্য অনেক কৃষ্ণভক্তের মতো তাঁর জীবন কখনও পুলিশ জুলুম, জেল, লেবার ক্যাম্পের অবমাননায় অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে নি। মোটামুটি শান্তির মধ্যে, অবাধ স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে আপন আনন্দলোকে স্থির হয়ে বসে তিনি কৃষ্ণ সাধনা করতে পেরেছেন। এমনটি অনেকের ভাগ্যেই সম্ভব হয় নি।

আমরা ভাবতে ভালবাসি, তাশখন্দের লোকের পক্ষে কৃষ্ণভক্ত হওয়াটা তেমন কোনো ব্যাপারই নয়—কারণ তাশখন্দ মধ্য এশীয় শহর, এবং সেই হেতু তাশখন্দীরা আমাদের খুব কাছের লোক। আমাদের আচার-আচরণ-সংস্কৃতিতে ওরা শ্রদ্ধাবান। আসলে এটা আমাদের ভাবপ্রবণতা।

পৃথিবীর যে কোনো স্থানে তাশখন্দের লোকের সঙ্গে আমার দেখা হলে লালবাহাদুর শাস্ত্রীজীর কথা উঠত প্রথমেই—সে হচ্ছে রাজনৈতিক নেতা লালবাহাদুরের কথা। মাধব ঘোষ দাস কিন্তু রাজনীতির ধারে কাছে না গিয়ে প্রথমেই বললেন, 'শাস্ত্রীজী ছিলেন প্রভুপাদের ব্যক্তিগত বন্ধু।' কৃষ্ণভক্তদের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক, দিল্লী-লণ্ডন মস্কো-তাশখন্দ নিয়ে কথা তুলুন, শ্রীকৃষ্ণ, প্রভুপাদ কিংবা কৃষ্ণভক্তি ইত্যাদি জাতীয় প্রসঙ্গ ছাড়া কোনো কথাই তাঁরা বলবেন না। অন্য প্রসঙ্গ তাঁদের কাছে অবান্তর।

দীক্ষার আগে মাধব ঘোষ দাসের নাম ছিল চিমুর ফয়জি রহমানফ—নামের শেষ শব্দটি আসলে রহমান, সোভিয়েৎ সংস্করণে রহমানফ হয়ে গিয়েছে। মুসলিম কুলোদ্ভব রহমান এখন ধুতিপরা তিলক-কাটা, মালার থলে হাতে শুদ্ধ শান্ত আনন্দ মূর্তি বৈষ্ণব, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যের ভাবে বিভোর। এমন আপাদমস্তক বৈষ্ণব খুব কমই চোখে পড়ে।

অথচ মাধব ঘোষ দাস বয়সে তরুণ। তাঁর শরীরের গড়ন লম্বাটে, চোখ দীপ্তিমান এবং সমস্ত মুখমণ্ডল যেন অকপট প্রশান্তিতে আলিপ্ত। মাথার মোটা শিখা গুচ্ছ শুধু বৈষ্ণবের পরিচয় চিহ্ন নয়। তাঁর মস্ত গর্ব—বহু জন্মের তপস্যার ফলে গর্ব করার মতো এমন বস্তু যেন মিলে গিয়েছে। তাঁর কথায় তাই তো মনে হলো। এখনও প্রলম্বিত শিখাগুচ্ছের স্বাচ্ছন্দ্য দেখলে বেশ অনুমান করা যায় মুণ্ডনের আগে তাঁর মাথায় ছিল ঘন কালো চুলের রাশ।

প্রভুপাদের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি ত্বনিয়ার সব কৃষ্ণভক্তরই রয়েছে, কিন্তু মাধব ঘোষ দাসের ভক্তি, প্রভুপাদ সম্বন্ধে তাঁর বিচার বিশ্লেষণ, তাঁর পরিমাপ কিন্তু অন্য রকম, যাকে বলে খুবই সূক্ষ্ম আর বিজ্ঞান সম্মত। প্রভুপাদের বৈষ্ণবীয় অবদান যে শুধু কৃষ্ণভক্ত সমাজের জন্য নয়। সেই কথাই মাধব ঘোষ দাস বললেন, 'একমাত্র প্রভুপাদের বইগুলি পড়েই সমগ্র মানব-জাতির মুক্তি লাভ করা সম্ভব। মুক্তির বীজমন্ত্র তাঁর গ্রন্থাবলীতেই ছড়িয়ে রয়েছে।' এমন কথা অন্য কোনো কৃষ্ণভক্তর মুখে আমি আগে কখনই শুনি নি।

রহমান প্রভুপাদের কথা শুনেছিলেন বয়স যখন তাঁর আট বছর, দাদামশাই বলেছিলেন, 'পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে একজন হিন্দু সন্ন্যাসী একটি নতুন ধর্ম প্রচার করে বেড়াচ্ছেন, তা নাকি মার্কসীয় দর্শনের বিরোধী, কিন্তু তুলনায় অনেক মজবুত, অনেক শক্তিশালী। সারা পৃথিবী নাকি একদিন ঐ হিন্দু সন্ন্যাসীর প্রচারিত ধর্মে আকৃষ্ট হবে।'

কথাটা রহমানের খুব মনে ছিল।

দাদামশাই কিন্তু আরও একটি আশ্চর্য কথা বলেছিলেন, 'বিশ্ব চরাচরের সব কিছুই ভগবান শ্রীহরির তেজপুত্রজকে ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে।'

এই কথাটাও রহমানের খুব মনে ধরে, কোমলমতি বালক হলেও দিন দিন তাঁকে বেশ ভাবিয়ে তোলে। পরবর্তী বৈষ্ণব জীবনের বুনিয়াদ একটু করে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

মাত্র তেরো বছর বয়সে কমসোমলস্কায়া প্রাভদা পত্রিকায় জর্জ হ্যারিসনের

ভারত দর্শন বিষয়ক একটি প্রবন্ধ তাঁর নজরে পড়ে। ইংলণ্ডের ইংরেজ জর্জ হ্যারিসন তখন খুব জনপ্রিয় লোক। তাঁর সংস্পর্শে এসে অনেক অ-ভক্ত মানুষও তখন হরেকৃষ্ণ গান গাইছে। রহমান তখনই জানতে পেরেছিলেন, বীট্‌লরা ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি সঙ্গীতাদির দ্বারা খুব অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত।

রহমানের তুতো ভাই সেরোজা আবার গীতিকার ; তাঁর সাহায্যেই বীট্‌ল-সঙ্গীতের ক্যাসেট তিনি সংগ্রহ করে নেন।

বীট্‌ল-সঙ্গীত এবং তার ক্যাসেট রাশিয়ায় তখন নিষিদ্ধ নয়। তবু গোপন আড্ডায় গিয়ে এই গান শোনা, ক্যাসেট সংগ্রহ করা, গানের রেকর্ড করা ইত্যাদি কাজ খুব সঙ্গোপনেই করতে হতো। যুবমানসে বীট্‌ল-সঙ্গীতের প্রতিক্রিয়া অসাধারণ ছিল বলে পুলিশের নজরে পড়তে, বিপদ ডেকে আনতে আর কতক্ষণ !

প্রাভদা পত্রিকায় ভারত-দর্শন সম্পর্কিত প্রবন্ধটি পড়ে রহমানের মনে একটা উল্লাসের তরঙ্গ বয়ে গিয়েছিল। হ্যারিসনের গানের রেকর্ড হাতে পেয়ে এবার তাঁর মনে খুব শিহরণ এলো—প্রবন্ধে ব্যবহৃত হরেকৃষ্ণ, ভারতবর্ষ, প্রসাদম ইত্যাদি শব্দগুলো তাঁর মনের মধ্যে গেঁথে গিয়ে ক্রমে অনুরণন তুলল।

রহমানের দাদামশাই ছিলেন খাঁটি মুসলিম, আর বাবার বাবা অর্থাৎ ঠাকুর্দা ছিলেন মক্কা-মদিনা ফেরৎ হাজী সাহেব। ঠাকুরদার দিক থেকে রহমান আসলে পারিবারিক নাম, যার অর্থ আকর্ষক। এটি আবার পরমেশ্বর ভগবান সম্পর্কেও প্রযোজ্য—কৃষ্ণ শব্দটি এসেছে কৃষ্ ধাতু থেকে, যার অর্থ, আকর্ষণ করা। কৃষ্ণ সবাইকে আকর্ষণ করেন। ব্যাখ্যা করে কথাটা মাধব ঘোষ দাস আমাকে বললেন, যদিও আগেই আমার জানা ছিল।

ছেলেবেলাকার একটি পারিবারিক মতবৈষম্যের কথা মাধব ঘোষ দাসের এখনও মনে আছে—বাবা তখন চিমুর ফয়জি রহমানের ছুন্নৎ অনুষ্ঠানের উৎসব করতে দিন তারিখ ঠিক করে ফেলেছেন। মা হঠাৎ বেঁকে বসলেন,

নিদারুণ বাধা সৃষ্টি করে বললেন, ওসব এখানে চলবে নি !

মা ছিলেন খৃষ্টানী।

ওদিকে বাবার মর্জিতে ফয়জি রহমানকে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করাও সম্ভব হয় নি। মা তা ঠিক মনে রেখেছিলেন।

'ব্যাপারটি নিশ্চয়ই ধরতে পেরেছেন', মাধবঘোষ দাস মৃদু হেসে বললেন— 'শ্রীকৃষ্ণে শরণ নেবার নিশ্চিত ব্যবস্থা অজ্ঞাতসারে মা বাবাই করে রেখেছিলেন !'

বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা নেবার জন্য রহমান ছিলেন লাবিন সারিতে, ফিনল্যাণ্ডের সীমান্তবর্তী সোভিয়েৎ শহরে। ওখানে বসেই রহমানরা একদিন ফিনল্যাণ্ডীয় টি-ভিতে কৃষ্ণ সন্ন্যাসীদের কীর্তন করতে দেখলেন। রাশিয়ার টি-ভিতে এসব দেখতে পাবার কথা তখন ভাবাই যেত না। ফিন টি-ভিতে ভক্তের দল হরেকৃষ্ণ গান গাইছিলেন বীট্‌লদের অনুকরণে, তাঁদেরই প্রচলিত তালে-লয়ে-সুরে। সমগ্র ব্যাপারটি যুবক রহমানের মনকে খুব টানে, চট করে তাঁর মনে পড়ে দাদামশাইয়ের কথা।

তাঁর সামরিক শিক্ষার সঙ্গীরা ফিন টি-ভির হরেকৃষ্ণ অনুষ্ঠানটি রেকর্ড করে নিয়েছিলেন ; তার নেতৃত্বে ছিলেন তিনি নিজেই। এবার সময় নষ্ট না করে চিমুর ফয়জি রহমান গীটার নিয়ে বসে পড়লেন। ক্যাসেট বাজিয়ে গীটারে হরেকৃষ্ণ কীর্তনের সুর তুললেন। রহমান কৃষ্ণের দিকে তখন অনেকখানি এগিয়ে গেছেন।

'দাদামশাই বীজ বুনে রেখেছিলেন', মাধব ঘোষ দাস বললেন—'আর তাই থেকে কৃষ্ণভক্তির অঙ্কুর উদ্গম হয়েছিল, এবার স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান যে তাঁকে বাড়িয়ে তুলছেন তাতে আর সন্দেহ কি।'

'তাশখন্দে ফিরে এসেই হঠযোগ শিখতে শুরু করলাম', মাধবঘোষ দাস এবার অবিরাম বলে চলেছেন, 'আমার মায়ের এক বন্ধুর বোন আবার লেনিনগ্রাডে ছিলেন হঠযোগের শিক্ষিকা। তাঁর কাছে তালিম নিতে লাগলাম। যোগশাস্ত্রের অনেক বই যোগাড় করে পড়াশোনাও চলল ; সব

রকম যোগাভ্যাসই শুরু করে দিলাম। কিন্তু একটি কথা—এসব আমার তেমন কিছু আহামরি লাগল না, তীব্র কোনো আকর্ষণ বোধ করলাম না।'

'আমার ছিল শিল্পী হবার সাধ, ইস্কুলের পর আর্ট-কলেজে ভর্তি হয়ে শেষ-পর্যন্ত পাশ করেও বেরিয়ে এলাম। কিন্তু আমার মনে মনে তখন অন্য অনেক গুরুতর প্রশ্নও দেখা দিয়েছে— জীবন কোথা থেকে আসে, কোথায় যায়। ভগবান কোথায় বাস করেন ইত্যাদি হাজার রকম প্রশ্ন। হেগেল, কান্ট, প্লেটোর দর্শন নিয়ে আমি খুব পড়াশোনা করলাম। মন ভরল না, মনে তেমন সুখ পেলাম না।'

'আমার অশান্ত মন কিন্তু অনবরত বলতে লাগল, শান্তির পথ নিশ্চয়ই একটা আছে, উপযুক্ত জবাব পাবার পর মানসিক শান্তি। কিন্তু কোথায় গেলে তার সন্ধান পাবো। আর তখনই মনে হতো, একটা অদৃশ্য শক্তি পেছনে যেন অবিরাম ক্রিয়া করে চলেছে, আমার মুখ দিয়ে তার কথা বলিয়ে নিচ্ছে, মন দিয়ে ভাবিয়ে তুলছে।'

বেশ ইঙ্গিতবহ একটি ঘটনা ঘটল, আমার মায়ের এক বন্ধু প্রভুপাদের 'ভগবদগীতা এ্যাজ ইট ইজ' বইটি যোগাড় করে এনে আমাকে পড়তে দিলেন, হয়তো আমার অবস্থাটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেই। আসলে বইটি ছিল প্রভুপাদের বইয়ের রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ, তাও আবার ছাপা বই নয়, টাইপ করা কপি। পড়ে কিন্তু আমার মনে হলো, এই তো আমার বাঞ্ছিত বই, আমার জন্যই তো এ-বই লেখা হয়েছে।'

দুসপ্তাহ পরের কথা। মামুঠাকুর নামে এক সোভিয়েৎ কৃষ্ণভক্তর সঙ্গে রহমানের সাক্ষাৎ হলো। মামুঠাকুরদাস তখন সারা রাশিয়া পরিভ্রমণ করে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করছিলেন। তাঁর সঙ্গে রহমানের হঠাৎ দেখাটা করিয়ে দিয়েছিলেন হামসামা মুহম্মৎ নামে এক মুসলিম মহিলা, যিনি বিগত পনেরো বছর ধরে প্রার্থনা করে চলেছেন একজন সদগুরুর সাক্ষাৎ পাবেন, সেই আশায়।

জন আস্টেক শিল্পী বন্ধু নিয়ে রহমান একদিন মামুঠাকুরের কৃষ্ণকীর্তনে

যোগ দিলেন—তাঁর বক্তৃতা শুনলেন, কৃষ্ণে নিবেদিত প্রসাদ খেলেন ; সব কিছুই হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করলেন। মনে খুব আনন্দ পেলেন। কিন্তু বন্ধুর দল তেমন আমোদিত হলেন না। শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর ভগবান কিনা তা নিয়ে তারা তর্ক তুললেন।

মামুঠাকুর রহমানের মতোই শিল্পী লোক, খুব প্রতিভাধর চিত্রশিল্পী। রহমানের আমন্ত্রণে বাড়িতে এসে তাঁকে পূজা-পদ্ধতি, কীর্তন, প্রসাদ রান্নার প্রণালী ইত্যাদি হাতে-কলমে শিক্ষা দিলেন। রহমানের কয়েকজন মুসলিম বন্ধুও সেদিন আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন। কৃষ্ণভক্ত না হলেও শেষপর্যন্ত তাঁরা কৃষ্ণভগবানকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে শুরু করেছিলেন। খুব ভালো লাগত বলে প্রসাদ খেতেও পরে তাঁরা কখন সখনও আসতেন।

আড়াই বছর যাবত রহমানের কৃষ্ণপূজা, প্রসাদ নিবেদন, শাস্ত্রপাঠ, জপতপ ইত্যাদি পূর্ণোদ্যমে এগিয়ে চলল। তারপর ডাকযোগে আমেরিকা থেকে একদিন এলো দীক্ষা; হরিকেশ মহারাজের গুরুমন্ত্র দীক্ষান্তে নাম হলো তাঁর মাধবঘোষ দাস।

'দীক্ষার পর মনে হলো, আমার যেন জন্ম-জন্মান্তর ঘটে গেছে, মাধবঘোষ বললেন, 'বিশ্বনিখিলের আনন্দের সঙ্গে যেন আমার চিত্তের যোগ হয়ে গিয়েছে।'

'মার মনে মনে সাধ ছিল আমি একজন সৎখৃষ্টান হব,' দীক্ষা-পরবর্তী প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে মাধবদাস বললেন— 'কিন্তু হরেকৃষ্ণমন্ত্রে আমার দীক্ষা তিনি মেনে নিলেন। তবে বাবা বড়ই বেঁকে বসলেন।'

'একটা মজার কথা উল্লেখ করছি, আমি যখন ভক্তিযোগ অভ্যাস করছিলাম, মা-বাবা আগের তুলনায় হঠাৎ বড় ধর্মপ্রাণ হয়ে পড়েছিলেন, আমি কৃষ্ণের কথা তুলতেই মনে হলো, বাবা যেন বড্ড-বেশী-মুসলমান, মা বড্ড-বেশী-খৃষ্টান! মজার কথা, দুজনায় তখন ঝগড়া-কাজিয়া কিছুই হচ্ছিল না। সত্যি সে এক অদ্ভুৎ অবস্থা।'

'আমি তাঁদের বুঝিয়ে বললাম, কৃষ্ণচেতনা হচ্ছে খৃষ্টধর্ম এবং ইসলামের চরম পরিণাম, পবিত্রতম ফলশ্রুতি। অসৎ এবং দোষদুষ্ট এবং নীতিজ্ঞানহীন

কিছু লোক এই দুটি ধর্মের অনেক ক্ষতিসাধন করেছে।'

'মা-বাবা দুজনেই রেগে গেলেন, ভাবলেন, আমি খুব অসম্ভব কথা বলছি, যা তাঁদের পুঁচকে ছেলেটির মুখে একটুও মানায় না। অবশ্য পরে একদিন মা বললেন, তুই যা বলেছিস, হয়তো তা ঠিকই। খৃষ্টধর্মের দিন বোধহয় সত্যি ফুরিয়ে আসছে ; কৃষ্ণের যুগ শুরু হয়ে গিয়েছে।'

লোটাস গেস্ট হাউসের চারতলায় দাঁড়িয়ে মায়াপুরের গঙ্গায় আমরা তখন চোখ রেখেছিলাম। নদীস্নাত মধুর হাওয়া ফুরফুর করে ফুলবাগানে বইছিল, সেই রৌদ্র উদার বসন্ত সকালে ঝালর-কাটা আলো-ঝলসিত নারকেল পাতা লীলাময় তালে ঝির ঝির করছিল। আনন্দ-উদ্বেল মাধবঘোষ দাস মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে করতে বললেন, মায়াপুর সত্যি বৈকুণ্ঠধাম!

মাধবঘোষ এখন আপন পরিবার ছেড়ে এসে কয়েকজন কৃষ্ণভক্তের সঙ্গে বসবাস করছেন। স্থির চিত্রশিল্পী হিসেবে চাকরিস্থলে তাঁকে খুব বেশি সময় দিতে হয় না; কৃষ্ণনাম প্রচারের অনেক সুযোগ, অনেক সময় তাঁর মেলে—শ্রীকৃষ্ণের মনোমুগ্ধকর ছবি আঁকা, গীতা-ভাগবৎ বেদবেদান্ত পড়া ইত্যাদি নিয়ে তিনি প্রচুর সময় ব্যয় করেন। প্রভুপাদের বই বিক্রি করে বেড়ান।

'একে ঠিক বিক্রী বলা ঠিক হবে না,' মাধবঘোষ দাস বলেন, 'লোকে কৃষ্ণের নামে দান খয়রাত করে, আমি তাঁদের উপহার দিই প্রভুপাদের বই, ধূপকাঠি, পূজার আতর ইত্যাদি। বাসায় ফিরে এসে প্রসাদ রাঁধি, শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন করে সবাই মিলে খাই। আমার মতোই প্রসাদ খেতে আমার বাসাবাড়ির মোছলমান সঙ্গীরা খুব ভালবাসে।'

'তাশখন্দের মুসলমানদের মধ্যে আমাদের নিয়ে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে, কিছু অদ্ভুৎ শোনালেও মোটামুটি সবাই যে কৃষ্ণভাবনার পক্ষপাতী তা বলা যায়! কৃষ্ণকথা তাদের এখন ভালো লাগতে শুরু করেছে।'

বিস্ময়ের কথাই বটে!

১৪

কৃষ্ণকুমারকে দেখলে মনেই হয় না ভিনদেশী, কিংবা রাশিয়ান। তাঁর বয়স আঠাশ, দেহ গৌরবর্ণ, পরনে সাদা রঙের ধুতি পাঞ্জাবি—সব মিলিয়ে মনে হয় যেন সৌম্য শান্ত এক বাঙালী অধ্যাপক। মায়াপুরে সোভিয়েৎ কৃষ্ণভক্তদের অনেকের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম, কিন্তু কৃষ্ণকুমারকে ঠিক যেন ধরতে পারছিলাম না। অতি ব্যস্ত মানুষ বলে সব সময় তাঁকে ছুটোছুটি করতে হয়। কোন্ দেশের কোন্ মহারাজ কখন চন্দ্রোদয় মন্দিরে বসে গীতা ভাগবতের ক্লাশ নিচ্ছেন, কোথায় কখন রুশ ভক্তদের নিয়ে পরিক্রমায় বেরুতে হবে, আতর, আগরবাতি মালার থলে ইত্যাদি কি কি পূজা-উপকরণ দেশে নিয়ে যেতে হবে, তার সব কিছুতেই কৃষ্ণকুমারকে জড়িয়ে পড়তে হয়। দোভাষীর কাজও রয়েছে। বিশ্বামিত্র, আত্মানন্দ, বৈদ্যনাথ প্রভুরা দোভাষী হিসেবে আমাকে বিস্তর সাহায্য করেছেন, কৃষ্ণকুমার কিন্তু সময় করে উঠতে পারেন নি। তবু যে তাঁর সঙ্গে বসে তাঁর কিছু ব্যক্তিগত কথা শুনতে পেরেছি তাই বা কম কিসের!

ইউরোপ কিংবা আমেরিকার, পাশ্চাত্যের অধিকাংশ কৃষ্ণভক্তের নেপথ্য ইতিহাস নারী-সুরা-জুয়াখেলার পঙ্কিলতায় আবর্তিত, অনেকেই ভোগ-ঐশ্বর্যে বীতশ্রদ্ধ হয়ে কৃষ্ণভাবনা সঙ্ঘে ভিড়ে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের শরণ নিয়েছিলেন। ঈশ্বর চিন্তা কিংবা শাস্ত্রপাঠের কথা তেমন করে আগে কারও মাথায় আসে নি, বিশেষ করে ভগবদগীতা পাঠের কথা। সোভিয়েৎ কৃষ্ণ-ভক্তদের কারও মধ্যে পাশ্চাত্য-সুলভ বদ দোষগুলো যে না ছিল তা নয়, কিন্তু ঈশ্বর চিন্তা দৈহিক ঔদরিক ইত্যাদি প্রবৃত্তির মতো অন্য অনেকের জীবনেই জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। ভগবান যে সত্যি আছেন, সরকারি আশীর্বাদ-পুষ্ট ইজম-ইচ্ছিত প্রচারের বিপরীতে সেই কথাটি ভাবতে, ভগবানের ধ্যান

ধারণা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়তে তাঁদের ভালো লেগেছিল। ভুললে চলবে না, সোভিয়েৎ রাশিয়া নাস্তিকের দেশ, সাধারণভাবে ঘোর ঈশ্বর-অবিশ্বাসীদের দেশ—ভগবানকে না-মানাই সেখানে লাইফ-স্টাইল। ওয়ে-অব-লাইফ।

প্রায় কুড়ি বছর আগে এই রাশিয়ায় যখন ইস্কনের অনুপ্রবেশ ঘটল, কৃষ্ণভক্তির ক্রম প্রসার শুরু হলো, স্বভাবতই সরকারের টনক নড়ল, শুরু হলো কৃষ্ণভক্তদের ধরপাকড়, কারাদণ্ড, নির্বাসন। অন্তহীন ক্লেশের অনিকেত নির্বাসন। আমেরিকা বা অন্য কোনো দেশে তা কখনও ঘটে নি, ঈশ্বর-বিশ্বাসের জন্য ধরে কাউকে বেতমারা হয় নি। জেল দেওয়াও হয় নি।

তবে একটা কথা, রাশিয়ার কারাগারে কৃষ্ণভক্তরা খুব কষ্ট পেতেন। তার অর্থ এই নয়, যে পৃথিবীর অন্য সব দেশেই জেল-কয়েদীরা খুব দুধে ভাতে থাকে, খুব সুখবিলাসে দিন কাটায়। কারাগার কিন্তু কারাগারই, তা যে দেশেরই হোক—দুনিয়ার সব জেলের অমানুষিক দিকটি দুইয়ে দুইয়ে চারের মতো একই আঙ্কিক হিসেবে চলে।

আরও আছে—গান্ধী-নেহেরু-নেতাজীরা জেল খেটেছিলেন দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে, যে স্বাধীনতা দেবার সদিচ্ছা বিদেশী বৃটিশ সরকারের ছিল না, সংগ্রামটি ছিল বৃটিশ নীতির বিরোধী। জেলের দুর্ভোগ ছিল সেই নীতি বিরোধিতার ফল।

অন্য একটি দৃষ্টান্তও উল্লেখ করা যেতে পারে—আমাদের স্বাধীনতার পর দেখা গেছে, সরকার নির্মমভাবে কম্যুনিস্ট আন্দোলন দমন করছেন, তার সঙ্গে যোগাযোগ থাকলে কারও যে চাকরি হয় নি, এমন প্রমাণ অনেক আছে এই পশ্চিম বাংলাতেই। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে জড়িত মহাবিপ্লবী গণেশ ঘোষ মশাই পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় কম্যুনিস্ট আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। পুলিশের এক সাধারণ ইনস্পেক্টর তাঁকে একদিন ধরে যে হারে পেটাই করে তা দেখে আমি কেঁদে ফেলি। অনেকদিন পর আমার কাছে সেই কথা শুনে বিপ্লবী প্রবর বললেন, 'সে কি কথা, আরও অনেক কঠোর শাস্তি আমি পেয়েছি। বৃটিশের পুলিশ একটা একটা করে আমার দাড়ি উপড়ে নিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে কিল-ঘুষি-লাথি মেরেছে।'

কম্যুনিস্টদের সম্পর্কে এই বাংলায় এখন এসব কথা ভাবা যায় না। আসলে সবই হচ্ছে দলবিশেষ কিংবা ব্যক্তিবিশেষের নীতির ব্যাপার। তার পরিবর্তনে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। গর্বাচভের পূর্বতন রুশ সরকার কৃষ্ণচেতনা আন্দোলনকে ভালো চোখে দেখতেন না। সমস্ত রকম ঈশ্বর ভাবনার বিরোধিতা করাই ছিল তাদের নীতি। গর্বাচভ কিন্তু ভিন্নমত পোষণ করেন।

রাশিয়ান কৃষ্ণভক্তদের নেপথ্য কাহিনীতে আমার ঔৎসুক্য ছিল অনেক, তৎপরতাও কম ছিল না, কিন্তু এই দেশে বসে এবং রাশিয়াতে গিয়েও কোনো সুবিধা করতে পারি নি। সুযোগ এলো মহামতি গর্বাচভ অবৈধ ইস্কনকে বৈধ ধর্মসঙ্ঘ বলে ঘোষণা করে বসলে। রাশিয়ান কৃষ্ণভক্তরা তার পর একদিন ভারতবর্ষে এলেন, মায়াপুরের মাটি স্পর্শ করে ভাবলেন, জীবন ধন্য হয়ে গেছে। তাঁদের নির্যাতনক্লিষ্ট বহু সাধনানিষ্ঠ ভক্ত জীবনের কথা জানার সুযোগ আমি পেয়ে গেলাম।

রাশিয়ান কৃষ্ণভক্তদের প্রত্যেকের নেপথ্য কথায় আলাদা রকমের স্বাদ আছে, বৈশিষ্ট্য আছে। সবচেয়ে বড় কথা, সহস্র রকমের বাধা বিঘ্ন দুঃখ লাঞ্ছনার মধ্যেও কৃষ্ণভক্তি তাঁরা আঁকড়ে থেকেছেন। আমেরিকা কিংবা অন্য কোনো দেশের কোনো কৃষ্ণভক্তকে এমন দুর্ভাগ্য বহন করতে হয় নি, পদে পদে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয় নি। কৃষ্ণভাবনা সঙ্ঘে যোগ দিতে চাই, কৃষ্ণভজনা করতে চাই, ব্যস—জেল-যেল আবার কি কথা! কয়েকজন সোভিয়েৎ কৃষ্ণভক্তর সঙ্গে কথাবার্তা হবার পর কিন্তু আমার মনে হয়েছিল, কৃষ্ণকুমারের কাছে না-জানি-কি শুনতে পাবো। তাঁর জন্য আমার প্রতীক্ষার অন্ত ছিল না।

মস্কোর মানুষ কৃষ্ণকুমারের পরিবারে ধর্মের একটা স্থান ছিল, তাঁর বাবা ছিলেন খৃষ্টান, দিদিমাও তাই, তবে কিছু উগ্র মাত্রায়। জন্মের পর উপযুক্ত সময়ে পবিত্র জর্ডনের জল দিয়ে শুদ্ধ করে তাঁকে খৃষ্টধর্মে অভিষিক্ত করা হয়েছিল, নামকরণ হয়েছিল আলেক্সি মিখেয়েভ! শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণের শরণ নিয়ে আলেক্সি হলেন কৃষ্ণকুমার। তার আগেই বহুখ্যাত মস্কো ইনস্টিটিউট

অব অটোমেটিক টেকনিক এণ্ড ইলেকট্রনিক্‌স্‌ থেকে আলেক্সি রেডিও ইলেকট্রনিক্‌স্‌ এঞ্জিনীয়ারের ট্রেনিং নিয়েছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে গিয়ে আর ডিগ্রী নেওয়া হয় নি।

ইস্কুল জীবনে আলেক্সির আসল আকর্ষণ ছিল উচ্চাঙ্গ গীটার সঙ্গীতে ; রক-ব্যাণ্ডে গীটার বাদনে তাঁর বেশ নামও হয়। ব্যাণ্ডমাস্টার ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র আর হঠযোগ সম্পর্কিত কিছু বই তাঁকে পড়তে দেন। তারপর কৃষ্ণভক্ত সনাতন কুমার দেন প্রভুপাদের ভগবদগীতা এ্যাজ ইট ইজ—রক-ব্যাণ্ডের মহড়ায় এসেই বইটি তিনি দিয়ে যান। ব্যাণ্ডমাস্টার আলেক্সিকে নিরামিষ আহারেও উৎসাহ দিয়েছিলেন। তিনিই একদিন বলেছিলেন—'ভক্তিলাভ করতে হলে শরীরটাকে পুরোপুরি পরিশুদ্ধ করে নিতে হয়। এই সময়টাতেই মার্ক্‌সীয় দর্শনে আলেক্সির বিরক্তি জন্মে. কারণ মার্ক্‌স্‌-বাদীরা বলতেন, মৃত্যুর পরে জীবন নেই, আত্মা বলেও কিছু নেই। অথচ তাই নিয়ে তখন ছিল তাঁর ব্যাপক অনুসন্ধিৎসা ; তাঁর মন কেবলই বলত, মার্কসীয় মতামত ঠিক নয়।' পুনর্জীবনের প্রশ্ন তাঁকে তখন উদভ্রান্ত করে ফেলেছে। যদিও সঙ্গীতের কথা তিনি ভোলেন নি।

'সঙ্গীত ছিল আমার স্বপ্ন,' কৃষ্ণকুমার বললেন, তবু হঠাৎ কিন্তু মনে হলো, আমার যত উৎসাহ-উদ্দীপনাই থাক, বেটোভেন বা মোসার্টের মতো হয়তো কোনোদিনই আমি হতে পারব না। মনে মনে খুব অখুশি হয়ে পড়লাম, জীবনের সব উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে গেছে বলে আমার মনে হলো। আমি আবার আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতাম, বন্ধুবান্ধবরা কেউ করত না।'

'গড ফাদার (গড, সন-অব-গড, স্পিরিট-অব-গড ইত্যাদি) জাতীয় খৃষ্টানী ব্যাখ্যা আমার ভালো লাগত না। আমি বিশ্বাস করতাম, শ্রীকৃষ্ণই ভগবান, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ; (কৃষ্ণকুমার অবিকল এই কথাগুলো স্পষ্ট করে উচ্চারণ করলেন) তার পরে হচ্ছে সব গুরু-শিষ্য পরম্পরা—প্রভুপাদের এই ব্যাখ্যাটি খুব ভালো লাগল, মনে ধরল। সদাসর্বদা আমি স্মরণ রাখতে চেষ্টা করলাম কৃষ্ণকে, যিনি চির যৌবনময়, জ্ঞানময়, আনন্দময়।'

'কিছুদিন আগের কথা। ভোর হয়ে গেছে। বিছানায় শুয়ে আধো-জাগ্রত

অবস্থায় আমি শ্রীকৃষ্ণের মূর্তরূপ কল্পনা করছিলাম। হঠাৎ-স্বপ্নে আমি শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পেলাম, কেমন যেন সবুজ-সবুজ তাঁর গায়ের রং।'

'তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমি তখন কোনো প্রমাণই কিন্তু খুঁজে ফিরছিলাম না। তবু যেন স্বগতো বলে উঠলাম, 'সত্যি যদি তুমি দেখা দিয়ে থাকো, তাহলে আমাব এই খাটখানা এবার অদৃশ্য হোক তো দেখি।'

'আশ্চর্য, মনে হলো যেন আমার খাট আর সত্যি ওখানে নেই। আমি জেগে উঠলাম। জপ শুরু করলাম। ষোলবার জপ শেষ করার পর মনে হলো আমার মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে একটা যেন বৈদ্যুতিক প্রবাহ বইছে। সারাটা দেহই যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গেছে। হৃৎপিণ্ডের মধ্যে আমি একটা বেদনা বোধ করলাম। যেন এই মাত্র ভেতরে একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেছে। শিরায় শিরায় একটা উল্লাস বয়ে গেল। জীবনে এমন অভিজ্ঞতা আমার আর কখনও হয় নি। আমি হাসছিলাম। আমি কাঁদছিলাম। আমি কৃষ্ণ-নাম করছিলাম। হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল শ্রীকৃষ্ণের অমৃতবাণী—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদযাজী মাং নমস্কুরু।'

'সর্বদা আমার কথা চিন্তা কর, আমার ভক্ত হও, আমার উপাসনা কর, আমাকে নমস্কার কর—'

'এই বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার পরই কৃষ্ণভক্ত সনাতন কুমারের বাড়িতে সঙ্কীর্তনে যোগ দেবার আহ্বান এলো। ওখানেই জীবনে প্রথম কৃষ্ণপ্রসাদ আস্বাদন করার সুযোগ পেলাম। সে এ স্বর্গীয় বস্তু, অচিন্ত্য অভাবনীয় তার স্বাদ, এমনটি এর আগে কখনও খাই নি।'

'ওখানে আরও একটি ব্যাপার ঘটল, খোল বাদনের কায়দাটা আমার বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার সুযোগ হলো—জীবনে এই প্রথম। খোলটি আবার সনাতন কুমার নিজেই তৈরী করেছিলেন

'রাশিয়ায় খোল করতাল প্রথম নিয়ে আসেন হরিকেশ স্বামী মহারাজ। কীর্তিরাজ প্রভুকে সঙ্গে নিয়ে রাশিয়ায় এসে তিনি অনেক খোল, করতাল, শ্রীকৃষ্ণের ছবি, জপের মালা, ধূপ-শলা ইত্যাদি অনেক কিছুই ভক্তদের দিয়ে যান।'

কৃষ্ণকুমারের ভক্ত জীবনে এবার বিপদ ঘনিয়ে আসার পালা। তখনও তিনি গীটার শিক্ষকের কাজ করছেন। বাড়ির নিকটেই একটা লাইব্রেরীতে তাঁকে নিয়মিত যেতে হচ্ছে প্রভুপাদের বই পড়তে এবং তার জেরক্স কপি তৈরী করে নিতে। ঈশোপনিষদ, গীতা, ভাগবতম ইত্যাদি গ্রন্থগুলি তিনি এখানেই পড়ে নিয়েছিলেন।

সনাতন প্রভুদের ওপর তখন পুলিশের তীব্র নজর পড়ে গিয়েছে, নিজের বিপদের কথা তাঁর কিন্তু তখনও মনে আসে নি। নাজিয়া নামে একটি মেয়েকে বিয়ে না করে তাঁর উপায় ছিল না, কারণ নাজিয়ার ফ্ল্যাটটি ছিল খুব বড়। বই ছাপা, কীর্তন এবং পূজাপাট করার পক্ষে আদর্শ স্থান। কৃষ্ণকুমারদের তখন ছিল একখানা ঘর। তারই মধ্যে বাপ-মাকে নিয়ে অশান্তির সংসার। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বাবা-মায়ের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে।

নাজিয়ার বাড়িতে বসেই কৃষ্ণকুমার প্রভুপাদের ভগবদগীতা এ্যাজ ইট ইজ বইটি রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ করতেন, নাজিয়া তা টাইপ করে দিতেন। কিন্তু তখন পুলিশের শনি দৃষ্টি তাঁদের ওপর পড়ে গিয়েছে। এবং তা এড়াবার জন্য সেপ্টেম্বরে তাঁরা কুজিনোভোতে চলে গেলেন।

ঘরে পড়ে রইল বইয়ের স্তূপ, অজস্র ফিল্ম্, নিত্য পূজার বেদীটি। স্বামী স্ত্রী মিলে রোজ এই বেদীতে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি রেখে পূজো করতেন। কিন্তু দিন দশেক পর ফিরে এসে দেখলেন, গীতা-ভাগবতের কিছু কপি চুরি হয়ে গেছে। নাজিয়ার মা-বাবার কাছে খোঁজ নিতে গেলে তারা রেগে গিয়ে বললেন, 'তোমাদের এই জপ-টপ পূজাপাট করা মোটেই ভালো কথা নয়, সবই তো সরকারি নীতির বিরোধী। তোমরা মূর্খ, নইলে ভগবান টগবানে বিশ্বাস করতে যাবে কেন।'

বইপত্রগুলো যে তারাই লোপাট করেছেন বুঝতে অসুবিধা হলো না।

কিছুদিন পর কে-জি-বি এসে থানাতল্লাসী করে গীতার সবগুলো কপি তুলে নিয়ে গেল। তারপর কৃষ্ণকুমারকে যেতে হলো প্রসিকিউটরের আপিসে! তাঁর নিজের অনুবাদ করা বইগুলি সেখানে স্তূপীকৃত করা ছিল। শুরু

হলো জিজ্ঞাসাবাদ—কবে, কোথায়, কার কাছে তাঁরা কৃষ্ণচেতনার কথা জানতে পেরেছিলেন ইত্যাদি প্রশ্নের জবাবে কৃষ্ণকুমার কিছু আষাঢ়ে গল্প ফেঁদে শুনিয়ে দিলেন। কোনোরকমে তাদের এড়িয়ে গেলেন।

বাড়িতে ফের শুরু হলো অনুবাদের কাজ, বই ছাপা, টাইপ করা, জেরক্স করার এলাহি কারবার। বছর কয়েক কেটে গেল, মাঝে মধ্যে থানাতল্লাসীও বাদ রইল না। ততদিনে কুজিনোভোতে সনাতনদের বিচারের পর কারাদণ্ড হয়ে গেছে। কৃষ্ণকুমার শ্বশুর বাড়ি ছেড়ে বৌকে নিয়ে নিজের মায়ের ফ্ল্যাটে ফিরে এসেছেন। আসলে সুযোগটি এসেছিল ফ্ল্যাটের অপর ভাড়াটে হঠাৎ চলে যেতেই। সুযোগটি যে শ্রীকৃষ্ণই সৃষ্টি করে দিয়েছেন কৃষ্ণকুমার সেই কথা বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন। এমন কি নিজের মাও তখন বদলে গেছেন, বাধা সৃষ্টি না করে তাঁদের সাহায্য করতে শুরু করেছেন।

কিন্তু কৃষ্ণকুমারকে পুলিশের কাছে আবার নাজেহাল হতে হলো; বাধ্য হয়ে তাঁদের আশ্রয় নিতে হলো নাজিয়ার এক বন্ধুর বাড়িতে। ততদিনে তাঁদের দুজন বাচ্চা হয়ে গিয়েছে। সরকার অবশ্য তাঁদের আর তেমন খাটাতে সাহস করছে না, জেলের মধ্যে প্রেমাবতীর মেয়ের মৃত্যুর খবরটা তখন খুব প্রচার হয়ে গেছে। পাশ্চাত্যে তা নিয়ে খুব হৈ চৈ চলছে।

তখন কে-জি-বি এসে একদিন প্রস্তাব করে, কৃষ্ণকুমার যেন তাদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করেন, কৃষ্ণভক্তদের ধরিয়ে দেন, নইলে যে তাঁকে কারারুদ্ধ হতে হবে সে কথাও তারা জানিয়ে দেয়। কিন্তু ততদিনে গর্বাচভও এসে গিয়েছেন; দুঃখ দিনের অবসান আসন্ন।

সরকারি চাকরি চলে গিয়েছে বলে কৃষ্ণকুমারের দুঃখ নেই। 'আমরা বই ছেপে পয়সা পাই, কৃষ্ণ বিষয়ক কনসার্ট করি, প্রসাদ তৈরী করে বিক্রী করি।'

'প্রসাদ তৈরীর সব উপকরণই মেলে আমাদের ফ্ল্যাটের কাছে, বোম্বে রেস্টুরেণ্টে। শুধু আমরা কেন, সুদূর আর্মেনিয়া থেকে কৃষ্ণভক্তরা মস্কোতে এসে চাল, ডাল, মশল্লাপাতি কিনে নিয়ে যান। এটি ছাড়া মস্কোতে আরও ভারতীয় রেস্তোরাঁ রয়েছে—দিল্লী রেস্তোরাঁ, জলতরঙ্গ রেস্তোরাঁ ইত্যাদি। ভারতীয় মালমশল্লা ওরা সবাই বেচে।'

'সোভিয়েৎ লোক কৃষ্ণের করুণার জন্য হা-পিত্যেশে তাকিয়ে আছে। গোটা সোভিয়েৎ দেশ কৃষ্ণকে গ্রহণ করবে, অদূর ভবিষ্যতেই কৃষ্ণচিন্তায় পাগল হবে।'

'বিপ্লব করে রাশিয়া একবার অভাব দৈন্য ঘুচিয়েছে, সুপার পাওয়ার হয়েছে, কৃষ্ণকুমার শেষ মন্তব্য করলেন, 'এইবার, আসল বিপ্লব শুরু হবে, কারণ রাশিয়া জাত-বিপ্লবী। এবারের বিপ্লব ধর্মের বিপ্লব। কৃষ্ণ সাধনার বিপ্লব।'

১৫

মায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল-আরতি তখন শেষ হয়ে গেছে, হলঘরে গীতার ক্লাশ শুরু হয়েছে। বর্ষীয়ান এক স্বামী মহারাজ ভগবদ্‌-গীতার সাংখ্যযোগ ব্যাখ্যা করছেন। ভক্তরা মন দিয়ে শুনছেন, চিলি, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, আমেরিকা, ক্যানাডা, ইংলণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, থাইল্যাণ্ড ইত্যাদি নানান দেশের ভক্ত; সম্প্রতি মায়াপুরে এসেছেন গৌর পূর্ণিমা উপলক্ষে। সদ্য কারামুক্ত উনষাট জন সোভিয়েৎ কৃষ্ণভক্তও উপস্থিত রয়েছেন। তাঁদের কানে হেড ফোন, কাছের বাক্সে স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন সিস্টেমের কারিগরী যন্ত্রপাতি। ইংরেজী জানা একজন রুশ ভক্ত মহারাজের গীতাভাষ্য সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ানে অনুবাদ করে চলেছেন। ফোনের মাধ্যমে সবার কানে কানে তা পৌঁছে যাচ্ছে। সোভিয়েৎ ভক্তদের প্রায় সবার হাতেই নোট বই রয়েছে, ব্যাখ্যা শুনে তাঁরা নোট নিচ্ছেন। মামুঠাকুরও এই ভক্তদের দলে হাজির রয়েছেন।

শ্রোতাদের মধ্যে অনেক জ্ঞানী, বিজ্ঞানী, ডক্টরেটওয়ালাও আছেন। গীতার জ্ঞান তাঁদের কারও কিন্তু কম নয়। শুদ্ধবস্ত্রে শুদ্ধাচারে শুদ্ধ মনে জোড়াসনে বসে তাঁরাও ভারতীয় মহারাজের গীতার ব্যাখ্যা খুব মনোযোগ সহকারে শুনছেন; এটাই সবার অভ্যস্ত রীতি। কার ব্যাখ্যায় কোন্ নতুন তত্ত্ব ধরা পড়বে কে জানে!

আটটা বেজে গিয়েছে। এবার রাধাগোবিন্দর দর্শন-আরতি শুরু হবে। কৃষ্ণ সঙ্কীর্তন আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ বেজে উঠল রেকর্ড করা গান, গোবিন্দম্ আদিপুরুষম্ তমহম ভজামি; ঠাকুরের সামনে থেকে সঙ্গে সঙ্গে পর্দা গেল হটে। মাটিতে মাথা লুটিয়ে সবাই প্রণত হলেন, কলে-দম-দেওয়া পুতুলের মতো। ভক্তদের মনের আবেগ তখন লক্ষ্য করার মতো,

তার সচ্ছন্দ স্বাভাবিকতা ভাববার মতো। কেউ কিন্তু বলে দেয় নি, : যার প্রণাম কর। পরম রূপবান পরম ঐশ্বর্যবান পরমেশ্বরকে চোখের সামনে হঠাৎ দেখতে পেয়ে প্রণত না হয়ে কারও উপায় ছিল না। সবাই আমরা মনে প্রাণে যেন বুঝে নিয়েছিলাম, মন্দির জুড়ে, সমগ্র বিশ্বচরাচর জুড়ে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করছেন, জ্যোতিবিভাসিত আনন্দলোকে তাঁর দিব্য অস্তিত্ব একটু করে তুলছে—আমরা তারই মধ্যে মিলিয়ে গিয়েছি। আমাদের প্রত্যেকের পৃথক সত্তা হারিয়ে গিয়েছে।

মামুঠাকুর কিন্তু আরও একটি ব্যাখ্যা দিলেন, গদগদচিত্তে তিনি বললেন, রাধাগোবিন্দজীর সামনে থেকে পর্দা সরে যেতেই আমার মনে হলো, পৃথিবীর আসল কর্তা কে, উপস্থিত বুধমণ্ডলী এবং প্রত্যেকে আমরা কত ক্ষুদ্র, কেমন কীটানুকীট, আর শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত অনাদি পুরুষোত্তম। সত্যটি আর কোথাও, আর কখনও মনের মধ্যে এমন করে ধরা দেয়নি।'

মামুঠাকুরের সঙ্গে অন্য অনেক সোভিয়েৎ কৃষ্ণভক্তের পার্থক্য এই সাম্যবাদের লাল দুর্গে বসবাস করে তাঁরা নীরবে নিভৃতে কৃষ্ণভাবনার সংস্পর্শে এসেছিলেন একটু করে। ধাপে ধাপে হঠযোগে গীতা পাঠ, কৃষ্ণকীর্তন, জপ-তপ, প্রসাদভক্ষণ ইত্যাদি আচার-নিয়ম পালন করতে করতে শেষপর্যন্ত কৃষ্ণভাবনা সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন ; তারপর একদিন দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাঁদের অনেকেই কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন না, কিংবা কম্যুনিস্ট যুব-সঙ্ঘ কমসোমলের সঙ্গেও আযৌবন তাঁরা জড়িত ছিলেন।

পূর্বাশ্রমে মামুঠাকুরের নাম ছিল আলেকজাণ্ডার মিখাইল শীলভ, একডাকে চেনার মতো নেতৃস্থানীয় কম্যুনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য। তাছাড়া স্বনামধন্য শিল্পী হিসাবেও তাঁর পরিচয় কিছু কম ছিল না। কর্মক্ষেত্রে শীলভ ছিলেন ইউনিয়ন অব পলিগ্রাফিক আর্টিস্ট অব লেনিনগ্রাডের মুখ্য পরিচালক।

'আপনার জানা থাকতে পারে,' মামুঠাকুর দাস বললেন, 'কোনো ধর্মাচার বা আচরণের সঙ্গে সহযোগিতা না করাই হচ্ছে কম্যুনিস্টদের নীতি।'

'একজন সাচ্চা কম্যুনিস্ট হিসেবে এই নীতি মেনে চলাই ছিল আমার কাজ। আমি নিষ্ঠার সঙ্গে লক্ষ্য রাখতাম, কেউ নীতিভ্রষ্ট হয়ে পড়ছে কিনা। এবং

এইসূত্রেই আমার ওপর একটি বিশেষ দায়িত্ব এসেছিল—সোভিয়েৎ দেশে ইস্কনের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা, সাম্যবাদের বিরুদ্ধ-পথচারী কৃষ্ণভক্তদের পথে আনা।'

'তা হলে শেষপর্যন্ত চোর ধরতে গিয়ে চোর সেজে বসলেন তো,' আমি হেসে বললাম, 'কিন্তু নিজে ধরা দেবার আগে ওঁদের অন্তত একজনকেও কি পথে আনতে পেরেছিলেন ?'

'অত সোজা নয়,' মামুঠাকুরও মৃদু হেসে বললেন—'তবে প্রথম প্রথম আমি তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম, কেষ্টঠাকুরের পুজো করাটা ঠিক নয়, কারণ তিনি সাধারণ মানুষ মাত্র।'

'আমার নরম-সরম অনাক্রমী মেজাজ লক্ষ্য করে ওঁদের সাহস কিছু বেড়ে থাকতে পারে। কৃষ্ণভক্তরা তর্ক তোলেন, উপদেশ দেবার মতো করে আমাকে বলেন, বৈদিক গ্রন্থগুলো আপনি একটু পড়ুন। প্রভুপাদের অমূল্য বই-গুলোর নাম উল্লেখ করে তাঁর 'ভগবদগীতা এ্যাজ ইট ইজ' বইখানাও আমাকে তাঁরা পড়তে দিলেন।'

'ওটি পড়ে আমি চমৎকৃত হয়ে গেলাম। এমন বই আগে কখনও পড়ি নি, এমন করে আগে কখনও ভাবি নি : মনে হলো, শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম না হলে, পরমেশ্বর ভগবান না হলে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে অর্জুনকে এমন বাণী শোনাতে পারতেন না।'

'ক্রমে প্রভুপাদের অনেক বই আমি পড়ে নিলাম—কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণভাবনা সম্বন্ধে আমার ভুল ভাঙতে শুরু করল। মৃত্যুর সঙ্গে সব শেষ হয়ে যায় বলে কম্যুনিস্টরা দাবি করে তা যেন আর যথার্থ বোধ হলো না ; আমার মনে হলো, আর সবাই যা বলে, ওরা বলে তার উল্টোটা।'

আমি একটু নড়ে চড়ে বসলাম। 'রাজনীতির ক্ষেত্রে তার হয়তো অর্থ আছে,' মৃদু প্রতিবাদ করে আমি বললাম, 'হয়তো প্রয়োজনও আছে। বিপ্লবের আগে যে দুঃখদারিদ্র্য রাশিয়ায় ছিল, ধর্মাশ্রয়ী সংস্কারকে আমল দিলে, শক্ত হাতে শাসনদণ্ড না ধরলে রাশিয়া কি আজ সুপার পাওয়ার হতো, নাকি সবাই খেতে পরতে পারত ?'

'খাওয়া পরাটাই কি সব,' মামুঠাকুর বেশ জোরালো কণ্ঠে বললেন, 'কুকুর বেড়ালও খায়, বেঁচে থাকে। ভাবুন একবার, ১৯১৭ সালের আগের রাশিয়ায় ধর্মবিশ্বাসী লোক ছিল নিরানব্বই শতাংশ, এখন শতকরা পনেরো জনও নয়। বাকি লোক ধর্ম নিয়ে একটুও মাথা ঘামায় না। ভালো বুঝেই তো বর্তমান সরকার জীবনে ধর্মের দিকটিকে উৎসাহিত করছেন। আধ্যাত্মিকতার বুনিয়াদে জীবন দাঁড়িয়ে না থাকলে গোটা মানব সমাজই যে একদিন ভেঙে পড়বে এখন তাই তাঁরা বুঝতে পেরেছেন।'

আমার তর্ক করা বৃথা, আর সেজন্যও আমি সোভিয়েৎ কৃষ্ণভক্তদের সঙ্গে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে দেখা করতে আসি নি। আমাকে থামতে হয়।

মামুঠাকুর কৃষ্ণভাবনা সঙ্ঘে যোগ দিয়ে যখন কৃষ্ণ সেবা শুরু করলেন, সোভিয়েৎ সরকার স্বভাবতই ক্ষেপে গেলেন, তাঁকে চরমপত্র দিয়ে বললেন, 'হয় কৃষ্ণকে ছেড়ে দাও, নয়তো কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে বেরিয়ে যাও।'

'আমি কৃষ্ণের শরণ নেবার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলাম,' মামুঠাকুর বললেন, 'আর তারা আমাকে তড়িঘড়ি পার্টি থেকে বহিষ্কার করল।'

'এখানেই শেষ নয়, তারা আমার ভগবদগীতা, খোল, করতাল, কৃষ্ণের ছবি এবং আধ্যাত্মিক গানের ক্যাসেটগুলো লোপাট করে নিল। তারপর অনেক ধাপ এগিয়ে গিয়ে ইস্কনের বিরুদ্ধে একটা প্রবল জনমত গঠন করবার জন্য উঠে পড়ে লাগল। কিন্তু সুবিধা হলো না—যথা কৃষ্ণ তথা জয়। আর্মেনিয়াতেও তাদের এমন সব চেষ্টা আগেই ব্যর্থ হয়েছিল।'

পূর্বাশ্রমে মামুঠাকুর লেলিনগ্রাডের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেড অর্গানিজেশনের বিশেষজ্ঞ ছিলেন। পার্টি থেকে বিতাড়িত হলেও এখনও পার্টি অফিসের সবাই তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দ্যাখে। বিশেষজ্ঞ হিসেবে তাঁর পদটি ছিল খুবই মর্যাদাকর। ব্যক্তিগত ভাবে সবাই তাঁকে চিনতেন, তাঁর কাজের তারিফ করতেন, এখনও করেন। এমন একজন ধীমান লোকও মাথা মুড়িয়ে শিখা রাখেন, নিরামিষ খেয়ে কৃষ্ণনাম করেন, ব্যাপারটি তাদের বেশ ভাবিয়ে তোলে ; তাদের যেন মনে হয়, এর একটা অর্থ আছে, কৃষ্ণ চেতনায় তারা নিজেরাই এবার আকর্ষণ বোধ করেন।'

লেনিনগ্রাডই ছিল মামুঠাকুরের কৃষ্ণ সেবার আসল কেন্দ্র—একটি কো-অপারেটিভ কাফে খুলে কৃষ্ণভক্তরা প্রসাদ তৈরী করে ওখানে বিতরণ শুরু করেন। বহু লোকের সমাগম হতে থাকে। প্রসাদ খেতে পেয়ে সবাই খুব খুশি। মস্কোর 'জলতরঙ্গ রেস্তোরাঁ'র ঘৃতপক্ক মশল্লা সুগন্ধী মোগলাইখানাও সাদাসিধে সাত্ত্বিক প্রসাদের কাছে দাঁড়াতে পারে না। দুইয়ের স্বাদ যারা পেয়েছে সেই লেনিনগ্রাড-বাসীরাই কথাটা বলেন।

এই কাফেতে বসেই মামুঠাকুর আধ্যাত্মিক পুস্তক-পুস্তিকা বিতরণ শুরু করেন, আর তখনই বেশি করে সরকারের বিষ নজরে পড়েন। তবে কাফের পৃষ্ঠপোষকদের অনেকেই ছিলেন উচ্চকোটির লোক—ভারি মাথাওয়ালা, বিবেকবান, হৃদয়বান। এবং স্বাধীন চিন্তাবিলাসী। তাঁদের সহানুভূতি ছিল সমগ্র কৃষ্ণভাবনা সঙ্ঘের প্রতি অকপট। সরকারের রাগের কারণও তাই।

এই হরেকৃষ্ণ কাফেতেই অধ্যাপক সিসোস্কির নিয়মিত পদধূলি পড়ে; মামুঠাকুরের সঙ্গে তাঁর আবার কুড়ি বছরের পরিচয়। অধ্যাপক সিসোস্কি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন, সোভিয়েৎ দেশের নৈতিক মান পুনরুজ্জীবনের পক্ষে কৃষ্ণভাবনা সঙ্ঘ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। কম্যুনিস্ট পার্টির সেন্ট্রাল কমিটি মিটিংয়ে এই অধ্যাপকের ডাক পড়লে তিনি ইস্কনকে বৈধ-করণের স্বপক্ষে জোরালো যুক্তি প্রদর্শন করেন, যা কেউই খণ্ডন করতে পারে না। আসলে আধ্যাত্মিক আলোয় উদ্ভাসিত দূরদৃষ্টি-শানিত সেই যুক্তি জালের সামনে কেউই দাঁড়াতে পারে না। সোভিয়েৎ দেশে শেষ পর্যন্ত ইস্কন বৈধ ধর্মসঙ্ঘ বলে ঘোষিত হবার মূলে অধ্যাপক সিসোস্কির অবদানের সীমা নেই।

'পেরেস্ত্রৈকার বিপক্ষেও এখন রাশিয়ায় [illegible]ক লোক রয়েছে, মামুঠাকুর বললেন, 'তা থাক গে, আসলে গর্বাচভ না এলে, পেরেস্ত্রৈকা—গ্লাস-নস্ত-নীতি ঘোষিত না হলে কৃষ্ণভাবনা সঙ্ঘ কোনোদিনই বৈধ বলে ঘোষিত হতো না, কৃষ্ণভক্তরাও জেল থেকে কোনোদিন মুক্তি পেত না। অধ্যাপক সিসোস্কির কাছে তাঁরা খুবই তাই কৃতজ্ঞ, অশেষ কৃতজ্ঞ মহামতি গর্বাচভের কাছে। টি-ভিতে আগে কৃষ্ণভক্তদের শুধু বিরুদ্ধেই অনুষ্ঠান করা হতো,

এখন চলছে অনেক অনুকূল অনুষ্ঠান। সবই কৃষ্ণের ইচ্ছা।'

'গর্বাচভের কাছে আমি চিঠি লিখেছি, ভগবদগীতার মাহাত্ম্য এবং গুরুত্ব বর্ণনা করে তাঁকে অনুরোধ করেছি, জনজীবনের পক্ষে ব্যবহারিক ভাবে অতিশয় মূল্যবান এই সুমহান দর্শন-গ্রন্থটির ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করতে। আমি বিশ্বাস করি, পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র রাশিয়াতে ভগবদ গীতার প্রচার ঘটতে সব চেয়ে বেশি কৃষ্ণভাবনা সঙ্ঘ প্রসার লাভ করবে আশাতীত রকমে, এমনকি সারা ভারতে এখনকার তুলনায় তা আরও গুরুত্ব লাভ করবে।'

কৃষ্ণকুমারের মতো মায়াপুরে মামুঠাকুরকেও খুব ব্যস্ত হয়ে পড়তে দেখা যাচ্ছে। তবে সব সময় মনটা তাঁর অন্তর্মুখী। অবিরাম যেন তাঁর মধ্যে ভাগবত উপলব্ধি প্রকটিত হচ্ছে।

আমার কক্ষে মামুঠাকুরের সঙ্গে তখন উপস্থিত ছিলেন আরও তুই রুশ কৃষ্ণভক্ত। কিয়েভের অচ্যুৎ দাস, জর্জিয়ার অম্বরীশ দাস, এবং সুদামা দাস। এঁরা কেউই পার্টি-সদস্য ছিলেন না, মামুঠাকুরের মতো অমন উচ্চাসনেও কেউ অধিষ্ঠিত ছিলেন না। একই সোভিয়েৎ দেশের লোক হলেও প্রত্যেক কৃষ্ণভক্তের ব্যক্তিগত জীবন, কৃষ্ণে মতি, লাঞ্ছনা ভোগের ইতিহাস ইত্যাদি সবই স্বতন্ত্র। সুদামা দাসের কথাই বলি, তার মতো অমন অচিন্ত্য রকমে, অমন অক্লেশে কেউ কৃষ্ণভক্ত হন নি। গ্রোমোভ আলেকজাণ্ডার নাম নিয়ে লেনিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কর্মরত ছিলেন। জীববিদ্যাবিদ হিসেবে। স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে খুশি হয়ে কিছু কৃষ্ণ সন্ন্যাসী বাড়িতে এসে কৃষ্ণনাম্ করলে গ্রোমোভ খুবই আকৃষ্ট হন, অবিলম্বে দীক্ষা নিলে নাম হয় তাঁর সুদামা দাস। বিচিত্র সব বিরুদ্ধ পরিস্থিতি পেরিয়ে কৃষ্ণভক্ত হওয়ার মধ্যে সুদামা দাস এক ব্যতিক্রম উদাহরণ।

চারজন কৃষ্ণভক্ত পরস্পরের নেপথ্য কথা বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনছেন—এঁর কথা তাঁর কাছে, তাঁর কথা ওর কাছে শুনতে বেশ ভালোই লাগছে। কার কোন্ কথা গল্পচ্ছলেই বা আর কতটুকু শুনতে পান। কৃষ্ণভক্তদের পারিবারিক পরিচয়, তাঁদের শিক্ষা, পেশা এবং শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণভক্ত হওয়ার

ইতিহাস আমি সবার কাছে জানতে চাইছি, সেই উদ্দেশ্যেই মায়াপুরে রয়েছি। তাই ওঁরা বলছেন, অনেকটা যেন অনিচ্ছায়। আসলে কৃষ্ণ সম্পর্ক শূন্য কোনো কথাই ওঁরা বলতে চান না, পূর্বাশ্রমের নামটি পর্যন্ত নয়।
মামুঠাকুরের বৈষ্ণব ভাবনা খুবই সূক্ষ্ম, বৈষ্ণব গ্রন্থাদিও তিনি অনেক পড়েছেন। মহাপ্রভুর সমকাল, চৈতন্যভক্ত, শ্রীমায়াপুর ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানের সীমা নেই। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রসঙ্গে তাঁর কথাগুলো এবার আমরা অবাক হয়ে শুনছিলাম।
মায়াপুরের মাটিতে এবার মাথা ঠেকিয়ে বার বার প্রণতি নিবেদন করতে লাগলেন মামুঠাকুরসহ চারজন কৃষ্ণভক্তই, তারপর বললেন, আমরা ধন্য, এই মায়াপুর আমরা দেখে গেলাম।

১৬

জেলের শত অত্যাচার উৎপীড়নের মধ্যেও ভরদ্বাজ দাসের মুখে ছিল সেই কৃষ্ণনাম, এবং তার সমর্থনে সেই এক কথা—'কি করি, কৃষ্ণনাম না করে থাকতে পারি না।'

কেন পারো না? জেলবাবুরা ধমক দিতেন।

'অনেক দিনের অভ্যেস যে, ভরদ্বাজ দাস জবাব দিলেন। 'আর শাস্ত্র পড়েই অভ্যেসটা হয়ে গিয়েছে। শাস্ত্রই বলেছেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামেব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরণ্যথা॥

শুধু হরিনাম করতে হবে; কলিতে এছাড়া অন্য কোনো গতি নেই, নেই, নেই।'

কয়েদখানার লোক আগে কখনও এই শাস্ত্রবাক্য শোনে নি, এবার শুনেও কোনো অর্থ বোঝে নি। ভরদ্বাজ দাস তবু ইচ্ছা করে এই শাস্ত্রবচন আবৃত্তি করেছেন। রোমান হরফে লিখিত সংস্কৃত শ্লোকটি তাঁর একেবারে মুখস্থ; আবৃত্তি করতে ভালো লাগে, অপরকে শুনিয়ে হরিনামে উদ্বোধিত করতে আরও ভালো লাগে।

ইয়োরোশুক ভ্যালেন্টিন ইউক্রেনের লোক, কিন্তু চলে গিয়েছিলেন সোভিয়েৎ ল্যাটভিয়ার রাজধানী রিগায়। রিগা শীতের শহর, শীতের কুহেলীতে দীর্ঘদিন আচ্ছন্ন থাকে। অন্য কৃষ্ণসন্ন্যাসীদের মতো ভ্যালেন্টিনের কাছে এসব কোনো ব্যাপারই নয়; কৃষ্ণচেতনা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি রিগায় গিয়ে উঠেছিলেন, কৃষ্ণভাবনা সঙ্ঘের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। আসলে যার যেমন ভাবনা—সিদ্ধিও তো তেমনি হবে। না হয়ে উপায় নেই।

ইস্কনের সংস্পর্শে এসেই ভ্যালেন্টিন পুলিশে মার্কামারা হন; কৃষ্ণনাম করতে

গিয়ে, কৃষ্ণকথা প্রচার করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁকে ধরা পড়তে হয়, জেলে যেতে হয়, মানসিক হাসপাতালে থাকতে হয়, সর্বমোট উনপঞ্চাশ বার। প্রত্যেক বারে মেয়াদের পরিমাণ খুব বেশি না হলেও ক্লেশের পরিমাণ কিছু কম ছিল না। ক্লেশ আর লাঞ্ছনার জন্যই তো জেল, মানসিক হাসপাতাল, লেবার ক্যাম্প বা শ্রমশিবির। সোভিয়েৎ দেশে কৃষ্ণভক্তদের ভাগ্যে তা যথেষ্টই জুটেছিল।

মানসিক হাসপাতালের ডাক্তারবাবু ভ্যালেন্টিনকে দেখে প্রথম দিনই বললেন, 'ভারতের কৃষ্ণ তোমার মাথাটা খারাপ করে দিয়েছে। এখন চিকিৎসার দরকার। কঠিন চিকিৎসা।'

দক্ষিণ ইউক্রেনের নগরতাবা গ্রামে ভ্যালেন্টিনের জন্ম হয়েছিল এক ধর্ম-বিদ্বেষী পরিবারে। পিতা ছিলেন নামীদামী পার্টি-সদস্য, কমসোমলের খ্যাতিমান সংগঠক। ধর্মের নামে তিনি ছিলেন অসহিষ্ণু, আপন মাকে পর্যন্ত ধর্মাচরণের জন্য ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করতে ছাড়তেন না। তার সেই মা অর্থাৎ ভ্যালেন্টিনের ঠাকুমা একদিন শিশু ভ্যালেন্টিনকে চুরি করে নিজের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। আসলে তাকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে! বাবা সব জেনেও না জানার ভান করেছিলেন। মানুষের স্বভাবে সত্যি বৈচিত্র্যের অন্ত নেই।

ঠাকুমার বাড়িতেই শিশু ভ্যালেন্টিন যিশুখৃষ্টের একটি অতি প্রচলিত ছবি দেখে ভারি খুশি—খেলনা নয়, কোনো চটকদার জামা কাপড়ও নয়, এই ছবিটি তখন ছিল তার বড়ই প্রিয়। কখনও হাতছাড়া করত না, কাউকে ছুঁতে পর্যন্ত দিত না।

মা বিবাহ-বিচ্ছেদ করে তখন দ্বিতীয়বার স্বামী গ্রহণ করেছেন। বি-পিতা ছিলেন এক ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি। ভ্যালেন্টিনকে তিনি গীর্জার ইস্কুলে ভর্তি করে দিতে চাইলেন। মা বেঁকে বসলেন, শেষপর্যন্ত আত্মহত্যার হুমকি দিয়ে সব ভণ্ডুল করে দিলেন। 'ধর্ম টর্ম আবার কি কথা' তিনি বলে বসলেন, 'ছেলে লেখাপড়া শিখে লায়েক হবে, রোজগারপাতি করবে তার চেয়ে বড় কথা আর কি আছে!'

পরবর্তীকালে পলিটেকনিকে পড়তে গিয়ে যুবক ভ্যালেন্টিনের মনে হয়, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক গলদ আছে, অনেক যেন পরস্পর বিরোধিতা আছে, কারণ রাজনৈতিক কর্তারা পেছন থেকে কলকাঠি নাড়ে। আরও একটি জিনিস ভ্যালেন্টিন তখন খতিয়ে দ্যাখেন, সে হচ্ছে নেতা লোকদের উক্তি-প্রতিশ্রুতি। নেতারা বলেছিলেন, বিগত বছরগুলোয় জনজীবনে অনেক অসম্পূর্ণতা ছিল, অকিঞ্চিৎকরতা ছিল ; এবার সুদিন এসেছে। অথচ বাস্তবে ছিল উল্টোটা। ঠাকুমা নিজে তাই বলেছিলেন।

এতো সব জটিলতা আর গোঁজামিল এড়িয়ে সদ্য মাধ্যমিক-পাশ করা ভ্যালেন্টিন গিয়ে হাজির হয়েছিলেন রিগাতে। কাণ্ট আর হেগেলীয় দর্শন, লেলিনবাদ আগেই তাঁর পড়া ছিল। রিগাতে এবার তাঁর শুরু হয়েছিল সত্যের সন্ধান—সেই সন্ধান পেলেই যে অমৃতলাভ হয়, সেই হিসাব তাঁর ছিল। এই সময়েই যোগশাস্ত্র, যোগাভ্যাস সম্পর্কিত কিছু বই পুঁথি তাঁর হাতে আসে, দৈবক্রমে নিরামিষভোজী তো আগেই তাঁকে হতে হয়েছিল। ব্যাপারটি আসলে একই, অন্য সব কৃষ্ণভক্তের নেপথ্য কথার সঙ্গে তাঁর প্রাক-দীক্ষা জীবনের অনেক মিল।

হরেকৃষ্ণ-সন্ন্যাসীদের সঙ্গেও এই সময়ে তাঁর দেখা হয়ে যায়। তাঁদের কথা-বার্তা খুবই যুক্তিপূর্ণ ঠেকে। তখন আরও একটি ব্যাপার ঘটে, ভ্যালেন্টিন সেই প্রথম প্রভুপাদের ছবি দেখতে পান শিষ্য পরিবেষ্টিত আলোকসুন্দর এক মহাপুরুষের ছবি, রাজনৈতিক নেতাদের ছবির সঙ্গে তার মোটেই মিল ছিল না।

এইসব লক্ষ্য করে মায়ের মনে খুব খারাপ প্রতিক্রিয়া হয়, ছেলের মতিগতিতে নিরাশ হয়ে মা বলেন, 'আজেবাজে লোকের পিছে না ঘুরে তুমি বরং মদ খাও, সিগারেট টানো, মেয়েছেলে নিয়ে ফুর্তিফার্তি কর। কৃষ্ণ ফিষ্ণ তোমাকে কি সম্পদ দেবে ?'

কিছুদিনের মধ্যেই কিন্তু মায়ের বদলে গেল মতটা, ভরদ্বাজ দাস বললেন, 'কারাদণ্ড পাবার পরই মায়ের আমি প্রিয়পাত্র হয়ে পড়লাম। এবং তার প্রিয়পুত্র। আমাকে কারামুক্ত করে আনার জন্য তার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না ;

শেষও ছিল না।'

'সব কৃষ্ণের ইচ্ছা, নইলে মায়ের এত পরিবর্তন হবে কেন, এবং যে ডাক্তার বলেছিলেন কৃষ্ণ আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছেন, তিনিই বা এখন বলবেন কেন—বড্ড ভুল করেছিলাম, ওপরওয়ালার হুকুমেই আমাকে অমন করে বলতে হয়েছিল!'

কৃষ্ণভাবনা সঙ্ঘের লোকদের সঙ্গে ভরদ্বাজ দাসের সম্পর্ক যত ঘন হয়েছে, পুলিশের নজর তাঁর ওপর ততো বেশি বেড়েছে, ফলে জেল আর মানসিক হাসপাতালে ঘন ঘন তাঁর স্থান হয়েছে। অথচ কারও বিরুদ্ধে তাঁর কোনো অভিযোগ নেই, খাবার খাওয়া নিয়ে কোনো নালিশ নেই। 'খাবার-দাবার বরং বেশ ভালোই ছিল, মানসিক হাসপাতালের প্রশংসায়, ভরদ্বাজ দাস বললেন, 'দুধ, পরেজ তো প্রচুর মিলত। ডাক্তারবাবুদেরও ভালোই বলতে হয়, নারকোটিক ইনজেকশন না দেবার জন্য আমার অনুরোধ পর্যন্ত তারা রেখেছিলেন।'

'কিন্তু একদিন একটা দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার ঘটল, আমার কাছে রাজবিদ্যা বলে যে বইটি ছিল তারা তা দেখে ফেললেন, এই সূত্রে অবিলম্বে হাসপাতালে কে-জি-বির শুভাগমন হতে পারে ভেবে মারধর করে তারা আমাকে নারকোটিক ইনজেকশন দিলেন। আমার উন্মাদগ্রস্ততা দেখা দিলো, অনতিবিলম্বে আমি পাগলে পরিণত হলাম; এবং ঐ অবস্থাতেই কৃষ্ণনাম জপতে লাগলাম, বলতে গেলে অসংলগ্নভাবে। আমার যে উপায় ছিল না।'

'তখনকার আরও একটি ঘটনার কথা বলতে হচ্ছে; অপর একজন মনোরোগী একটা সাহিত্যপত্রে একজন কৃষ্ণভক্তের ছবিতে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে; ঐ পত্রেই অন্য একটি রচনায় প্রভুপাদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছিল, ভগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণীই স্থান পেয়েছে সেই বাণী এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণে কোনো তফাৎ নেই।'

'কাছাকাছি অনেক মানসিক রোগী ছিল, তাদের কাউকে কাউকে বেঁধে রাখাও হয়েছিল। দেখে আমার খুব দুঃখ হলো, মন বলল, শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয় একটা ব্যবস্থা শীগগীরই করবেন।'

'হলোও তাই, সেইদিনই আগের ডাক্তারবাবু বদলী হয়ে গেলেন, নতুন ডাক্তার এসেই নারকোটিক ইনজেকশন দেওয়া বন্ধ করলেন। সবার জন্যই। আমার তো মহা স্বস্তি হলো, কৃষ্ণনাম জপতপ, কৃষ্ণকথা অধ্যয়নের সব বাধা কেটে গেল।'

'সেই ডাক্তারবাবু এখনও আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন, কখনও কখনও চিঠিও লেখেন। অন্তঃকরণের দিক দিয়ে মানুষ আসলে ভালোই। মাঝে মাঝে কিছু ব্যতিক্রম ঘটে।'

'শেষ বারের মতো আমার কারাদণ্ড হয়েছিল রিগাতেই, মাত্র দশদিনের মেয়াদ। গ্রেফতারের সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রে পুলিশ আমাকে বেশ চিমটি কেটে ছিল, খোঁচা মেরে লিখেছিল, এ হচ্ছে বড়ই মারাত্মক লোক। ঘোর মাতাল। কড়া নজরে রাখতে হবে।'

'ওরা কিন্তু আমাকে নিয়ে ভর্তি করে দিলো যৌনরোগের ওয়ার্ডে। সুতরাং মনোরোগ, মাতলামি রোগের চিকিৎসা নয়, ওরা আমার যৌন রোগের বালাই না থাকলেও সেই রোগের চিকিৎসা করতে শুরু করল। তার ওপর মাঝে মাঝেই পুলিশ এসে বেধড়ক ধমকানি শুরু করল, ধমক চমক দিয়ে বলতে লাগল—তুমি বাপু সাংঘাতিক মাল, হরেকেষ্টদের সঙ্গে কিছুতেই তোমাকে মেলামেশা করতে দিতে পারি না।'

'তাহলে একবার বুঝে দেখুন, ফ্যাসাদের অন্ত নেই, আমাদের পুলিশে ধরবে, পাগলা গারদে পুরবে, মনোবিকারের স্থলে যৌনরোগের চিকিৎসা চালাবে। তার পরও কানের কাছে এসে বলবে, কৃষ্ণসন্ন্যাসীদের মতো মারাত্মক জীব আর হয় না। কাঁহাতক আর সহ্য করা যায়।'

'শেষপর্যন্ত আমরা গর্বাচভের কাছে চিঠি লিখলাম,' ভরদ্বাজ প্রভু এবার বললেন—'একেবারে কিছুই রাখঢাক না করে। জানি না সেই চিঠি তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছেছিল কিনা। তবু যে শেষপর্যন্ত ইস্কন বৈধ ধর্মসঙ্ঘ বলে স্বীকৃতি পেয়েছে সেই তো মস্ত কথা, সোভিয়েৎ দেশে কৃষ্ণচেতনা আন্দোলনের জয় জয়কার হয়েছে।'

ভরদ্বাজ প্রভু আজীবন সাদাসিধে লোক, ভালো ছাড়া কোনো মন্দ কিছু

তাঁর চোখেই পড়ে না। এখন আবার সন্ন্যাসী মানুষ, কৃষ্ণ ছাড়া মুখে কথাই নেই। সম্প্রতি তিনি একটি সুন্দর কথা বলেছেন, 'আমাদের বিরুদ্ধে যা কিছুই ঘটুক না কেন, আমি বেশ জোরের সঙ্গেই বলতে চাই, রাশিয়াতে অনেক ভালো লোক রয়েছেন, এমনকি পুলিশ, ডাক্তার, কে-জি-বি এবং উকিলদের মধ্যেও।'

'অনেক প্রমাণ আমি খাড়া করতে পারি, তবে আপাতত দু একটি শুনে দেখতে পারেন।'

'লিথুনিয়ার ঘটনাও উল্লেখ করার মতোই বটে। রাজধানী ভিলনুসে প্রভু-পাদের বই বিক্রী করতে গিয়ে আমি ধরা পড়ে যাই। সবই প্রভুপাদের রচনাবলী। ক্রেতা ছিলেন এক ডাক্তার মানুষ। তিনি বললেন, ভয় নেই, আমি একজন ভগবদ বিশ্বাসী, অবশ্য তোমাদের বৈদিক মতে নয়, খৃষ্ট মতে। তোমার কারাদণ্ড হলে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব তোমাকে মুক্ত করে আনতে।'

'ভদ্রলোক কথা রেখেছিলেন, খুব শীগগীরই আমি মুক্তি পেয়েছিলাম। এমন লোক কি আর সচরাচর মেলে।'

'সেবার এস্তোনিয়াতেও বিপদে পড়তে পড়তে আমি বেঁচে গিয়েছিলাম, না জেনে শুনে কে-জি-বির লোকের হাতে একখানা ভগবদগীতা গছিয়ে দিয়ে-ছিলাম। লোকটা খুবই ভালো ছিলেন বলা হচ্ছে, বইয়ের দাম মিটিয়ে মুচকি হেসে তিনি চলে গিয়েছিলেন।'

'প্রভুপাদ বলতেন, শ্রীকৃষ্ণই মানব সভ্যতার পরিবর্তন ঘটাবেন। উপরোক্ত ঘটনাবলী যেন সেই ইঙ্গিতই বহন করছে। কৃষ্ণচেতনা সঙ্ঘের মাধ্যমেই হয়তো সব পরিবর্তন আসবে, নিশ্চিত নতুন পৃথিবীর অভ্যুদয় ঘটবে।'

সোভিয়েৎ দেশের কৃষ্ণভক্তদের ভারত আগমন নিয়ে ভরদ্বাজের সঙ্গে এবার কিছু কথা হলো—লাঞ্ছনার কারাগার থেকে মুক্তির ভারতবর্ষে আগমন। এমন সুযোগ যে কখনও মিলবে ভক্তদের কেউই তা কখনও ভাবেন নি। এ যেন একই ক্লাশে ফেল করে পড়ে থাকা ছাত্রের পক্ষে ডবল-প্রমোশন লাভ!

ব্যক্তিগত মনের ভাব প্রকাশ করতে ভরদ্বাজ দাস বললেন, 'এতদিন আমি যেন কোন্ দূর বিদেশে ঘুরে ফিরছিলাম। এবার নিজের দেশে নিজের ঘরে ফিরে এসেছি।'

'পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ আসলে সব কৃষ্ণভক্তেরই আপন দেশ!'

১৭

ভরদ্বাজ দাস আর গদাধর দাস বলতে দু'জনেরই সাধনভূমি রিগা, বালটিক ল্যাটভিয়ার রাজধানী শহর। ভরদ্বাজ দাসকে ঘন ঘন গ্রেফতার বরণ করতে হয়, দীর্ঘদিন কাটে তাঁর জেলে এবং মানসিক হাসপাতালে। গদাধর দাস কখনও গ্রেফতার বরণ করেন নি, জেল এবং মানসিক হাসপাতালের দরজা মাড়ান নি। রিগার ভরদ্বাজ দাসের সঙ্গে রিগার গদাধরের অনেক তফাত।

তা হোক, ল্যাটভিয়ায় একদিন যে কৃষ্ণচেতনার আন্দোলন গিয়ে পৌঁছাবে তাতে যেন কোনো সন্দেহই ছিল না, কারণ সুদূর অতীতে নাকি ভারতবর্ষের সঙ্গে ল্যাটভিয়ার চিত্তের যোগ ঘটেছিল—জনশ্রুতিও তাই। আমাদের যুক্তির জোরও তাই। সবটাই অবশ্য অনুমান নয়, ভারতের কিছু দেবদেবী ওখানে স্থান করে নিয়েছিলেন, ধূপ, অগুরু, চন্দনও ওখানে পৌঁছেছিল। এখনও ভারতীয় ভাষার সঙ্গে ল্যাটভিয়ান ভাষার কিছু কিছু মিল চোখে পড়ে। তব শব্দটি ওদের উচ্চারণে দাঁড়িয়েছে তাওয়া (তাবা), আগুন হয়েছে ওগুন্‌স্। এহো বাহ্য, রাশিয়ার অ ত্র এমন সব মিল নেই, পৃথিবীর অন্য অনেক প্রান্তেও নয় ; তবু কৃষ্ণের করুণা থেকে ওই সব স্থান এখন বঞ্চিত নয়। রাশিয়ায় শ্রীকৃষ্ণ একদিন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে গিয়ে ভক্তদের ডেকে বলেছিলেন—'ওঠ, জাগো—'

রাশিয়ার শীতল রিপাবলিকের ল্যাটভিয়ায় কৃষ্ণচেতনা সঙ্ঘের স্থানীয় ভক্ত অনেক আছেন, ভরদ্বাজ দাস, গদাধর দাসরাও সেখানে গিয়েছেন। আর গিয়েছেন চন্দ্রশেখর। তাঁর কথা আমরা পরে বলব।

বালটিক মুল্লুকের পোল্যাণ্ডে আমি অবশ্য গিয়েছি, পোল্যাণ্ড অঞ্চলের হাড় কাঁপানো শীতের কথা আমার এখনও মনে আছে। সে কি ভীষণ শীত। পোল্যাণ্ডের উত্তর-পূর্বে লিথুনিয়া, তার উত্তর সাগরসীমায় ল্যাটভিয়া।

এই দুর্মর শীতের দেশে প্রেম ও সুন্দরের সন্ধান এবং বাণী প্রচার করা সহজ কথা নয়! কৃষ্ণভক্তরা তা করতে পেরেছেন, নেহাত আত্মিক জোরে, গদাধর দাসরা পেরেছেন হয়তো পূর্বজন্মের সুকৃতিতে।

প্রথম যৌবনেই গদাধর পরমার্থ সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, পাঁচ বছরের রসায়ন কোর্স অর্ধ সমাপ্ত রেখে হরেকৃষ্ণদের পেছনে ছুটেছিলেন ছাত্র-জীবনেই। চার বছর পরের কথা—কৃষ্ণভাবনা সঙ্ঘের এক সন্ন্যাসী একদিন তাঁকে দেখা দিলেন। গদাধরের নাম তখন ভিসকাট্‌স্ ‌গুণটিস্। সন্ন্যাসীকে ভিসকাট্‌স্ বললেন, 'আপনি এখন কেন এসে দেখা দিলেন?'

সন্ন্যাসী বললেন, 'আমার যে কেবলই মনে হচ্ছিল, কে যেন আমায় ডাকছে, আমার সাহায্য চাইছে।'

এই থেকে হরেকৃষ্ণদের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগের সূত্রপাত, এবং তা ক্রমশই ঘন হয়ে উঠতে থাকে।

ভিস্‌কাট্‌সের বাবার নাকি ঈশ্বর সম্বন্ধে ভালো ধারণা ছিল, কিন্তু সে সম্বন্ধে ছেলেকে তিনি কিছুই বলেন নি। ইস্কুলে সবাই তাঁকে বলত, ভগবান টগবান কিচ্ছু নেই। ভিসকাট্‌স্ বালক বয়সেই তর্ক তুলে বলতেন—ভগবান আছেন।

রাশিয়ার সমাজ জীবনে তখন খুব শোচনীয় অবস্থা চলছে—একদল লোক রাজনৈতিক পদমর্যাদার ফায়দা তোলে, ফালতু টাকার পাহাড় জমায়, নেশাভাঙ-জুয়ায়-যৌনতায় ডুবে থাকে। গদাধরের মতে সমাজের স্তরে স্তরে তখন বিষ ঢুকেছে, দুষ্কৃতি এবং বিকৃতিতে দেশ উচ্ছন্নে যেতে বসেছে। প্রভাবশালীরা ছলে ছুতোয় জাঁকজমক করে পার্টি জমায়, অঢেল পান ভোজ চলে, যৌনগন্ধী গান ছাড়া সেখানে কিছুই গাওয়া হয় না। ভিসকাট্‌সের মতো যুবকের এসব ভালো লাগার কথা নয়। তাঁকে গা বাঁচিয়ে চলতে হয়, যা আবার উন্নাসিকদের পছন্দ নয়।

তাঁর বাবারও ছিল পান-দোষ। মাতোয়ালী ভাবের মধ্যেও তিনি নাকি কিছু রহস্যময় শব্দ শুনতে পেতেন। অলৌকিক কণ্ঠে কে যেন তাঁর অতীত জীবনের কাহিনী বলে যেত। বালক ভিসাকাট্‌স্ প্রমাণ চেয়ে বসত।

কিন্তু কোথায় প্রমাণ? আসলে নিজের ধর্মচেতনা সম্বন্ধে বাবা ছিলেন অতি-সচেতন। তাছাড়াও অপরকে হিতোপদেশ দেবার গুরুঠাকুর—এটা করতে নেই, ওটা বলতে নেই, সেটা ইত্যাদি।

আরও কিছুদিন কেটে গেল; ছাত্রজীবনের মাঝপথে তাঁর কৃষ্ণভাবনা সঙ্ঘের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটেছিল। তার আভাস আমরা অবশ্য আগেও দিয়েছি। আধ্যাত্মিকতার পথে এগোবার জন্য যে যোগাভ্যাস করতে হয় ভিসকাট্‌স্ তা আগেই ভাবতে পেরেছিলেন। কিন্তু তার জন্য আবার উপযুক্ত গুরু চাই, আব গুরু বলতেই তো ভারতবর্ষ। কিন্তু কি করে ভারতবর্ষে যাওয়া যায়, গুরুর সন্ধান পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে তাঁর কোনো ধারণাই ছিল না।

কৃষ্ণচেতনা সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা বললেন, ভারতে যাবার আর দরকার নেই—ভারতবর্ষ থেকে পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে শ্রীল প্রভুপাদ ইস্কন প্রতিষ্ঠা করেছেন, লোকের কৃষ্ণচেতনা জাগ্রত করেছেন। কৃষ্ণই তো স্বয়ং ভগবান।

তাঁদের পরামর্শে ভিসকাট্‌স্ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে শুরু করেন। নিরামিষ খেতে আগেই শুরু করেছিলেন: কৃষ্ণসন্ন্যাসীরা তাঁকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন কি করে নিরামিষ রান্না করতে হয়, প্রসাদ তৈরী করতে হয়। দীক্ষা হলো তাঁর আরও বছর খানেক পরে, হরিকেশ মহারাজ ডাকযোগে দীক্ষা দিয়ে তাঁর নাম দিলেন গদাধর দাস।

'দীক্ষার পর আমার মনে হলো, জীবনটা যেন অনাবিল শান্তিতে ভরে গিয়েছে,' গদাধর দাস বললেন, 'মনে হলো আমার বহু সাধনার বহু বাঞ্ছিত ধন আমি পেয়ে গেছি।'

সমাজের অন্য অনেকের মতো গদাধরও বিশ্বাস করতেন, অনেক দোষ ত্রুটি থাকা সত্বেও সাম্যবাদের শেষ আদর্শে গিয়ে দেশ একদিন ঠিক পৌঁছে যাবে, সুখে দুঃখে দেশের মানুষ সত্যি সমান হবে। কিন্তু তা আর হলো কোথায়? প্রত্যেকে প্রয়োজনমতো সবই পাবে, সাধ্যমতো সমাজের সেবা করবে—কিন্তু এই আদর্শ থেকে সবাই সরে গেছে বলে তাঁর যেন মনে হয়।

একদিন তাঁর মনে বড় অতৃপ্তি ছিল, এটা-চাই ওটা-চাই এই জাতীয় দুর্দম বাসনা ছিল। ভাগ্যের কথা, তখনই তাঁর মনে পড়ে যায় ঈশোপনিষদের

কথা, উপনিষদের সেই অভ্রান্ত বাণী, যে পৃথিবীর সবই ঈশ্বরের সম্পত্তি, যাকে যেটুকু তিনি দিয়েছেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আবাল্যের সব কথা, সব ঘটনা তাঁর মনে পড়ে, মাঝে মাঝে তাঁর যে পাওনার চেয়ে অনেক বেশি পাবার আকাঙ্ক্ষা হতো এবং তার যে কি অর্থ তাও তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। পরম অন্ধকার থেকে আলোকের রাজ্যে তাঁর উত্তরণ ঘটতে থাকে, অশান্তি দূরে সরে যায়।

পরিবার পরিজন নিয়ে গদাধর এখন খুব সুখী নয়, স্ত্রী, সন্তান কেউই কোনো কিছুতেই তাঁর সঙ্গে একমত নয়। ব্যতিক্রম শুধু আট বছর বয়সী একটি ছেলে। রাতে শোওয়ার আগে সে রোজ গল্প শুনতে চায়। কৃষ্ণের আবির্ভাবের কাহিনী শুনে সে খুবই মোহিত হয়। কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কারও কাহিনী সে আর এখন শুনতেই চায় না। কেউ তাকে এখন আর বোঝাতে পারে না যে ভগবান নেই, মাথা নেড়ে কেবলই সে বলে, ভগবান আছেন, আছেন, আছেন !

মায়ের কিন্তু এসব মোটেই ভালো লাগে না !

আপন বন্ধুরাও তাঁর কৃষ্ণভক্তি বুঝতে পারে না, পছন্দও করে না।

আশ্চর্যের কথা, গদাধরের ভারত ভ্রমণের খবরে তাঁর বন্ধুর দল খুব খুশি হয়, আনন্দ করে, তাঁর পরমার্থ সাধনের সাফল্য কামনা পর্যন্ত করে। কারণ ব্যাখ্যা করে গদাধর দাস বললেন, 'সোভিয়েতের মানুষ মনে করে, ভারত একটি আশ্চর্য দেশ, ধর্মে মহান দেশ—অধ্যাত্ম গৌরব মণ্ডিত ভারতবর্ষ সবাইকে সত্যি টানে। তারা একান্তই ভাবে, সেখানে যাবার প্রয়োজন আছে, তীর্থ-যাত্রার অর্থ আছে।'

'সুদীর্ঘ তেইশ বছর সাধনার পর আমি আধ্যাত্মিক শান্তির সন্ধান পেয়েছিলাম, গদাধর বললেন, 'আসলে কৃষ্ণভাবনা সঙ্ঘে যোগ দিয়ে এবং শেষ পর্যন্ত ভারতের মাটির স্পর্শ পেয়ে।'

কৃষ্ণে নিবেদিত প্রসাদের প্রসঙ্গ উঠল, তার স্বাদ এবং শান্তির যে শেষ নেই গদাধর বার কয়েক উল্লেখ করলেন। ভারতে এসে প্রসাদের রকম দেখে গদাধর অভিভূত। একটু আগেই আমাদের সকালিক আহার সমাপ্ত

হয়েছে ; তার প্রায় সব উপকরণই তাঁর কাছে নতুন এবং অভিনব মনে হয়েছে। বরফ শীতল বেলের সরবৎ, ঘন দুধে আপেল-কলা-পেঁপের টুকরো মিলিয়ে ফ্রুট স্যালাড, গাওয়া ঘিয়ে গোল মরিচের গুঁড়ো ছিটিয়ে চিঁড়ে ভাজা, ফুলকপির সিঙারা, লুচি, মোহনভোগ, ছানার জিলিপি, সন্দেশ—কি না ছিল! তাঁর কাছে দুপুরের খাদ্য উপকরণগুলোও বিচিত্র মনে হয়, গোবিন্দভোগ চালের সুগন্ধী ভাত, সুক্তো, কপির ঘন্ট, ডাল, ঝিঙে পোস্ত, আলুর দম, ছানার ডালনা, শাক, পাঁপড় ভাজা, দই, পায়েস, রসগোল্লা—ল্যাটভিয়ার রিগায় এ যে অকল্পনীয়! রাতের হালকা খাবারও অভিনব বটে—কেক, পেস্ট্রি, দুধ পেলে আর কিই বা লাগতে পারে। সন্ন্যাসীদের অনেকে আবার শুধু দুধটুকুই নেন, আর কিছু নয়।

সারা বিশ্বের সমবেত সন্ন্যাসীদের সবাই ধুতি পরা, তিলক কাটা, মুণ্ডিত শীর্ষ, মহিলারা শাড়ি পরা তিলক-কাটা নথ-নাকে। জোড়াসনে বসে হাতে তুলে সবাই কলার পাতা থেকে খাবার খান। খাওয়ার আগে সমস্বরে ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, কৃষ্ণ বড় দয়াময়। তারপর আবার তাঁর জয়ধ্বনি তুলে বলেন, মহাপ্রসাদ কি, জয়! মায়াপুরের সুবিশাল ডাইনিং হলে সারা বিশ্বের কৃষ্ণভক্তদের প্রসাদ গ্রহণই একটা দেখবার মতো দৃশ্য!

'দেশের বাড়িতে আমরা যে প্রসাদ তৈরী করি তাতে থাকে কৃচ্ছ্রতার ছাপ, গদাধর দাস মন্তব্য করেন—'এখানে তো সব রাজভোগের ব্যাপার।'

'ঠিক তা নয়, আমি বলি, 'বাড়িতে অতিথি এলে নতুন কিছু ভালো গোছের খাবার তৈরী করতেই হয়—থোড়-বড়ি-খাড়া তো আর তাঁদের পাতে তুলে দেওয়া যায় না!'

রাশিয়ান কৃষ্ণভক্তরা সম্প্রতি জগন্নাথদেবের পুরী ঘুরে এসেছেন। বিদেশী ম্লেচ্ছ সাহেব লোক বলে তাঁদের মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হয় নি। পাণ্ডাদের মতে তিলক কাটলেও তাঁরা খাঁটি বৈষ্ণব নন!

এ হচ্ছে ভারতবর্ষের জাতীয় কলঙ্ক। কালো চামড়ার ঘোর পাপী, নরঘাতক, কালোবাজারী ইত্যাদি সবাই মন্দিরে প্রবেশের ছাড়পত্র পায়, শুদ্ধাচারী

সাহেবরা শুধু নয়। বৈষ্ণবীয় রীতি তো এ নয়। চৈতন্য মহাপ্রভু কিন্তু আচণ্ডালেও প্রেম বিলিয়েছেন। আশ্চর্য, আমাদের কলঙ্ক মোচনের তেমন কোনো চেষ্টাই করা হয় না। মুষ্টিমেয় পাণ্ডা লোকের নেপথ্যে মতলববাজ রাজনীতিওয়ালারা নাকি কলকাঠি নাড়ে। অবস্থার পরিবর্তন হবে কি করে!

এই নিয়ে আমার আফসোস আর উষ্মার ধারে কাছে না গিয়ে গদাধর দাস গদগদ কণ্ঠে বললেন জগন্নাথ দেবের প্রসাদ-মাহাত্ম্যের কথা। মন্দির প্রবেশের কোনো ব্যবস্থা না করতে পারলেও ইস্কন-কর্তারা রাশিয়ান কৃষ্ণভক্তদের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থাটা করতে পেরেছিলেন। তার জন্য ভক্তদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

'সে তো পার্থিব জগতের কোনো বস্তু নয়,' জগন্নাথ-প্রসাদের স্বাদ গুণ সম্বন্ধে গদাধর অল্প কথায় অনেক বললেন, 'একমাত্র বৈকুণ্ঠলোকেই এমন প্রসাদ তৈরী করা সম্ভব। ভগবান করুণা করে গ্রহণ করেন বলেই ঐ প্রসাদের এমন স্বাদ, এমন সুগন্ধ।'

'জগন্নাথ দেবের প্রসাদ খেতে খেতে আমাদের মনে পড়েছিল প্রভুপাদের কথা। তিনি তাঁর কিছু বইয়ের নামকরণ করেছিলেন 'নেক্টর অব ডিভোশন', 'নেকটর অব ইনস্ট্রাকশন', 'ইজি জার্নি টু আদার প্ল্যানেট্স্' ইত্যাদি। নেকটর বা মধু বলতে যে কি বোঝায় জগন্নাথদেবের প্রসাদ খেয়ে তার পুরো অর্থ বোঝা গেল।'

কখনও যদি কোনো অতি মানবের সঙ্গে দেখা হয় তাকে বলব, চাঁদে বা কোনো গ্রহান্তরে পাড়ি দেবার দরকার নেই। জগন্নাথদেবের পুরী দেখলে, প্রসাদ খেলে বরং আরও মধুর স্বাদ পাবে।

এঁরা বিদেশী সাহেব বৈষ্ণব ; বৈষ্ণবীয় অনুভূতি এঁদের মনো-চিন্তায় কত অল্প সময়ে কত সহজে আবিষ্ট হয়ে গেছে!

১৮

রিগা শহর চন্দ্রশেখরের ভালোই লাগত, এখনও তেমন খারাপ লাগে না। দুঃখের বিষয় ল্যাটভিয়ার এই রাজধানী শহরে তাঁর চলার পথ মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না, অন্তত গদাধরের মতো সহজ সরল ছিল না। ভরদ্বাজ দাসের মতো চন্দ্রশেখরও বালটিকের বাইরের লোক, বহিরাগতের অস্বাচ্ছন্দ্য তাঁর পক্ষে বেশ অস্বস্তিকরই হয়েছিল।

রিগার আগে চন্দ্রশেখর ছিলেন টিবিলিসিতে; তিনি ছিলেন ইতিহাস আর রুশ ভাষার শিক্ষক। তখনও ধর্মচিন্তা তাঁর মনে তেমন করে বাসা বাঁধে নি। তবে একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, তাঁর স্বভাবটি ছিল উচ্চকোটির; কোনো সঙ্কীর্ণতা বাক্য বা মনে নীচতার কোনো স্পর্শমাত্র ছিল না।

ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ শহরে আনন্দমঞ্জরী নামে এক কৃষ্ণভক্তর কাছে সর্বপ্রথম তিনি কৃষ্ণভাবনা সঙ্ঘের কথা শোনেন, তারপর তার নানান কাজকর্মের পরিচয় নিতে শুরু করেন। কিয়েভে তখন কৃষ্ণভক্তদের একটি গোপন আড্ডা গড়ে উঠেছিল, যার সঙ্গে চন্দ্রশেখরের ক্রমে যোগাযোগ ঘটেছিল।

কৃষ্ণভক্তির সেই ভয়ানক-বিস্ময়ের প্রথম যুগের রাশিয়ায় কৃষ্ণভক্তদের লুকিয়ে চুরিয়ে চলতে হতো, নিতান্ত অপরাধীর মতো ভয়ে ভয়ে থাকতে হতো। গোপনে নির্জনে কৃষ্ণনাম করে সুদিনের আশা নিয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া তাঁদের আর কোনো উপায় ছিল না। কিয়েভে আবার ভয়টা ছিল কিছু বেশি। তখন আর মন্দির কোথায়—একটা ভাড়া করা বাড়িতে মিলিত হয়ে ভক্তরা কৃষ্ণনাম করতেন, কৃষ্ণকথা আলোচনা, পূজা-জপতপ সবই করতেন। নেহাৎ ঘটনাচক্রেই চন্দ্রশেখর একদিন সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন।

কিয়েভের সেই গোপন-মিলন কেন্দ্রে শত ভক্ত কণ্ঠে সুর মিলিয়ে চন্দ্রশেখরও

কৃষ্ণকীর্তন করলেন। দুবাহু তুলে আনন্দে নৃত্য করলেন—তারপর ক্রমে গীতা-ভাগবৎ-শ্রীকৃষ্ণ এবং ভগবৎ দর্শন সম্বন্ধে অনেক অশ্রুতপূর্ব অর্থপূর্ণ কথাও শুনতে পেলেন ; শুনে শুনে একেবারে মন মাতোয়ারা হয়ে পড়লেন। মনে হলো, আমি যেন নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি, মায়াপুর লোটাস গেস্ট হাউসে বসে সেদিনের সশ্রদ্ধ স্মৃতিচারণে চন্দ্রশেখর বললেন, 'কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্তনের নেশা আমাকে পেয়ে বসল। সেই নেশাগ্রস্ততা (Intoxication) কি আর সহজে কাটে !'

এ যেন এলাম দেখলাম জয় করলাম জাতীয় ঘটনা—ইস্কনের হরেকৃষ্ণদের সংস্পর্শে এসেই স্ত্রোকচোভ অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে ভক্তদের খাতায় নিজের নাম লিখিয়ে দিলেন, এবং সেইদিন থেকেই খাদ্য খাওয়া আচার-আচরণ সম্পর্কে সঙ্ঘ প্রবর্তিত নিয়ম-নীতি মেনে চলতে শুরু করলেন। স্বভাবতই তাঁর জীবনের চিরাচরিত ধারা গেল বদলে। মদাশক্তি বা বদ দোষ বলতে যা কিছু ছিল সব উবে গেল। মন-মাতাল হলে কি মদ-মাতাল কেউ হতে পারে, নাকি কখনও হয়।

এর পরই তাঁর রিগায় গমন, দীক্ষা গ্রহণ, এবং দীক্ষার শেষে স্ত্রোকচোভ কনস্টানটিনের চন্দ্রশেখর নাম প্রাপ্তি। রিগাতে

একই দিনে যজ্ঞাদেবী দাসীরও দীক্ষা হয়েছিল। হরিকেশ মহারাজ যথারীতি ডাকযোগে তাকেও দীক্ষা দিয়েছিলেন। স্বয়ং যজ্ঞাদেবী দাসীর কাছে আমরা সেদিনের দীক্ষাদান উৎসবের সব বিবরণ শুনে নিয়েছি। বেশ একটি যজ্ঞের উৎসব অনুষ্ঠান সেদিন পালন করা হয়েছিল। যজ্ঞাদেবী দাসীর এখনও বেশ মনে আছে, মস্কো, কিয়েভ, টিবিলিসি থেকে কে কে এই যজ্ঞানুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন।

সবাই এসেছিলেন খুব গোপনে, গোপনে রিগায় এসে অসম্ভব গোপনীয়তা রক্ষা করে সবাই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত ছিলেন। ভক্ত তো নয়, যেন সন্ত্রাসবাদী। পয়লা নম্বরী সন্ত্রাসবাদীর মতো গোপন আড্ডায় মিলিত হয়ে যেন প্রতিষ্ঠিত সরকারের উচ্ছেদ কামনায় সবাইকে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে হচ্ছে! কি উপায়ই বা ছিল !

দীক্ষা উপলক্ষে রিগায় অন্তত দশ কি.মি. দূরে যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সুষ্ঠুভাবে যজ্ঞ-সম্পাদন করার জন্য হরিকেশ মহারাজ খুব গোপনে একজন সদ ব্রাহ্মণ সেখানে পাঠিয়েছিলেন। তখন শীতকাল, বালটিক অঞ্চলের আবহাওয়া বড়ই অকরুণ—শীতের তীব্রতা সীমাহীন। তারই মধ্যে শুরু হলো যজ্ঞের অনুষ্ঠান। তার রকম দেখে স্থানীয় লোকজন কিছু ভয় পেয়ে গেল! তারা পুলিশ ডেকে নিয়ে এলো। ব্যাপার স্যাপার কিছুই বুঝতে না পেরে পুলিশ মুখ ফিরিয়ে চলে গেল!

এমনটি কোথাও হয় না—ক্যানাডা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ায় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন, কেউ কিছু বলবে না। তোমাদের রীতিতে তোমরা যজ্ঞ করবে, তাতে আমরা কেন পুলিশ ডাকব, তাদের মনের ভাবটি এই, কাজের কথাও এই।

যজ্ঞের জন্য উপযুক্ত আহুতি চাই—সাধ্যমতো সবই যোগাড় করে আনা হয়েছিল। চন্দন, দুর্বা, তুলসী, পূজার ফুল সবই নিয়ে আসা হয়েছিল রিগার যজ্ঞস্থলে, ধূপ-ধুনুচির বদলে এসেছিল প্যাকেট করা সুগন্ধী ধূপ। ঘৃত, মধু, তিল, হরিতকি কিংবা আতপ চালও বাদ ছিল না। ফলের মধ্যে ছিল সুপক্ক আপেল, তাও যজ্ঞস্থলে স্তূপাকার করে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। মস্কো, কিয়েভ, টিবিলিসির ভক্তদের বাড়িতে সেই যজ্ঞের ফুল এখনও আছে; সবাই সযত্নে তা রক্ষা করে চলেছেন। ওঁরা আমাদের চেয়েও বেশি হিন্দু, বেশি বৈদিক। এবং আমাদের চেয়ে যে বেশি বৈষ্ণব ওঁদের আচার আচরণে তার প্রমাণ তো এ পর্যন্ত আমরা অনেক পেয়েছি।

বেশির ভাগ হিন্দুলোক ধর্মের কোনো ধারই ধারে না। পূজা-হোম জপ-তপ বলতে নিজেরা ব্যক্তিগত তৎপরতায় প্রায় কিছুই করে না। বাড়িতে পুরুত এসে পয়সা নিয়ে মাটির মূর্তিতে ফুল ছিটোয়, আমরা ভাবি, দেবতাকে বেশ পূজা করা হচ্ছে, আমাদের বেশ ধর্ম পালন করা হচ্ছে। ধর্মের আচরণ যে নিজে করতে হয়, ধ্যান-জপ-পূজার অভ্যাস করতে হয়, গীতা-ভাগবৎ পড়ে সম্যক বুঝে তার অনুশাসন মেনে চলতে হয়, সেই সব কথা ছেলেবেলা থেকে আমাদের কেউ বলে না, শেখায় না। বিদেশী কৃষ্ণভক্তদের দেখে, আচার আচরণ লক্ষ্য করে, তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেই তো আমার

মনে হয়েছে, ওঁরা বেশি হিন্দু, বেশি বৈষ্ণব, বেশি ভারতীয়।

ভোর চারটেয় এক পুলিশ এসে চন্দ্রশেখরের বাড়িতে হানা দিলো। সে এক জবর হানা—বাচ্চারা ভয়ে তখন কাঁপছে। পুলিশের লোক নিখুঁত নিষ্ঠায় থানাতল্লাসির কাজ শুরু করল, বইপত্র খুলে পাতা-গুলো পর্যন্ত উল্টেপাল্টে দেখল। অবশ্য তাদের একটা মতলব ছিল, চন্দ্রশেখরের দীক্ষাগুরুর কিছু চিঠি-চাপাটি আবিষ্কার করা। আর তা করতে পারলেই চন্দ্রশেখরের অপরাধের পাল্লাটা ভারি হতে পারে। অন্তত তাদের ধারণা ছিল তাই। কিন্তু সুবিধা হলো না। অগত্যা প্রভুপাদের রচনাবলী, ভারতবর্ষ এবং সনাতন ধর্ম সম্পর্কিত যা কিছু বইপত্র চন্দ্রশেখরের ছিল, পুলিশ সবই তুলে নিয়ে গেল। এসব ছাড়াও ঘরে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বিষয়ক কিছু বই ছিল। লুটের হাত থেকে তাও রক্ষা পেল না।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়, সবে শুরু। এবার চলল জেরা-জিজ্ঞাসার পালা। কে-জি-বির লোক চন্দ্রশেখরকে ধরে নিয়ে গেল পাবলিক প্রসিকিউটরের কাছে। অনেক প্রশ্ন তারা করল—কৃষ্ণচেতনার ব্যাপারটি আসলে কি. বাড়িতে বইগুলোকে যোগান দেয়, পড়ে শেষ করে চন্দ্রশেখর ওসব আবার অন্য কাউকে বিতরণ করেন কিনা ইত্যাদি হরেক রকমের প্রশ্ন। সুযোগ মতো চন্দ্রশেখরের গুরু মহারাজকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করতেও পুলিশবাবুরা ছাড়ল না।

পুলিশ জিজ্ঞাসা করল—গুরু মহারাজ কি দিয়েছেন?

চন্দ্রশেখর বললেন—দীক্ষা।

পুলিশ ঠাহর করতে পারল না ওটা আসলে কি জিনিস। মাথা খাটিয়ে তারা ভাবল, নিশ্চয় কোনো পার্থিব বস্তু। দুনিয়াদারিতে কিছু না দিলে যখন কিছু পাওয়া যায় না, চন্দ্রশেখর নিশ্চয় দীক্ষার বিনিময়ে গুরুদেবকে বিস্তর টাকা পয়সা দিয়েছেন, অন্তত নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধি মতে পুলিশ তা ধরেই নিল। কষে ধমক লাগিয়ে চন্দ্রশেখরকে আবার তারা প্রশ্ন করল, দীক্ষার জন্য কত টাকা গচ্চা দিতে হয়েছে বলো দিকি নি?

সঙ্গে সঙ্গে আস্ফালন চলল, প্রশ্নের পর প্রশ্নও চলতে লাগল। চন্দ্রশেখর

'জানি না বলে, কিংবা নিছক চুপ করে থেকে তাদের এড়িয়ে গেলেন। এবারের সব প্রশ্ন ছিল আসলে কে-জি-বির। কোনো কায়দা করতে না পেরে একতাড়া কাগজ এগিয়ে দিয়ে কে-জি-বির লোক চন্দ্রশেখরকে বলল, সই কর। মাত্র দুটো কাগজে তিনি সই করেন। ক্ষেপে গিয়ে কে-জি-বি তাঁকে মানসিক হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলো।

তাহলে ঘুরে ফিরে ব্যাপারটি সেই একই—ধরপাকড়, জেরা, জেল, মানসিক হাসপাতাল। সেই গৃহতল্লাস, ভীতি-প্রদর্শন, কৃষ্ণকে না ছাড়লে জেলে পুরে তিলে তিলে মেরে ফেলার হুমকি।

মানসিক হাসপাতালে চন্দ্রশেখরকে মারাত্মক সব নারকোটিক নেশাগ্রস্ত লোকদের সঙ্গে রেখে দেওয়া হয়েছিল। সব অনাচার অবিচার তাঁকে মুখ বুজে সইতে হচ্ছিল। কিন্তু তিনি বেঁকে বসলেন খাবারের সঙ্গে মাংস দেওয়া হলে; শেষ পর্যন্ত শুরু করলেন অনশন!

'অনশন করে লাভটা কি হবে শুনি,' হাসপাতাল-অধ্যক্ষ পরিহাস করে বললেন, 'কৃষ্ণ তোমাকে বাঁচাবেন, হেহ্—তাহলে এখানে স্থান হলো কেন, কৃষ্ণ তোমাকে আগেই রক্ষা করলেন না কেন?'

'লাভ লোকসানের কথা থাক,' চন্দ্রশেখর দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'আপাতত আমি কৃষ্ণ সন্ন্যাসীদের সান্নিধ্যে থাকতে চাই, ছেড়ে দেওয়া সম্ভব না হলে আমাকে যেন অন্তত নিরামিষ খাদ্য খেতে দেওয়া হয়।'

নিরামিষ খাদ্যের মঞ্জুর হলেও চন্দ্রশেখরকে আরও তিনমাস হাসপাতালে আটক থাকতে হলো। তাঁর ওপর চলল তখন নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা, যাতে তাঁকে মানসিক রোগী বলে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব চেষ্টা তাদের ব্যর্থ হলো, চন্দ্রশেখরের শারীরিক অবস্থা স্বাভাবিক বলে ঘোষণা করতে তারা বাধ্য হলো।

এবার শুরু হলো বিচারের পালা, আসলে বিচারের প্রহসন। একদিকে বিচারক, কে-জি-বির লোক, পুলিশ অর্থাৎ তাঁর শত্রুপক্ষ। অপর দিকে চন্দ্রশেখর একা। তাঁর নিজের উকিল অবশ্য ছিল, কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। সাড়ে তিন বছরের কারাদণ্ড তাঁকে মাথা পেতে নিতে হলো।

আশ্চর্যের কথা, তাঁর বিনা আর্জিতে, বিনা অনুরোধে দু'বছর পরই তারা তাঁর মুক্তি ঘোষণা করল, তাঁকে শোধন করে নেবার সদিচ্ছা প্রকাশ করে পুলিশ বলল, 'অনেক তো হলো, এবার বরঞ্চ কেষ্ট-ফেষ্ট ছেড়ে দাও।'

চন্দ্রশেখর হাসলেন, কৃষ্ণ ছাড়ার কথায় কান না দিয়ে হাকিম, পুলিশ, কে-জি-বির কাছে কৃষ্ণ মাহাত্ম্য প্রচার করতে লাগলেন! কে জানে কেন তারা হঠাৎ নরম হলো, নরম না হয়ে যেন তাদের উপায় রইল না। তাদের শেষ রিপোর্ট নিশ্চয় খুব খারাপ ছিল না। চন্দ্রশেখর আবার তাঁর আগের কাজে বহাল হলেন। রাশিয়ার কৃষ্ণভক্তদের মধ্যে এই একটি অতি বিরল ঘটনা।

চন্দ্রশেখর এখন প্রায় মুক্তপুরুষ; কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণচেতনা সঙ্ঘ এখন তাঁর ধ্যান জ্ঞান। এই সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, খুশির আবেগে কৃষ্ণভক্ত বললেন, 'কৃষ্ণচেতনার যাদু স্পর্শে সারা পৃথিবীর সব লোক একদিন বশীভূত হবে, ইস্কনের পতাকা তলে মিলিত হবে।'

আমি মায়াপুর সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য চাইলাম। 'মায়াপুর!' খানিক নিশ্চুপ থেকে চন্দ্রশেখর যেন স্বগতোভাবে বললেন, 'এ যে স্বপ্ন! এই স্বপ্ন থেকে আমাকে জাগিয়ে দিও না!'

এবার উঠল রাশিয়ায় তাঁদের ফিরে যাওয়া নিয়ে কিছু কথা—কোন্ রাশিয়া ত্যাগ করে তাঁরা ভারতে এসেছিলেন, কোন্-সে-রাশিয়ায় তাঁরা ফিরে যাবেন, তাঁদের সম্বন্ধে কি এখন ভাবছেন রাশিয়াব লোক ইত্যাদি সব টুকি-টাকি প্রসঙ্গ। চন্দ্রশেখরের উত্তর যেন আগে থেকেই তৈরী ছিল। 'আগের তুলনায় দেশের লোক আমাদের আরও সম্মানের চোখে দেখবে, চন্দ্রশেখর বললেন, 'তাদের মনে এখন এই ভেবে খুব গর্ব হবে, আমরা একটা কাজের মতো কাজ করেছি!'

১৯

ভক্ত ব্রাইয়ানের সঙ্গে আমি কথা বলছিলাম। ব্রাইয়ান ইংলণ্ডের ছেলে, বয়সে তরুণ, দীক্ষা হয় নি বলে পরিচয় তাঁর ভক্ত ব্রাইয়ান বলে ! সোভিয়েৎ কৃষ্ণভক্তদের মতো জেল-খাটা পাগলা-গারদে-স্থান-পাওয়া গোছের নেপথ্য ইতিহাস তাঁর নেই ; তবু কথাগুলো চিত্তাকর্ষক। কথা শুরু করেও আমাকে হঠাৎ থামতে হলো, কারণ রাশিয়ার যজ্ঞাদেবী দাসী এইমাত্র আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন, এবার মিনিট দশেক কথা বলার সুযোগ তাঁর হবে। গরজটা আমারই বেশি, কারণ আগে আমি তাঁর নাগাল পাই নি। ব্যাপারটি ভক্ত ব্রাইয়ান বুঝতে পেরে আপন ঔদার্যে বললেন, বেশ তো—

যজ্ঞাদেবী দাসীর কথায় মনে হলো, কৃষ্ণভক্ত হিসেবে রাশিয়ায় তাঁকে অনেকেই চেনে, সঙ্কীর্তনে-যোগ-দেওয়া তাঁর ছোট একটি ফিলম্ সারা রাশিয়াতে প্রচারিত হয়েছে, চলচ্চিত্র প্রযোজকরা তাঁর সাক্ষাৎকারও নিয়েছেন, যার মধ্যে নাতালিয়া আর নীনা নামে দুটি তরুণীও অংশ নিয়েছিলেন। মস্কোর মুখ্য রাজপথ আরবাত স্ট্রিটে সঙ্কীর্তন দেখেই মুগ্ধ মেয়ে দুটি কৃষ্ণভাবনা সঙ্ঘে যোগ দেন।

'ওঁদের ভাগ্য বটে, যজ্ঞাদেবী দাসী বললেন—! কাঁচা বয়সেই এমন কৃষ্ণভক্ত জন্মেছে। অথচ কৃষ্ণভাবনার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছে জীবনের চল্লিশ বছর অপচয় হয়ে যাবার পর।'

নিজের বদলে যজ্ঞাদেবী দাসী নীনা ন,তালিয়ার কথাই বলতে শুরু করেছিলেন এবং সেই সূত্রেই বললেন, নাতালিয়ার সঙ্গে একজন যুবক ছেলের পরিচয় ঘটে ; সেই যুবকই কেন জানি তাঁকে গীতার কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, কর্মাণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। শ্লোকটি যথাযথ আবৃত্তি করে যজ্ঞাদেবী দাসী বললেন, ছেলেটি পথদুর্ঘটনায় মারা গেলে নাতালিয়া সেই প্রথম

মৃত্যু সম্বন্ধে গভীরভাবে ভাবতে বসেন—অতঃপর আরবাত স্ট্রিটে কৃষ্ণসন্ন্যাসী দের মুখে প্রশান্তি লক্ষ্য করে তাঁর মন বেশ বল পায়, নাতালিয়া বাহু তুলে তাঁদের সঙ্গে নাচতে শুরু করেন।

'ওদিকে নীনা মেয়েটি আবার খুব ধনীঘরের দুলালী,' যজ্ঞাদেবী দাসী বলেন, 'বলতে গেলে রাজ-রাজড়ার সন্তান।'

'রাশিয়ায় আবার ধনী গরিব কি, আমি বাধ' দিয়ে বলি, 'রাশিয়ায় গিয়ে আমার তো মনে হয়েছে—'

'তা হলে শুনবে, আমাকেও বাধা দিয়ে যজ্ঞাদেবী দাসী বলেন, 'রাশিয়ায় ভাগ্যবান লোকদের অতুল ঐশ্বর্যে ফেঁপে ফুলে ওঠার সুযোগ রয়েছে, যাকে বলে রাজাগজা হবার সুযোগ। টাকার তাদের অন্ত নেই। ভূমিকম্পের আর্মেনিয়াতে একজন পার্টিকর্মীর ঘরে কি পাওয়া গেল জানেন? তিন মিটার উঁচু করে সাজিয়ে রাখা বিদেশীমুদ্রার পাহাড় স্তূপ। ছাপাখানার এক ডিরেক্টরের ঘরেও হিসাব বহির্ভূত চল্লিশ হাজার রুবল নগদ মিলল।'

'ধনবান পিতার সুখবিলাসিনী কন্যা হলেও নীনার কাছে এমন সব সম্পদ নেহাত অশুচিকর ঠেকে. আশপাশে তাকিয়ে দেখে তাঁর মনে হয়, অনেকেই যেন পঙ্কিলতায় ডুবে আছে। তাঁর নিজেরই আত্মহননের ইচ্ছা হয়। আর ঠিক তখন তাঁর পরিচয় ঘটে কৃষ্ণভাবনা সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে।'

তাঁর এক আপন সাক্ষাৎকারে নীনা নাতালিয়ার ভূমিকা স্বল্প হলেও যজ্ঞা-দেবী দাসী এত কথা বললেন। তাঁর মতে সোভিয়েৎ সমাজের স্তরে স্তরে মিথ্যাচার, ঠগবাজি, পানদোষ, অবৈধ যৌনতা ইত্যাদি পাপ মাত্রাহীন বেড়ে চলেছে। একমাত্র কৃষ্ণভাবনা সঙ্ঘই এই সব পাপ থেকে সমাজকে বাঁচাতে পারে। সবার মধ্যে কৃষ্ণকথা প্রচার করে, সবার কৃষ্ণচেতনা জাগিয়ে তুলতে পারে।

যজ্ঞাদেবী দাসীর নাম ছিল তখন ইজাবেল বুচাল।

একটি অজানা ছেলে একদিন তাঁকে মস্কোর এক ভগবদগীতার আলোচনা সভায় নিয়ে গেলেন। বিশ্বামিত্র, চিমুর, ভরদ্বাজ, সদানন্দরাও সেখানে তখন হাজির ছিলেন। গীতার ব্যাখ্যা শুনে যজ্ঞাদেবী দাসীর মনে হলো

তাঁর প্রয়োজন বলতে যা ছিল তার সন্ধান পেয়ে গেছেন, জীবনের কঠিনতম সমস্যার সহজতম উপায় খুঁজে পেয়েছেন। এর পর থেকে একটা ব্যাপার ঘটে—কর্মস্থলে পড়ে থাকলেও তাঁর কেবলই মনে পড়ে, কখন বা কৃষ্ণভক্ত-দের সঙ্গে দেখা হবে, কথা হবে।

যজ্ঞাদেবী দাসীর পারিবারিক জীবন খুব সুখের নয়, স্বামীর সঙ্গে খিটিমিটি লেগেই থাকত; শেষপর্যন্ত দারুণ অশান্তির মধ্যে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। এর পরই তাঁর দীক্ষা হয়—হরিকেশ মহারাজ দীক্ষা দিয়ে তাঁর নাম দেন যজ্ঞাদেবী দাসী।

তাঁর চিন্তায় চেষ্টায় কর্মে এখন কৃষ্ণচেতনা আশ্লিষ্ট থাকে। 'কৃষ্ণচেতনা জাগরিত না হলে সমস্ত লোকের দুর্দিন বাড়বে,' যজ্ঞাদেবী দাসী মন্তব্য করেন, 'সমস্ত পৃথিবীটাই ভেঙে পড়বে।'

তাঁর মতে 'সোভিয়েৎ হরেকৃষ্ণদের ভারত আগমন এ যুগের এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা, কারামুক্ত কৃষ্ণভক্তদের পক্ষে তো বটেই, বর্তমান এবং আগামী দিনের সব কৃষ্ণভক্তর পক্ষেই। তাঁর শেষ মন্তব্য হিসেবে যজ্ঞাদেবী দাসী বললেন, 'ভারতে আসার পর মানব সভ্যতার একটি নতুন স্ট্যাণ্ডার্ড যথার্থ একটি ধারাই আমাদের চোখের সামনে অবারিত হয়ে গেছে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এমন করে আগে কখনও আমরা ভাবি নি। এর গুরুত্ব অনেক।'

ভক্ত ব্রাইয়ান তখনও আমার জন্য অপেক্ষা করছেন, নারকেল গাছের ছায়ায় বসে মালা ফিরিয়ে চলেছেন। ইংলণ্ডের লোক হলেও সাম্যবাদের নতুন সিস্টেমে রাশিয়ার সুপার পাওয়ারোচিত অগ্রগতি তাঁকে ভাবায়—মায়াপুরে কম্যুনিস্ট রাশিয়ার হরেকৃষ্ণদের নিষ্ঠা দেখে তাঁর বিস্ময়ের সীমা থাকে না। কেনই বা নয়—ব্রাইয়ান ইংলণ্ডে বসেই কোনো এক প্রবন্ধে পড়েছিলেন, রাশিয়ার এক সরকারি মুখপাত্রের সুস্পষ্ট ঘোষণা, 'সোভিয়েৎ দেশের ব্যক্তি জীবনে তিনটি মারাত্মক আঘাত হচ্ছে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি, রক সঙ্গীত, হরেকৃষ্ণ আন্দোলন।' এই প্রেক্ষিতেই সরকারি দর্শন মাত্রা ছাড়ায়। তবু যে রাশিয়ার গোকুলে হরেকৃষ্ণরা বেড়ে উঠতে পেরেছেন তার চেয়ে বড় বিস্ময় ব্রাইয়ানের কাছে আর কিছুই নেই।

এবার ব্রাইয়ানের ভক্ত জীবনের একটু আভাস দিতে হচ্ছে। ছেলেবেলা তাঁর সুখে কাটে নি ; মায়ের দু'বার বিবাহ এবং দু'বার বিচ্ছেদ তাঁর মনকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। আর তখনই নিউ ক্যাসেলের হরেকৃষ্ণ মন্দিরে ব্রাইয়ান সরাসরি গিয়ে উঠেছিলেন।

সারা ইংলণ্ডে তখন ইস্কনের মন্দির সংখ্যা দশ, নিউক্যাসেল নবতম এবং ক্ষুদ্রতম। দীক্ষিত অদীক্ষিত ভক্ত সেখানে মোট চারজন। মন্দিরটি চালু রাখাই ছিল কঠিন কাজ। ব্রাইয়ানের কাজ ছিল প্রভুপাদের বই বিক্রী করা, শ্বেতাঙ্গ এবং এশীয়দের কাছে চাঁদা ভিক্ষা করা। ব্রাইয়ান ভাবতে পারতেন না, এতে তাঁর আধ্যাত্মিক উন্নতি কি করে হবে !

লণ্ডনের কুড়ি মাইল দূরে লেচমোরে ভক্তি বেদান্ত ম্যানর তখন ইংলণ্ডের মধ্যে সবচেয়ে বড় মন্দির। একান্ন বিঘা জমি জুড়ে এই ম্যানর হাউসটি কিনে জর্জ হ্যারিসন ইস্কনকে দান করেন। স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল কর্তারা এখন সঙ্কীর্তন কোলাহলের অজুহাত তুলে ভক্তি বেদান্ত ম্যানরের ঝাঁপ চিরতরে বন্ধ করে দেবার চেষ্টা চালাচ্ছেন। নিউক্যাসেলের ছোট্ট মন্দিরে বসে লণ্ডনের কৃষ্ণ মন্দিরটি নিয়ে ব্রাইয়ানের খুব দুশ্চিন্তা হয়। 'যাকে বলে ইংরেজ লোক, নিজে ইংরেজ হয়েও ব্রাইয়ান বলেন, 'ভিন্ মতবাদ নিয়ে তাদের নাক সিঁটকানো চাই, বিরোধিতা করা চাই।'

এমন স্বচ্ছ বুদ্ধি না থাকলে রাশিয়া আর রুশ কৃষ্ণভক্তদের প্রতি ব্রাইয়ানের অমন সহানুভূতিই বা হবে কেন !

হরেকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগ দেবার আগে ব্রাইয়ানের জীবনের ধারা ছিল পাশ্চাত্যের আর পাঁচজনের মতোই। মদ-গাঁজা-মেয়েমানুষ লক্ষিত, জুয়ার নেশায় কণ্টকিত। 'ভালো মানুষ সাজতে মোটেই নয়,' আমার এক মন্তব্যের প্রতিবাদে ব্রাইয়ান বলেন, 'শ্রীকৃষ্ণের শরণ নিয়ে জীবনে আমি একটি পরম স্বাদের সন্ধান পেয়েছি। কৃষ্ণভক্তির স্বাদ, যার ফলে পাপ চিন্তা-গুলো আমার ধুয়ে মুছে গেছে। শ্রীকৃষ্ণ যে নিজের মুখে বলেছেন—

সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

—সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে তুমি আমার শরণ নাও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে রক্ষা করব। তোমার দুর্ভাবনার কারণ নেই।

তাঁর নামের আগে 'ভক্ত' কথাটি যোগ করে সবাই সস্নেহে তাঁকে বলে ভক্ত ব্রাইয়ান। ব্রাইয়ান সত্যি ভক্ত লোক। পাশ্চাত্যের অন্য সব কৃষ্ণভক্তের মতোই ব্রাইয়ান স্বচ্ছন্দে গীতার ঐ শ্লোকটি আবৃত্তি করলেন। 'স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শ্লোকটি নিজ মুখে আবৃত্তি করেছিলেন, অনভ্যস্ত সংস্কৃত শ্লোক কি করে মনে থাকে তাই ব্যাখ্যা করতে ব্রাইয়ান বলেন, সংস্কৃত আসলে স্বর্গীয় ভাষা, এ ডিভাইন ল্যাঙ্গোয়েজ ; তার শক্তি, ঐশ্বর্য অতীন্দ্রিয়, মানুষের অভিজ্ঞতা এবং যুক্তির অতীত ; প্রভাব সীমাহীন। মনে রাখা তাই সহজ।'

প্রভুপাদের ভগবদগীতা এ্যাজ ইট ইজ, ঈশোপনিষদ, নেকটর অব ডিভোশন ইত্যাদি বই শেষ করে ব্রাইয়ান এবার ভাগবতম্ পড়তে শুরু করেছেন। গীতার প্রতিটি অধ্যায় প্রতিদিন তাঁর কাছে যেন নতুন রকমে অর্থবহ মনে হচ্ছে। দেহের বিনাশ এবং আত্মার অবিনশ্বরতা সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি আর প্রভুপাদের ব্যাখ্যা পড়ে তাঁর বিস্ময়ের আর সীমা নেই। 'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে' শ্লোকাংশটি ব্রাইয়ান আত্মগতভাবে আবৃত্তি করতে থাকেন।

'কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে শ্রীকৃষ্ণ গীতার শ্লোকগুলি বলেছিলেন, ব্রাইয়ানের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে আমি হালকা ভাবে বলি—কিন্তু পণ্ডিত লোকেরা বলছেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কোনো প্রমাণ নেই, সেখানে গীতা-আবৃত্তির কোনো প্রশ্নও নেই।'

'তারা আবার পণ্ডিত কোথায় ?' প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে ভক্ত ব্রাইয়ান বলেন, 'নেহাতই সাধারণ লোক। তারা শুধু নিজেদেরই জানে। তাদের জ্ঞান সীমিত, উদ্দেশ্য নোংরা। একটা উদ্ভট মতবাদ বাজারে চালু করে কিছু লোককে সেই দিকে টানা কোনো মহান উদ্দেশ্য হতে পারে না। গীতার আসল জ্ঞান যে শ্রীকৃষ্ণ থেকে গুরু শিষ্য পরম্পরায় চলে এসেছে তা বোঝবার ক্ষমতা তাদের নেই, থাকলেও ইচ্ছা করে উল্টো বলে।'

'ভারতবর্ষ ভগবদ গীতার দেশ, ধর্মের দেশ—পাশ্চাত্যের মতো কলিযুগ

এখনও এখানে তেমন মারাত্মক আকারে দেখা দেয় নি, এই মায়াপুরে তো কলিযুগের কোনো চিহ্নই নেই। ভারতবর্ষ এখনও সমগ্র বিশ্বের ধর্ম-গুরু।'

মায়াপুরে সমাগত সারাবিশ্বের তীর্থযাত্রীরা শান্তিপুরে যাত্রার উদ্যোগ আয়োজন নিয়ে এই মুহূর্তে খুব ব্যস্ত। আগেও ভারতে এসে ঐ তীর্থ অনেকে সেরে নিয়েছেন, তবু যেন আবার যাওয়া চাই। শান্তিপুরে রাশিয়ান ভক্তদের এই প্রথম তীর্থযাত্রা। চৈতন্য মহাপ্রভু এবং অদ্বৈত আচার্যকে ঘিরে শান্তিপুরের অনেক কাহিনী তাঁদের জানা আছে। শান্তিপুরের নামে তাঁদের উল্লাস আর আনন্দের সীমা নেই।

ভক্ত ব্রাইয়ানের অবস্থাও তথৈবচ। 'কাল যে একটা বিশেষ তিথি,' ব্রাইয়ান বললেন, 'দোল পূর্ণিমার আগের এই দ্বাদশীতে নিমাই, নিতাই, অদ্বৈত ঠাকুর শান্তিপুরের অদ্বৈত গৃহে এক সঙ্গে বসে প্রসাদ পেয়েছিলেন। সুতরাং এই দ্বাদশী-দিনে শান্তিপুরে বসে প্রসাদ খেলে কৃষ্ণ-ভক্তি হয়।'

'আমাকেও কাল প্রসাদ পরিবেশনের কাজ করতে হবে—কাল সকলের পাতে পাতে আমি কৃষ্ণের করুণা বিতরণ করব। প্রসাদ মানেই তো কৃষ্ণের করুণা। শ্রীকৃষ্ণ আমাকে সেই করুণা বিতরণে অনুমতি দিয়েছেন।'

হতবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, আমি কি তেইশ বছর বয়সী শিক্ষানবীশ এক ইংরেজ কৃষ্ণভক্তর সঙ্গে কথা বলছি, নাকি কোনো বর্ষীয়ান বৈষ্ণবের সঙ্গে!

নারকেল বনের এক বেদীতে বসে আমরা কথা শুরু করেছিলাম। যৌবনের তেজে কৃষ্ণভক্তির উচ্ছ্বাসে ভক্ত ব্রাইয়ান কথা বলছিলেন। কাছেই গেস্ট-হাউসের দোতলায় তখন পঞ্চাশ সেট গৌর নিতাইয়ের বিগ্রহ, হাজার হাজার জপমালা, ধুতি, শাড়ি, কুর্তা, আতরের শিশি, ধূপকাঠির প্যাকেট ইত্যাদি ডজন কয়েক স্টিল ট্রাঙ্কে সাজিয়ে তোলা হচ্ছিল। দেশে ফেরার সময় সবই রাশিয়ান ভক্তদের সঙ্গে উপহার হিসেবে দিয়ে দেওয়া হবে। উপহার সামগ্রীগুলি কিনতে অনেক টাকাই খরচ হয়েছে, কিন্তু দিয়েছেন

কে ? পৃথিবীব্যাপী ইস্কন-মন্দিরে এ বিষয়ে আগেই আবেদন প্রচার করা হয়েছিল। অনেকেই দানের টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন, অনেকে আবার সঙ্গে নিয়ে গৌর পূর্ণিমায় মায়াপুরে তীর্থ করতে এসেছেন। 'ভাবতে আমার আনন্দ হচ্ছে', ভক্ত ব্রাইয়ান বললেন, 'আমার নিউক্যাসেলের ক্ষুদ্র মন্দিরের অধ্যক্ষও কিছু টাকা সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছেন।'

'সোভিয়েৎ দেশের কৃষ্ণভক্তরা আসলে কি জানেন,' ভক্ত ব্রাইয়ান তাঁর শেষ মন্তব্যে জানালেন, 'সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। মহাত্মা লোক। কৃষ্ণের জন্য তাঁরা অনেক কষ্ট করেছেন, অনেক দুর্ভোগ ভুগেছেন! তাঁদের সম্বন্ধে এই হচ্ছে আসল কথা!'

২০

'ধনতন্ত্রী দেশের লোক হিসেবে আমি ছিলাম কম্যুনিস্ট রাশিয়ার কড়া সমালোচক। রাশিয়া ছিল আমাদের কাছে শত্রু দেশ, অপবিত্র অস্পৃশ্য দেশ। তখন অবশ্য কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণভক্তির সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই ছিল না।'

'সোভিয়েৎ লোকের সঙ্গে আমাদের অনেক প্রভেদ, অন্তত আমরা তাই ভাবতাম। ভেদাভেদ জ্ঞানটি আমাদের মনের মধ্যে খুব টনটনে ছিল।'

'তাঁদের অকপট কৃষ্ণভক্তির টুকরো টুকরো কথা যখন আমাদের কানে আসতে লাগল, বিভেদ চিন্তাটা মন থেকে ক্রমে ঘুচে গেল; ভাবলাম, ওঁরা আর আমরা তো একই রকমের লোক—'

আমি তখন শ্রীকৃষ্ণের শরণ নিয়েছি। সরকারি নির্দেশে লাঞ্ছনা, উৎপীড়ন, কারাদণ্ড সত্ত্বেও সোভিয়েৎ লোকের অবিচলিত কৃষ্ণভক্তির অনেক বিবরণ তখন ডেনমার্কে পৌঁছে গিয়েছে। অত্যাচার উৎপীড়নের ঘটনাগুলো জেনে মনে বড় ব্যথা পেলাম, আত্মীয় নির্যাতনের ব্যথা।

'আমার মনে খুব গর্বও হলো। পরম দুঃখের দিনে শ্রীকৃষ্ণে তাঁদের বিশ্বাস এবং ভক্তি-নিষ্ঠার পরিচয় পেয়ে মনে খুব বিস্ময়ও জাগল।'

উপরোক্ত কথাগুলো কোপেনহেগেনের কংসহন্তা দাসের। দোলপূর্ণিমা উপলক্ষে মায়াপুরে তিনি তীর্থ করতে এসেছেন। কংসহন্তা মনের আবেগ মিলিয়েই সব কথা বললেন, একেবারে যেন ভগবানকে সাক্ষী রেখে। চন্দ্রোদয় মন্দিরে তখন শ্রীকৃষ্ণের আরতি চলছে।

'কিন্তু কৃষ্ণভাবনা সঙ্ঘে যোগ দেবার আগে আমার জীবন ছিল খুবই আটপৌরে, খুব সাধারণ,' তাঁর আত্মকথায় আমার আগ্রহ দেখে কংসহন্তা দাস বললেন, 'তাছাড়া সোভিয়েৎ সন্ন্যাসীদের মতো অগ্নিপরীক্ষা আমাকে

কখনও দিতে হয় নি।'

কংসহন্তার আটপৌরে জীবনের কথা শুনে আমার আগ্রহে কিন্তু ভাঁটা পড়ল না। তাঁর নামের গৌরব লক্ষ্য করে আমি আবৃত্তি করলাম নজরুলের সেই প্রখ্যাত কাব্য কলি—

কংস কারায় কংসহন্তা জন্মিছে অনাগত

তারই বুক চিরে আসে নৃসিংহ যারে করে পদাহত।

বলা দরকার, শ্রীভগবানের নৃসিংহ মূর্তি ধারণের ইতিহাস কৃষ্ণভক্তদের কারও অজানা নয়। এই মূর্তিতে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে তিনি বধ করেছিলেন।

বাংলা না জানলেও উপরোক্ত কাব্যাংশ বোধহয় তাঁর মনে ধরে। 'নৃসিংহ' এবং 'কংসহন্তা' কাব্য ঝঙ্কারে বেশ মানিয়ে গেছে তো, নজরুলের কবিতায় শব্দ দুটি সনাক্ত করতে পেরে কংসহন্তা দাস একটি অনিবার্য প্রশ্ন করেন, 'তোমাদের কবিবর বুঝি খুব কৃষ্ণভক্ত ছিলেন?'

ডেনমার্ক ইউরোপ মহাদেশের মধ্যে খুবই ছোট একটি দেশ, লোকসংখ্যার দিক দিয়ে বোধহয় কলকাতা শহরের চেয়েও খাটো। তবে কিনা লোকের ঐহিক সমৃদ্ধি, জীবনের মান ইত্যাদি আমেরিকার চেয়ে কিছু কম উন্নত নয়। কম্যুনিস্ট না হলেও দেশটি আবার ঘোর নাস্তিক। ভগবানের অস্তিত্ব, তাঁর বাণী, তাঁর অহেতুকী করুণা কিছুদিন আগেও ডেনমার্কের কোনো লোকের টনক নড়ায় নি, তা নিয়ে কেউ কোনো মাথাই ঘামায় নি। এখন নিশ্চিত রকমে অবস্থা পাল্টেছে, এই মুহূর্তে ডেনমার্কে চলছে ঠিক তার উল্টোটা। ইউরোপের মধ্যে এখন ডেনমার্কই বোধহয় একমাত্র দেশ যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রায় সব মানুষের মনোলোকে আসন পেতে বসেছেন।

কংসহন্তার নাম তখন ক্লস ওলসেন। মদ গাঁজা, মেয়েমানুষ, জুয়া-হুজ্জুত ইত্যাদি নিয়ে সমাজের অন্য অনেকের মতো যুবক ওলসেনও পরমানন্দে মত্ত ছিলেন, জীবনের ধারা ছিল তাঁর খুবই সাধারণ, লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য কেন্দ্রিক। আসলে ভোগ-কেন্দ্রিক। উনিশ বছর বয়সের মধ্যেই ভোগের যাবতীয় উপকরণ তাঁর হাতের মুঠোয় বাঁধা ছিল। এবং বেশ পর্যাপ্ত

পরিমাণেই। আশ্চর্যের কথা, তাঁর কোনো তৃপ্তিবোধ বলতে কিছুই ছিল না, মনে কোনো শান্তি ছিল না। তখন আরও বেশি মাত্রায় আরও বেশি ভোগের মধ্যে ওলসেন লিপ্ত হলেন। কিন্তু কোথায় তৃপ্তি, কোথায় শান্তি—কে দেবে তার সন্ধান?

তখন আস্তে আস্তে কিছু প্রশ্ন অনিবার্য রকমে তাঁর মনে এলো—আমি কে, কোত্থেকে এসেছি, মনে কেন এই অশান্তি ইত্যাদি সব প্রশ্ন। আশ্চর্যের কথা, সাধু সন্ন্যাসী দেখলে তাঁর তখন ভালো লাগে, মন বলে, 'আহা, ওঁরা কেমন মুক্ত পুরুষ, অশান্তি অতৃপ্তি বলতে ওঁদের কিছুই নেই। তা হলে কি আধ্যাত্মিক জগৎ বলতে সত্যি কিছু আছে, কোনো সৎ-চিৎ-আনন্দ-বিভাসিত আলোকের রাজ্য, পরম শান্তির রাজ্য?

'পূর্ব জন্মে আধ্যাত্মিকতার পথে আমি বোধহয় খানিক এগিয়েছিলাম, মনে হরেক রকম প্রশ্ন ওঠার কারণ সম্পর্কে কংসহন্তা দাস বললেন, 'যে স্তরে তখন আমি উঠেছিলাম, এবার যেন সেই স্তরের আভাসটি পেতে শুরু করেছিলাম। গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই তো বলেছেন—

পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।

তেরো বছর বয়সে ওলসেন হঠযোগ শুরু করেছিলেন, সব রকম যোগই যে চিত্তবৃত্তি নিরোধক তাও শুনেছিলেন। কিন্তু চিত্ত চাঞ্চল্য দমন করা সম্ভব আর হলো কোথায়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য উনিশ বছর বয়স হলে আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসা প্রবল হলো, একবছর পর প্রভুপাদের 'ভগবদ-গীতা এ্যাজ ইট ইজ' পড়বারও সুযোগ ঘটল। বইটি ছিল তাঁর এক বন্ধুর, পড়তে ভালো লাগে নি বলে ওলসেনের হাতে সে গছিয়ে দেয়। ছ মাস ধরে গভীর মনোযোগে ওলসেন এই গীতাখানি পড়লেন: মন তখন কিছু শান্ত হয়ে গেছে, পাপ চিন্তাও মন থেকে অনেকটা কেটে পড়েছে। এবং ঠিক তখনই ওলসেনের সিদ্ধান্ত একেবারে ঠিক ঠাক—কৃষ্ণভাবনা সঙ্ঘে যোগ দিতে হবে। এবার সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গ লাভ হবে বলে মনটা বড়ই খুশি।

ওলসেন জুটল্যাণ্ড জেলার ওলবুর্গের লোক। সেইখানে পথে পথে প্রচার

রত কৃষ্ণ সন্ন্যাসীদের কাছে ওলসেন প্রভুপাদের আরও দুখানা বই কিনলেন, তাঁদের কাছ থেকে কোপেনহেগেন সঙ্ঘের ঠিকানা নিলেন। তখন তাঁর বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা এগিয়ে চলছিল—বিমান বিধ্বংসী গোলাগুলি শিক্ষার কাজ। আগে ওলসেন অবশ্য জাহাজ তৈরীর কারখানায় কাজ করেছিলেন। কোপেনহেগেনের সেই কর্মস্থলে দেখা করে ওলসেন ওলবুর্গে ফিরে গেলেন। মাথা মুড়িয়ে গেরুয়া পরলেন, আসবাবপত্র, স্টিরীয় সেট, তৈজস পত্রাদি সহ নিজের ফ্ল্যাটটি বিক্রী করে হাতে পেলেন দশ হাজার ডলার। একটি পয়সাও নিজের জন্য না রেখে ওলসেন সব দান করলেন কৃষ্ণ ভাবনা সঙ্ঘে, ইস্কনের মঠে।

'আমি তখন খুব গুরুত্ব দিয়ে আধ্যাত্মিক জীবনের কথাটাই ভাবছিলাম,' কংসহন্তা দাস মায়াপুরে বসে বললেন, সুতরাং জাগতিক জীবন-সম্ভব আসক্তি বাড়াতে পারে তেমন কিছু তো সঙ্গে না রাখাই উচিত।'

সোভিয়েৎ কৃষ্ণ ভক্তদের সঙ্গে পার্থক্য এখানে ধরা পড়ে যাচ্ছে। রাশিয়ায় তখন কোনো মঠ বা মন্দির নেই (সরকারি অনুমোদনে মস্কোতে এখন মন্দির নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে)। নেহাত প্রভুপাদের রচনাবলী কষ্টে যোগাড় করে পড়ে ছাত্র, শিক্ষক, ডাক্তার, বিজ্ঞানী, শিল্পী ইত্যাদি কিছু উঁচু স্তরের বুদ্ধিমান লোক ধর্মীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠছেন, গোপনে এঁর তাঁর ফ্ল্যাটে গিয়ে কৃষ্ণ কীর্তন করছেন, আর পুলিশ এবং কে-জি-বির লোক টের পেয়ে তাঁদের জেলে ঠেলছে; পদে পদে তাঁদের শুধু বাধা-বিঘ্ন-বাধা। সব সরকারের তরফ থেকে।

ওলসেন কিন্তু মঠে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত পাকা করা মাত্র সব ছেড়েছুড়ে এসে কৃষ্ণ সন্ন্যাসীদের দলে ভিড়ে পড়লেন। সরকারি বাধা, জেল-হাজত; গোপনে কৃষ্ণনাম করা আবার কি কথা!

ওলসেন অবশ্য সামান্য একটু বাধা পেলেন। মায়ের কাছ থেকে। ছেলের কাণ্ড কারখানা দেখে তিনি বড় ব্যথিত হলেন। স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করে অন্য একজন পুরুষের সঙ্গে মহিলা তখন বসবাস করছিলেন, পাশ্চাত্যে প্রচলিত রীতিতে তাকে বিয়ে না করেই। কিন্তু জীবনে তার

শান্তি ছিল না, কোনো তৃপ্তি ছিল না। কৃষ্ণে মতি হওয়া তো দূরের কথা, ওলসেন সম্বন্ধে অভিমত দিয়ে তিনি বললেন,—একটা হস্তী মূর্খ!

যথাসময়ে যথারীতি ওলসেনের দীক্ষা হয়ে গেল, নাম হলো তাঁর কংসহন্তা দাস। অর্থ পূর্ণ নামটি তাঁর খুব পছন্দও হলো।

'হবারই কথা,' আমি বললাম, 'কংসহন্তা তো স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই।'

'আমার যে তাঁর দাসানুদাস হবার যোগ্যতাও নেই,' বৈষ্ণবীয় বিনয়ে কংসহন্তা বললেন, 'আমার গুরু মহারাজের নির্দেশ আমি যেন সব সময় মেনে চলি, আমি যেন কৃষ্ণভক্তি লাভ করতে পারি।'

'আমার উদ্দেশ্য এখন শুধু একটিই, কৃষ্ণসেবা—নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্কে ঘুরে ফিরে প্রভুপাদের বই বিক্রী খুব যদি বাড়িয়ে তুলতে পারি, আমার উদ্দেশ্য অনেকটা সফল হবে।'

'পঞ্চাশ হাজার টাকার ভগবদগীতা এরই মধ্যে আমি বিক্রী করেছি। আরও অনেক পরিশ্রম আমাকে করতে হবে। ঘোর কলি বর্তমান—ঐ সব দেশে বিক্রী আর নাও বাড়তে পারে। ভোগবিলাসমুখী হলে লোক কি আর গীতা পড়তে চাইবে?'

'সফলতা সম্বন্ধে অবশ্য আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ গুরু মহারাজের আশীর্বাদ আমি পেয়েছি। তার মূল্য অনেক। তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে প্রভুপাদের, প্রভুপাদের সঙ্গে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের। কৃষ্ণের করুণা আমি নিশ্চয়ই পাব।'

কংসহন্তা দাসের মতে আধ্যাত্মিকতার ব্যাপারে এখন কিছু সুলক্ষণ দেখা যাচ্ছে—অবতার বাদ, যোগাভ্যাস, নিরামিষ ভোজন, লোকের মধ্যে অধ্যাত্ম আলোচনা উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়ে গিয়েছে। অনেকেই এসে এখন কৃষ্ণ চেতনা সঙ্ঘের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। রাজধানী কোপেনহেগেনের টি-ভিতে আজকাল অবতার-বাদ নিয়ে বিস্তর আলোচনা হচ্ছে, বিগত তিম মাসে হরেকৃষ্ণদের নিয়ে দু-দুটি অনুষ্ঠানও প্রচারিত হয়েছে।

'কৃষ্ণভক্তদের পক্ষে এটা মস্ত কৃতিত্বের কথা,' কংসহন্তা দাস অভিমত প্রকাশ করে বললেন, 'প্রভুপাদের রচনাবলী, বৈদিক গ্রন্থাদির ব্যাপক প্রচারের

ফলেই এ সব সম্ভব হয়েছে।'

'আরও চমকপ্রদ খবর দিতে পারি', কংসহন্তা দাস সহাস্যে বললেন, 'ডেনমার্কের সেকেণ্ডারি ইস্কুল, কলেজ, এমন কি বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের ছাত্র-ছাত্রীরাও এখন নানান প্রশ্ন নিয়ে আমাদের মন্দিরে আসে, গীতা ভাগবতের ক্লাশ করে, কৃষ্ণভক্তদের সাক্ষাৎকার নেয়। কৃষ্ণ ভাবনা, বৈদিক ধর্ম ও সমাজ হরেকৃষ্ণ আন্দোলন ইত্যাদি বিষয়ে তারা অনেক কিছু জানতে চায়, প্রশ্ন করে জেনেও নেয়।'

'পুনর্জন্ম বলে যে সত্যি কিছু আছে, এখন আমাদের দেশের অনেকেই তা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। অবশ্য সব কিছুর মূলে রয়েছে প্রভুপাদের রচনাবলী। ভগবদগীতা, ভাগবতম, ঈশোপনিষদ ইত্যাদি বই কেনার দিকে সবার এখন ঝোঁকটা খুব বেশি দেখা যাচ্ছে। প্রভুপাদের টীকা-টিপ্পনী সহ প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা পড়ে কোনো কিছু বুঝতে কারও একটুও অসুবিধা হচ্ছে না।'

'ডেনমার্কের শহর গাঁয়ে কৃষ্ণ সঙ্কীর্তন দেখলে আগে সবাই হাসি ঠাট্টা করত, ফোঁটা কাটা গেরুয়াপরা কৃষ্ণ সন্ন্যাসীদের টিটকিরি দিত—এখন কিন্তু হাসিমুখে তারাই হাত নাড়ে, স্মিত হেসে হরেকৃষ্ণদের অন্তরের শুভেচ্ছা দিয়ে অভিনন্দিত ক'র। এসব দেখতে এখন কি ভালোই লাগে।'

'লোককে জানাবার মতো আমাদের আরও অনেক কিছু আছে—কোপেন হেগেনের রেডিও সেন্টার ভারতীয় দর্শন, বৈদিক সভ্যতা, কৃষ্ণ ভাবনা ইত্যাদি নিয়ে কথিকা প্রচার করে। তাতে খৃষ্টধর্ম, ইসলাম, নিরীশ্বরবাদ ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা থাকে, বৈদিক ধর্মের নিরিখে তুলনা-মূলক তর্ক মীমাংসা থাকে। তাছাড়া আমাদের টেলিফোন প্রোগ্রাম তো খুবই জনপ্রিয়। ফোন তুলেই বিশেষত যুবাবয়সীরা কৃষ্ণ ভাবনা সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করে। এবং উত্তর পায়। পেয়ে খুশি হয়।'

কংসহন্তা দাস এবার একটি আশ্চর্য কথা বললেন, 'মস্কোর মন্দিরটি আগে তৈরী হোক ; আমি সোভিয়েৎ দেশে তীর্থযাত্রা করব।'

সোভিয়েৎ দেশে তীর্থযাত্রা ! আমি চোখ বড় করে তাকাই।

'কেন নয়', কংসহন্তা বলেন, 'ওঁরা যে শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণপ্রেমের আগুনে পুড়ে খাঁটি সোনায় পরিণত হয়েছেন। ওঁদের দেখলে, সেবা করলে আমাদের কৃষ্ণভক্তিই বাড়বে!'

আদিতে আমার লক্ষ্য ছিল সোভিয়েৎ দেশের কৃষ্ণভক্তদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, তাঁদের অসামান্য কৃষ্ণ সাধনার কথা লিপিবদ্ধ করা। গৌর পূর্ণিমা উপলক্ষে মায়াপুরে তখন সারা বিশ্বের কৃষ্ণভক্তরা তীর্থ করতে এসেছেন। সোভিয়েৎ কৃষ্ণভক্তদের নিয়ে তাঁদের ঔৎসুক্য আর শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। আলাপ হতেই মুক্তকণ্ঠে তা তাঁরা স্বীকার করেছেন। লক্ষ্য করে দেখেছি, সোভিয়েৎ দেশের ভক্ত এবং অন্য সব দেশের ভক্তদের কৃষ্ণভক্তির ঐকান্তিকতা, একাগ্রতা একই রকমের তীব্র। এবং একই রকম প্রশ্নাতীত।

নানান দেশী ভক্তদের সঙ্গে মিলেমিশে কথা বলে আরও একটি জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেছে—সোভিয়েৎ রাশিয়া ছাড়া অন্য কোনো দেশের সরকার কৃষ্ণ ভক্তদের পথে পথে কাঁটা ছড়ায় নি, রুশ ভক্তদের মতো আর কাউকেই কারাদণ্ড, উৎপীড়ন ভোগ করতে হয় নি, পুলিশী জুলুম সহ্য করতে হয় নি। ইংলণ্ডের ভক্ত ব্রাইয়ান, ডেনমার্কের কংসহন্তা দাসের সঙ্গে আমার আলোচনা তার প্রমাণ দিচ্ছে।

আর শুধু এই দুজনের কথাই বা বলি কেন—আমস্টারড্যামের শহরোপকণ্ঠে ফ্রিজেন স্টেইনের মন্দিরে যে সব ইউরোপীয় বা আমেরিকান কৃষ্ণভক্তের দেখা পেয়েছিলাম, কিংবা অস্ট্রেলিয়ার মন্দিরে যাঁদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল, শুধু কৃষ্ণভক্ত হবার অপরাধে তাঁদের কাউকেই সরকারি কোপে পড়তে হয় নি। সব পার্থক্য এইখানে।

'এদেশে পা রেখে প্রথমেই মনে হলো, পরিপার্শ্বের সব কিছু কত আলাদা', ভারত দর্শনের প্রেক্ষিতে কংসহন্তা দাস শেষ মন্তব্য করলেন, 'আমাদের পক্ষে কালচারাল শকের মতো। বৃন্দাবনে তার মাত্রাটা কিছু বেশি। পাশ্চাত্যের লোকের পক্ষে বৃন্দাবন একেবারেই সেকেলে।'

'কিন্তু এসব আমাদের কোনো ভাবনার মধ্যেই ছিল না। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ লীলা বিলাস করেছেন, মায়াপুরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করেছেন,

তাই হচ্ছে আসল কথা।'

'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর জন্মভূমি মায়াপুর এখন আন্তর্জাতিক তীর্থক্ষেত্র। বৃন্দাবনের গৌরব তার জন্য খাটো হয়ে যায় নি। কৃষ্ণভক্তি মায়াপুরে মূর্তি ধরেছে।'

২১

দোল পূর্ণিমার আর দেরি নেই। এই পুণ্যদিনে পাঁচশ তিনবছর আগে মায়াপুরে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব ঘটে বলে ফাল্গুনী পূর্ণিমার এই তিথির অন্য নাম গৌরপূর্ণিমা।

প্রতি বছরের মতো এবারও গৌরপূর্ণিমায় তীর্থকামী মানুষ মায়াপুরে আসতে শুরু করেছেন। আজ চিলি-ব্রাজিল-আর্জেনটিনা। কাল ক্যানাডা-কিংস্টন-কামস্কটকা, পরশু হয়তো চীন-বর্মা-জাপান কিংবা সিঙ্গাপুর-অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যাণ্ড থেকে পুণ্যার্থীরা আসছেন—তাঁদের আসার আর বিরাম নেই। মায়াপুর ইস্কনের গদা-পদ্ম-শঙ্খ নামে গেস্টহাউস তিনটিতে আর স্থান সঙ্কুলান হচ্ছে না। চক্র গেস্টহাউসটি এখনও নির্মাণের অপেক্ষায় রয়েছে। গৌরপূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, প্রভুপাদের জন্মদিনে মায়াপুরে আসাধারণ ভক্ত সমাগম হয়, বিশেষ করে বিদেশ থেকে। ভারতীয় ভক্তলোকদের তখন বলতেই হয়—'আপনারা তো দেশের লোক, পরে আসবেন।' একথা না বলে আসলে উপায় থাকে না।

বিদেশী ভক্তদের এবার খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ হলো, তাঁদের অনেক বৈশিষ্ট্য এবার আমার চোখে ধরা পড়ল। একজন আমেরিকান ভক্তের কাহিনী শুনে আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। স্ত্রী, বাচ্চা মেয়ে, বিবাহিতা শালীকে সঙ্গে নিয়ে মিনিসোটা থেকে তিনি মায়াপুরে এসেছেন। নিউইয়র্কের প্লেনে বোম্বেতে এসে তাঁরা হাওড়ার ট্রেনে বসে পড়েছিলেন। তৃতীয় দিনে হাওড়ায় নেমে কলকাতার মন্দিরে পৌঁছাতে প্রায় সারাটা দিনই লেগে গিয়েছিল, কারণ অ্যালবার্ট রোড পর্যন্ত পথনির্দেশ ভালো জানা ছিল না। আরও একটা কারণ ছিল—হাওড়া থেকে কলকাতায় এগিয়ে এসে মাছ-মাংস পেঁয়াজ রসুন বর্জিত নিরামিষ খাদ্য খুঁজতে গিয়ে অনেকটা

সময় নষ্ট হয়েছিল। তখনও তাঁরা ছিলেন অভুক্ত, তিনদিনের ট্রেনপথে বিশুদ্ধ নিরামিষ খাবার না পেয়ে সামান্য ফলটল ছাড়া কিছুই তাঁরা খান নি।

বিকেলের দিকে মন্দিরে পৌঁছেও অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে প্রসাদ মেলে নি, কারণ সোভিয়েৎ কৃষ্ণভক্তদের তখন বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে খাওয়ার ঘরে জায়গা ছিল না। রাশিয়া থেকে উড়ে এসে কলকাতায় থেমে তাঁরা ভায়া-মায়াপুর বোম্বে গিয়েছিলেন। ট্রেন পথে ফের কলকাতায় আসতে তিন দিন তাঁরাও প্রায় কিছুই খান নি। সেই খাঁটি নিরামিষ না পাবার একই কারণে!

আমি তখনও আমেরিকান ভক্তদের কথা ভাবছিলাম। কোথায় আমেরিকার কোন্-সে-নিবিড় অন্তর্দেশে মিনিসোটা রাজ্য, আর কোথায় পশ্চিম বাংলার মায়াপুর গ্রাম। প্রচণ্ড সভ্যতালোকিত আমেরিকা থেকে এই যুগের কৃষ্ণভক্ত তীর্থ করতে বেরিয়েছেন আমার দিদিমা হৃদয়সুন্দরীর মতো। বিশুদ্ধ বৈষ্ণবাচার পালন করতে গিয়ে তিনিও গয়া-কাশী বৃন্দাবনের ট্রেন পথে জলস্পর্শ করতেন না। কিন্তু সে তো প্রায় শতবর্ষ আগের কথা! এই ভক্তরা সব হচ্ছেন মহাকাশ যুগের লোক!

একজন অস্ট্রেলীয় ভক্তও আমাকে ভারি অবাক করলেন। ডাইনিং হল থেকে বেরিয়ে আসতেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সত্তরোত্তীর্ণ স্থূলকায়া মহিলার সংসারে কেউ-বলতে-কেউই নেই। মহাপ্রভুর জন্মদিনের উৎসবে প্রায় প্রত্যেক বছর তিনি প্রতিবেশীদের কারও-না-কারও সঙ্গে মায়াপুরে তীর্থ করতে আসেন। ভাত, সজনেডাঁটা-আলু-উচ্ছেতে শুক্ত, ডাল, বেগুন ভাজা, কপির ঘণ্ট, ছানার ডালনা, দই, পায়েসের প্রসাদ খেয়ে তিনি খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিলেন। তাঁর হাতে মাটির একটি পাত্রে ছিল ভোজন-অবশেষে অল্প কিছু ডাল ভাত। প্রসাদ ফেলতে নেই বলে পাত থেকে তুলে এনেছেন; পরে খাবেন!

'প্রতি বছরই তীর্থে না এসে পারি না বাবা, বৃদ্ধা বললেন, তীর্থ করলে যে পুণ্যি হয়—প্রভুপাদ তাইতো বলেছিলেন!'

ভাবলাম, আমার দিদিমাদের সঙ্গে এঁদের প্রভেদ কোথায়!

খাওয়ার বৈঠকেও ভারি একটি অদ্ভুৎ ব্যাপার দেখেছিলাম—একজন আমেরিকান মহিলা আহার-রত ভক্তদের মধ্যে কণিকামাত্রায় সন্দেশ-প্রসাদ বিতরণ করছিলেন। মুখে ছিল তাঁর পরম তৃপ্তি। নবদ্বীপের তীর্থ সেরে এই মাত্র তিনি ফিরছেন; সেখানকার প্রসাদ সবাইকে দিতে পেরে তাঁর ভারি আনন্দ হচ্ছে! কৃষ্ণভক্তির সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবীয় আচার রীতি-পদ্ধতি কত সহজে, কত অক্লেশে এঁরা বংশানুক্রমিক অভ্যেস ছাড়াও আত্মসাৎ করে নিতে পেরেছেন! হৃদয় দিয়ে ভেবে দেখবার মতো ব্যাপারই বটে!

চন্দ্রোদয় মন্দিরের সামনের মাঠে মরশুমী ফুলের রং বাহারের মধ্যে চুপচাপ বসে আছেন দাড়ি গোঁফওয়ালা এক নবীন যুবক—কাছে বসে তাঁর বান্ধবী ফুলের শোভা, ঘাসল মাঠ আমের বৌল অবাক হয়ে দেখছিলেন। দুজনই এসেছেন ইজরায়েল থেকে। ভগবান যিশুর জন্মস্থান তাঁদের বাড়ি থেকে মোটে আট মাইল দূরে। কাছে এগিয়ে গিয়ে একটুখানি আলাপের সূত্রপাত করে বললাম, মায়াপুর কেমন লাগছে?

'ডিভাইন', দুজনেই সমস্বরে জবাব দিলেন, 'একেবারে স্বর্গীয়। এমন একটি পরিবেশে বসবার সুযোগ জীবনে এই প্রথম পেলাম।'

'কৃষ্ণ ভাবনা সঙ্ঘে যোগ দেবেন বুঝি?' আমি প্রশ্ন করলাম।

ওঁরা নিঃশব্দে হাসলেন, হেসে বললেন, 'কৃষ্ণ এখানে আমাদের টেনে এনেছেন। সব দেখে শুনে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছি।'

আর কথা না বাড়িয়ে আমি কেটে পড়লাম। মনে হলো, ওঁরা যেন আবার ধ্যানস্থ হলেন। এইখানে এলে অবশ্য ধ্যানের কথা ছাড়া আর কিছুই বোধ হয় মনে হতে চায় না।

মায়াপুরে আমি এসেছিলাম আসলে রাশিয়ান কৃষ্ণভক্তদের সঙ্গে কথা বলতে, তাঁদের হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের ইতিহাস খুঁজতে, তার পটভূমি বুঝতে। মনে হচ্ছে, মায়াপুরের বৈকুণ্ঠলোকে নষ্ট করার মতো সময় সবার নেই। অপরের কাছে জীবনকথা বিবৃত করা যেন আসলে সময় নষ্ট করা। গীতার ক্লাশ করা, ভি-সি আরে কৃষ্ণ চিত্র দেখা তাঁর চেয়ে অনেক ভালো—জানি

না এমনি করে তাঁদের কেউ আদৌ ভাবছিলেন কিনা।

আমি এক রাশিয়ান কৃষ্ণভক্তের বোধহয় একটু উষ্মার কারণ ঘটিয়েছিলাম, অধুনা প্রদর্শিত চৈতন্য ভিটা দেখিয়ে তাঁকে বলেছিলাম, 'মহাপ্রভুর অপ্রকট হবার পর তাঁর পিতৃগৃহাদি দুরন্ত বন্যার দশ হাত জলের তলায় তলিয়ে গিয়েছিল।'

আমি তাঁর কাছে আরও প্রশ্ন রেখেছিলাম, 'আপনার কি মনে হয় এই ঘরখানা—'

'ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন', আমার অসমাপ্ত কথার এই অনুমান করতে পেরে তিনি ভক্তিবিনোদের উদ্দেশ্যে কপালে দু হাত ঠেকিয়ে বললেন, 'তিনি ছিলেন প্রভুপাদের গুরু মহারাজ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের পিতৃদেব। চৈতন্যদেবের পৈতৃক ভিটার সঠিক অবস্থান নিয়ে তিনি তখন খুব মাথা ঘামাচ্ছিলেন।'

'স্বরূপ গঞ্জের বাড়ি থেকে একদিন তিনি দেখতে পেলেন অখণ্ড একটি জ্যোতিবিভাস। তার উৎপত্তি স্থল ছিল এইখানে, বর্তমান এই কুটিরের অবস্থানে। খুবই চমকপ্রদ ব্যাপার, তাই না?'

চৈতন্যদেব তখন নিজের বাড়িতে, কখনও বা শ্রীবাস অঙ্গনে দলবল নিয়ে কৃষ্ণকীর্তন করতেন। ঘুম ভাঙা রাতের বাড়িতে বিছানায় শুয়ে চাঁদ কাজী দিব্যি তা শুনতে পেতেন। মহাপ্রভুর পৈতৃক ভিটা আরও দূরে, কিংবা অন্য কোথাও হলে সঙ্কীর্তনের কলরব কাজীর কানে গিয়ে পৌঁছাতেই পারত না। তাঁর সেই বাড়ির অস্তিত্ব তো এখনও রয়েছে। একটু গিয়ে দেখে আসুন, সব স্পষ্ট করে ধরা পড়বে!

'অন্তত বাংলার মানুষ যদি এই সব কথা না জানে খুবই দুঃখের কথা, তাই না!'

তা আর বলতে!

বিস্ময়ে আমি ভাবতে লাগলাম, সুদূর রাশিয়ায় অশেষ বাধা, নিষেধ, নাস্তিকতার মধ্যে বাস করেও বৈষ্ণব গ্রন্থাদি এঁরা কত ব্যাপকভাবে পাঠ করেছেন।

সারা পৃথিবী থেকে মায়াপুরে তখন প্রভুপাদের সাক্ষাৎ শিষ্য অনেক এসেছেন। তাঁদের নিয়ে রোজ তখন জি-বি-সি বা গভর্নিং বডি কমিশনের মিটিং চলছে। প্রচার এবং প্রশাসনের সুবিধার জন্য সারা পৃথিবীর ইস্কনকে অনেকগুলি সেকটরে ভাগ করা হয়েছে, আট দশটি মন্দির নিয়ে এক একটি সেকটর। এবং একজন করে জি-বি-সি মেম্বার তার অধ্যক্ষ। প্রভুপাদের জীবিত শিষ্যদের অনেকেই জি-বি-সি মেম্বার। রাশিয়ার কৃষ্ণভক্তদের নিয়ে তাঁদের সঙ্গে একটু কথা বলতে পারলে ভালো হয়, কিন্তু সুযোগ হচ্ছে কৈ ?

আপাতত কিছু কথা হলো আফ্রিকার অর্জুন দাসের সঙ্গে। অর্জুন দাস নাইজিরিয়ার লোক, কৃষ্ণভক্ত, পেশায় পুলিশ কমিশনার। মুণ্ডিত শীর্ষ মালা ফেরানো উচ্চপদে অভিষিক্ত পুলিশ অফিসারকে দেখে আমার হঠাৎ একটি অদ্ভুত কথা মনে এলো—বিকাশকলি বসু বা ধীরেন সাহারা কি কখনও এমনি করে মাথা মুড়িয়ে নিরামিষসেবী হয়ে কৃষ্ণনাম করার কথা ভাবতে পারবেন ·

পূর্বাশ্রমে অর্জুনদাসের নাম ছিল ফ্রান্সিস ওলে ফ্যালেম্যান, মেরিন এঞ্জিনীয়ারিংয়ে ইংলণ্ডের ডিগ্রীধারী। কৃষ্ণভক্ত হওয়াটা তাঁর পক্ষে আকস্মিক। নিরামিষ রান্নার প্রণালী সম্পর্কে ইস্কনের একটি বই পড়েই সিদ্ধান্তটি তিনি করেন। অবশ্য আগে প্রভুপাদের 'ভগবদগীতা এ্যাজ ইট ইজ' পড়েছিলেন। বেদবেদান্ত উপনিষদ ইত্যাদি পড়ে তাঁর মনে হয়েছিল, আধ্যাত্মিক জগতের দরজা তাঁর সামনে খুলে গিয়েছে।

অর্জুন দাস প্রত্যেক বছর সস্ত্রীক মায়াপুরে তীর্থ করতে আসেন। বিগত বছর আবার অমরনাথ, তিরুপতি, বৃন্দাবনও ঘুরে গিয়েছেন। 'তবে মায়াপুর হচ্ছে সেরা তীর্থ', অর্জুন দাস বললেন, 'এখানে খুব সহজে কৃষ্ণভক্তির উন্মেষ হয়।'

'রাশিয়ান ভক্ত। ওঁদের দেখে জীবন ধন্য হলো।'

ব্রাজিলের পরম গচ্ছিৎ মহারাজের সঙ্গেও অল্প স্বল্প আলাপ হলো। ঠাকুরের মঙ্গল আরতি, দরশন আরতিতে যোগদান, গীতা ভাগবতের ক্লাশ, জপতপ ইত্যাদিতে ঠাসা তাঁর মায়াপুরের স্বল্প সময়—সুতরাং অন্যের সঙ্গে কথা

বলার ফুরসুৎ মেলে কমই।

অন্য অনেক কৃষ্ণ-সন্ন্যাসীর মতো পেড্রো করডেরো ফেরাজও একরকম হঠাতই নিরামিষ সেবী হয়েছিলেন। সাধু সন্ন্যাসীরা তাঁকে খুব আকর্ষণ করতেন। রক্ষণশীল খৃষ্টান পরিবারে জন্ম হলেও পর্তুগীজ-ইতালীয় বংশোদ্ভব পেড্রো যুবা বয়সে যোগ শিক্ষা শুরু করেছিলেন। সাওপালো কৃষ্ণ ভাবনা সঙ্ঘের অধ্যক্ষ তাঁকে দীক্ষা দিয়ে নাম দেন পরম গচ্ছিৎ দাস। প্রভুপাদ মায়াপুরে তাঁকে দ্বিতীয়বার দীক্ষা দেন।

'কৃষ্ণ ভক্তির দিক দিয়ে ব্রাজিল এখন সোনার দেশ, পরম গচ্ছিৎ মহারাজ বললেন, 'সেখানে সাড়ে চারশ দীক্ষিত ভক্ত রয়েছেন; তবে অগণিত ব্রাজিলবাসী কৃষ্ণ ভাবনায় বিশ্বাস রাখেন—সুযোগ হলেই তাঁরা মন্দিরে আসেন, কৃষ্ণনাম জপ করেন, প্রসাদ পান।

'নাহ্, রাশিয়ান ভক্তদের মতো কোনো সরকারি বাধার সামনে কখনও তাঁদের দাঁড়াতে হয় না, ক্যাথলিক ধর্মের দেশ হলেও কোনো খৃষ্ট সঙ্ঘই তাঁদের কিছু বলে না, হুজ্জুৎ হামলা বলতে সেখানে কেউ কিছু করে না।'

'ব্রাজিলে আমাদের তিন তিনটি কৃষি খামার রয়েছে—প্রচুর ধান, গম, সব্জী ফলে, আদা লঙ্কা হলদি হয়, গরুগুলো অঢেল দুধ দেয়। সুতরাং প্রসাদ তৈরীতে কোনো অসুবিধাই নেই; প্রসাদের মধ্য দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের করুণা আশাতীত রকমে বিতরণ করি।'

'ব্রাজিলের ভক্তরা প্রতি বছর ভারতে তীর্থ করতে এসে ধুতি, শাড়ি, কুর্তা, ধূপশলা, আতর ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে কিনে নিয়ে যান। অবশ্য ব্রাজিলেও এখন এই সব তৈরী হয়, তবে ভারতের জিনিসগুলোই সবাই বেশি পছন্দ করেন।'

কৃষ্ণ ভাবনার প্রেক্ষিতে ব্রাজিলের এত সব কথা শুনতে আমার বেশ ভালোই লাগছে, কিন্তু নিজের কথা মহারাজ তেমন কিছু বলছেন না। তাঁর মনটা যেন খুব অন্তর্মুখী বোধ হচ্ছে, যেন একেবারে কৃষ্ণ ভাবনায় সম্পৃক্ত হয়ে আছে। তিনি নিজে এখন অপরকে দীক্ষা দানের ক্ষমতা পেয়েছেন। গুরু মহারাজোচিত সহজ গাম্ভীর্যটি তার সংস্পর্শে এসে বেশ

লক্ষ্য করা যায়। প্রভুপাদের কথায় ভক্তিতে তাঁর মনটা উদ্বেল হয়ে ওঠে—

'প্রভুপাদ আমাকে বৈকুণ্ঠমুখী দিব্য পথের সন্ধান দিয়েছেন, পরম গচ্ছিৎ মহারাজ বললেন, 'সেই পথে এগিয়ে চলাই আমার লক্ষ্য।'

'আমি তাঁকে কথা দিয়েছিলাম, সারা জীবন আমি তাঁর রচনাবলীর প্রচার করে বেড়াবো, জীবনের একটি মস্ত ব্রতের মতো। আমি এখন তাই করছি। ওপর থেকে সব লক্ষ্য করে প্রভুপাদ খুশি হচ্ছেন।'

সোভিয়েৎ কৃষ্ণভক্তদের নিয়ে তেমন কোনো আলোচনার সুযোগ না হলেও উপরোক্ত কথাগুলো তিনি বললেন আমার নানা প্রশ্নের জবাব হিসেবে। তবে রাশিয়ান ভক্তদের সম্পর্কে তাঁর ধারণা খুব মহৎ। 'ওঁদের কাছে আমাদের অনেক কিছু শেখবার আছে,' ব্রাজিলের মহারাজ মন্তব্য করলেন, 'কৃষ্ণ চেতনা আন্দোলনের ইতিহাসে বিপ্লবী সোভিয়েৎ ভক্তদের কথা সোনার অক্ষরে লিখিত হবে।'

শঙ্খ গেস্ট হাউসের ত্রিতলে তাঁর নিজের কক্ষে বসে কথা বলছিলেন ভক্তি-ভূষণ মহারাজ। গৌর পূর্ণিমা উপলক্ষে তিনি মায়াপুরে এসেছেন আর্জেন্টিনার বুয়েনার্স এয়ার্স থেকে। সেখানেই তাঁর বর্তমান নিবাস, যদিও পূর্ব-পুরুষ জার্মানীর লোক, জার্মানী ছেড়ে দক্ষিণ আমোরকার চিলিতে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

ভক্তিভূষণ স্বামী স্বল্পবাক, চটপটে, উপযুক্ত প্রসঙ্গের বাইরে কোনো কথাই বলতে চান না। 'আমার পূর্বাশ্রমের নাম? তা শুনে কি হবে,' ভক্তিভূষণ বললেন, 'তার সঙ্গে কৃষ্ণভক্তির তো কোনো সম্পর্ক নেই।'

'আমি তখন একজন আধ্যাত্মিক গুরু খুঁজে ফিরছিলাম,' কৃষ্ণ ভাবনা সঙ্ঘে যোগ দেবার প্রসঙ্গে ভক্তিভূষণ বললেন, শেষ পর্যন্ত দেখা পেলাম শ্রীল প্রভুপাদের।'

'প্রভুপাদ এই গ্রহের মানুষ নন, বৈকুণ্ঠের অধিবাসী,' দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রভুপাদের উদ্দেশে প্রণতি জানিয়ে ভক্তিভূষণ স্বামী বললেন—

'তিনি আমাকে সমস্ত পাপের পথ থেকে সরিয়ে এনেছেন, এখনও রক্ষা করে চলেছেন। এর চেয়ে বেশি কিছু বলবার আছে মনে করি না।'

সাদাসিধে একজন শ্বেতকায় সন্ন্যাসী ভক্তিভূষণের বিপরীত দিকে মেঝেয় বসে তখন হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করছিলেন। হঠাৎ তাঁকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে ভক্তিভূষণ বললেন, 'চোখের সামনে এখন যাঁকে ধ্যানস্থ দেখতে পাচ্ছেন, তিনি একজন অসাধারণ পুরুষ। পশ্চিম জার্মানীর লোক, এখন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। তাঁর জন্মভূমি পশ্চিম জার্মানী এখন পৃথিবীর সুদৃঢ়তম আর্থিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। তিনি নিজে অর্থ শাস্ত্রের এক মস্ত পণ্ডিত। দেশ বিদেশে তাঁর খ্যাতি।

'ভাবছেন, এসব কথা এই মুহূর্তে আমি কেন বলছি। কারণ আছে—ওঁর মতো লোক ও সব ছেড়ে সন্ন্যাস নিয়ে চৈতন্যভূমিতে এসে ধ্যান করছেন। মাটিতে বসে। পরমার্থ লাভ করতে।

'পাশ্চাত্যের লোক জাগতিক স্বার্থ চেতনা (মেটেরিয়ালিজম্) ছেড়ে অমৃতের সন্ধান করছেন। আর সেই অমৃতের দেশের আপনারা হাত বাড়িয়ে মেটেরিয়া-লিজম্‌কে খুব ব্যগ্র হয়ে গ্রহণ করছেন, সনাতন ধর্মাদর্শের দিকে খেয়াল প্রায় না রেখে। সত্যি আমাদের আফসোস হয়।'

'আমেরিকাকে দেখেছেন, এবার রাশিয়াকেও দেখছেন—সুপার পাওয়ার সচেতনতা ভুলে সোভিয়েৎ দেশের মূলত উচ্চ পর্যায়ের বুদ্ধিজীবী লোকই এখন কৃষ্ণভজনা করতে শুরু করেছেন। তাঁদের দুর্মর সাধনা, কারাবরণ এবং শেষপর্যন্ত তাঁদের কৃষ্ণভক্তির জয় জয়কার ইত্যাদি ইতিহাস সাধারণ্যে প্রচারিত হওয়ার প্রয়োজন আছে, তাতে বিশ্বের লোকের কৃষ্ণভক্তি বাড়বে। ভক্তিভূষণ কথাগুলো একদমে বলে ফেললেন।

আমি তখন কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম ; মেটেরিয়ালিজমের পথে ভারতের অগ্রগতি নিয়ে ভক্তিভূষণ স্বামীর মন্তব্য মনে কিছু অস্বস্তি এনেছিল! হঠাৎ মনে এলো পরম গচ্ছিৎ মহারাজের শেষ কথাটি ; তিনি বলেছিলেন ভারতের বৈষয়িক অগ্রগতি দেখে আমার দুশ্চিন্তা হয় না। আপন আত্ম-শক্তির জোরে এবং আধ্যাত্মিকতার আশীর্বাদে ভারতবর্ষ কখনও যে পথ হারাবে না সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ!

২২

শ্রীপাদ কীর্তিরাজ প্রভুর ইচ্ছা আর অনুমোদনের জন্যই সোভিয়েৎ কৃষ্ণ-ভক্তদের সঙ্গে আমার কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। আমার একান্ত ইচ্ছা, তাঁর নিজের কথা কিছু শুনি। কিন্তু বলার মতো তাঁর সময় কোথায়? বড়ই যে ব্যস্ত লোক।

কৃষ্ণভাবনা সঙ্ঘের রাশিয়ান সেকটরের তিনি অধিকর্তা ; কর্মস্থল সুইডেনে; সুইডেন থেকেই রাশিয়াসহ পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশের ইস্কন-সংগঠন তিনি পরিচালনা করেন, সংগঠনী কর্মপন্থা নির্ধারিত করেন। সোভিয়েৎ কৃষ্ণসন্নাসীদের কারামুক্তির তৎপরতা তিনি মূলত সুইডেন থেকেই চালিয়ে-ছিলেন।

গর্বাচভের রাশিয়ায় কৃষ্ণভক্তদের সুদিন এলো। এপ্রিলে
সোভিয়েৎ দেশে ইস্কন বৈধ ধর্মসঙ্ঘ বলে ঘোষিত হলো। কৃষ্ণভক্তরা কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন আরও কিছুদিন পরে। মুক্তির পরই তাঁরা ভারতে এলেন তীর্থযাত্রায়। তাঁদের ভারত ভ্রমণের
ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করার কাজে শ্রীপাদ কীতিরাজ ছিলেন পুরোভাগে। সুইডেনের কেন্দ্র থেকেই তাঁকে সব প্রচেষ্টা চালাতে হয়, কারণ রাশিয়ায় পদার্পণ করার হুকুম তাঁর ছিল না। হরিকেশ মহারাজ আর
তাঁকে রাশিয়া থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল।

প্রথম পর্যায়ে হপ্তাখানেক মায়াপুরে বসে থাকলেও সোভিয়েৎ কৃষ্ণভক্তদের সঙ্গে আমার কাজগুলো শেষ হয় নি, তাঁরা চলে গেলেন বোম্বেতে। বোম্বের কৃষ্ণভাবনা সঙ্ঘ তাঁদের অভ্যর্থনা জানাতে বড়ই ব্যগ্র ছিলেন। তাঁরা ফিরে এলে আবার আমাকে মায়াপুরে যেতে হলো। কিন্তু আসন্ন গৌরপূর্ণিমা উপলক্ষে মায়াপুরে তখন ভীষণ ভীড় ; গেস্টহাউসে স্থান প্রায়

নেই-ই। শেষপর্যন্ত কীর্তিরাজ প্রভু আর জয়পতাকা মহারাজ স্থান সমস্যার সমাধান করে দিলেন।

অসুবিধা অবশ্য আরও কিছু ছিল—রুশ ভক্তদের অনেকেই ইংরেজী জানেন না, তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা সব কিছু রাশিয়ান ভাষায়। ইংরেজী জানা আত্মানন্দ বিশ্বামিত্র, বৈদ্যনাথ প্রভুরা দোভাষী হিসেবে আমাকে বিস্তর সাহায্য করেন। কিন্তু তাঁদের ব্যাক্তিগত কাজের অন্ত নেই—আমার প্রয়োজনে সব সময় তাঁদের সাক্ষাৎ পাওয়াও সম্ভব নয়। অনেক সময় কীর্তিরাজ প্রভু নিজে তাঁদের ডেকে আনার ব্যবস্থা করতেন।

শ্রীপাদ কীর্তিরাজের কাজের গুরুত্ব, তাঁর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য বেশ অনুভব করতে পারছিলাম, কিন্তু কথা বলার সুযোগ আর হচ্ছিল না। অবশ্য তাঁর স্ত্রী হরিপূজা দেবী দাসীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল আগেই, রুশভক্তদের প্রথম কলকাতায় পদার্পণের দিনে—তাও আবার তাঁদের ভোজ সভায়। আমার ডান দিকে ছিলেন মরিশাসের এক কৃষ্ণভক্ত, বাঁয়ে সুইডেনবাসিনী আমেরিকান বধূ হরিপূজা দেবীদাসী—শাড়ি পরা তিলক কাটা দীর্ঘাঙ্গিনী মহিলা। তাঁর চোখে মুখে তখন এমন একটা আনন্দের রেশ ছিল, যেন তিনি নিজেও সোভিয়েৎ জেল থেকে মুক্তি পেয়ে এসেছেন। এবং তাঁদের মতোই যেন ভারত-পরিদর্শন করতে পেরে মনে খুশির অন্ত নেই। অবশ্য সোভিয়েৎ ভক্তদের মুক্তি ছাড়াও হরিপূজা দেবীর আনন্দ করার কিছু ব্যক্তিগত কারণ আছে। শ্রীপাদ কীর্তিরাজের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে তিনি বিস্তর সাহায্য করেছিলেন। সোভিয়েৎ কৃষ্ণভক্তদের কারা-মুক্তির জন্য তাঁর সব রকম প্রচেষ্টায়।

ভোজের পংক্তিতে ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান, অস্টেলিয়ান, আমেরিকান কৃষ্ণভক্ত অনেক ছিলেন, কিন্তু সবার সব নজর গিয়ে পড়েছিল সোভিয়েৎ কৃষ্ণভক্তদের ওপর, কারণ তাঁরা অতিথি, যেন দেশে একটা স্মরণীয় বিপ্লব ঘটিয়ে এইমাত্র তাঁরা ভারতে এসে উঠেছেন। শ্রীকৃষ্ণের দেশের মাটির স্পর্শ পেতে। তাঁদের আচরণে এমন একটি ভাবই ছিল, পুণ্যভূমি ভারতের পবিত্র মাটি স্পর্শের আবেগ ছিল।

ভিন্ দেশী এমন বিপুল সংখ্যক কৃষ্ণভক্তের সঙ্গে পাত পেতে বসে প্রসাদ গ্রহণের সুযোগ আমার আগে কখনও হয় নি। সম্মিলিত কণ্ঠে সবাই প্রথমে বললেন—'কৃষ্ণবড় দয়াময়,' পর পরই 'মহাপ্রসাদ কি জয়'। তারপর ভক্তি-ভরে প্রণাম নিবেদন করে সবাই প্রসাদ খাওয়া শুরু করলেন।

আমি আগে কিন্তু অবাক হয়ে ভাবতাম, অবঙ্গীয় ভারতবাসী, এবং রাশিয়ান, জার্মান, ফরাসী, ইংরেজ ইত্যাদি বিদেশী কৃষ্ণভক্তরা বাংলা কথাগুলো অত সহজে মনে কি করে রাখেন, অবলীলাক্রমে কি করে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদে গৌরভক্তবৃন্দ অক্ষরে অক্ষরে উচ্চারণ করে কীর্তন করেন। সবই কিন্তু পড়তে হয়েছে রোমান হরফে লিখিত বাংলায়। আসল কথা হচ্ছে, তাঁদের একাগ্রতা, তাঁদের ভক্তি। তাঁদের শ্রদ্ধা।

প্রভুপাদ বাঙালী। ধুতি পরতেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও বঙ্গসন্তান বলে ধুতিই পরতেন ; উত্তর প্রদেশে জন্ম হলেও শ্রীকৃষ্ণের সাজে সজ্জায় বঙ্গীয় ধরনের ধুতি রয়েছে। বিশ্বের লক্ষ লক্ষ কৃষ্ণভক্তকে দেখুন—সবাই বাঙালী কায়দায় ধুতি কিংবা শাড়ি পরা। শুধু তাই নয়, তাঁদের নিরামিষ পদগুলো পর্যন্ত বাঙালীদের মতো করে রান্না করা। কপির ঘণ্ট ছানার ডালনা, পায়েস ইত্যাদি সব কিছুই। ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে নিরামিষ রান্নায়, মিষ্টান্ন প্রস্তুত প্রণালীতে তো অনেক তফাৎ। অবাঙালী কৃষ্ণভক্তরাও, কিছু বাঙালী ধরনের রান্না করে শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ নিবেদন করেন।

প্রাদেশিক দুর্বলতা নিয়ে এতো কথা বলার উদ্দেশ্য আমার নয়। আসল ব্যাপার হচ্ছে, তাঁদের নিষ্ঠা এবং তন্ময়তা। মনে, প্রাণে, খাদ্যে, খাওয়ায়, পোশাকে আসাকে চৈতন্য মহাপ্রভুকে, প্রভুপাদকে হুবহু অনুসরণ করে চললে কৃষ্ণভক্তি সহজে আয়ত্ত হবে। এবং সেই ধারণা থেকেই তাঁদের এমন তন্ময়তা। তাঁদের মনের এই ভাবটিই আমি তুলে ধরতে চেয়েছি। আশ্চর্য নয়, ভালো করে ইংরেজী শিখতে হলে ইংরেজীতে কথা বলতে, ভাবতে, স্বপ্ন দেখতে হবে বলে কবি মধুসূদন মত প্রকাশ করেছিলেন।

খেতে খেতে হরিপূজাকে আমি বললাম, 'সুইডেনেও কি এমনি সব ডাল,

ভাত, সজী দিয়ে প্রসাদ তৈরী করেন?'

'নিশ্চয়' হরিপূজা বললেন, 'আমাদের একজন ভারতীয় পাচক আছে। আসলে মরিশাসের লোক। চমৎকার, নিরামিষ রাঁধে। শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন করে আমরা প্রসাদ পাই।'

'নিরামিষ খাওয়াটা অনেক পাশ্চাত্য লোকের এখন লাইফ স্টাইল,' আমি বলি—'সুইডেনে।'

'নিরিমিষ্যি ওরা রাঁধতেই জানে না,' আমার পুরো কথা না শুনেই হরিপূজা বলেন, 'মন্দিরে এসে ওরা বলে কি, আমরা শুধু খেতে জানি। প্রসাদ খেতে যা ভালো লাগে।'

সেদিনের প্রসাদে ছিল অনেক পদ, গোবিন্দ ভোগ চালের ভাত, ছোলার ডাল, ছানার ডালনা, মটর-পনির, শাকের ঘন্ট, আলুর দম, টম্যাটো চাটনি, পাঁপড়। সব শেষে মিষ্টি দই, পায়েস রাজভোগ।

'কলকাতার মিষ্টি আমার খুব ভালো লাগে,' হরিপূজা বলেছিলেন, 'আগে বার তিনেক এখানে এসেছি, এন্তার মিষ্টি খেয়েছি।'

'পাশ্চাত্যের অন্য লোকের কিন্তু আলাদা মত', আমি বলি—'তারা বলে রসগোল্লা রাজভোগ নো গুড—টু গ্রীজী, টু সুইট।

'ওদের কৃষ্ণভক্তি জাগ্রত নয়, নইলে অমন করে বলতেই না,' হরিপূজা হেসে বলেন, 'আমার ছেলেটার পাতে একবার তাকিয়ে দেখুন।'

সত্যিই তো সামনের সারিতে হরিপূজার ছেলের পাতে ডবল পায়েস, ডবল রাজভোগ ছিল। আর তার পাশের রাশিয়ান কৃষ্ণভক্ত অপর রাশিয়ানের রাজভোগ তুলে নিজের পাতে রেখে দিব্যি হাসছিলেন।

হরিপূজা দেবীদাসীর সঙ্গে আবার দেখা হলো মায়াপুরে। কীর্তিরাজ প্রভুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে। আমাকে চিনতে পেরে হরিপূজা হেসে বললেন, 'ঘন্টাখানেক পরে এলে ওঁর সঙ্গে দেখা না হয়েই যায় না।'

ভালোই হলো। ততক্ষণে ভক্তিরাঘব স্বামীর সঙ্গে কথাবার্তাগুলো সেরে নিতে আমি সুযোগ পেলাম।

ভক্তিরাঘব সোভিয়েৎ দেশের কেউ নন, রাশিয়ার জেলেও তাঁকে থাকতে

হয় নি, কিন্তু মুখ খুলে প্রথমেই বললেন, 'রাশিয়ানরা আমাদের আত্মার আত্মীয়। কৃষ্ণের জন্য ওঁরা জেল খেটেছেন, শত লাঞ্ছনা ভোগ করেও কৃষ্ণকে ত্যাগ করেন নি। তাঁরাই তো আসল ভক্ত। ওঁদের কাছেই সবাইকে কৃষ্ণ-ভক্তি শিখতে হবে।'

ভক্তিরাঘব স্বামীকে কুম্ভমেলাতেও আমি দেখেছিলাম। এলাহাবাদে ইস্কনের কুম্ভমেলা প্রকল্পে তিনি ছিলেন অন্যতম কর্তাব্যক্তি। নদীর শুষ্ক বালুচরে ধুলিকীর্ণ পরিবেশ, কাজের উৎকট চাপ, অসাধারণ ব্যস্ততার মধ্যেও সৌম্য শান্ত স্বামীজীকে কাজ করে যেতে দেখেছি, দিনে বা রাতের যে কোনো প্রহরে।

ভক্তিরাঘব জন্মগ্রহণ করেন ক্যানাডাতে। অটোয়ার রাস্তায় প্রচাররত এক কৃষ্ণভক্তর কাছে একদিন তিনি ভগবদগীতা এ্যাজ ইট ইজ বইটি কিনেছিলেন। তখন নাম তাঁর রিয়াল গ্যাগনন। পড়ার জীবন তখনও তাঁর শেষ হয় নি। নিজের শহর টিমিন্‌সের পাবলিক লাইব্রেরীতে ফ্রেঞ্চ-ক্যানাডিয়ান যুবক রিয়াল গ্যাগনন আর একখানা ভগবদগীতা আগেই পড়েছিলেন, লাইব্রেরীর পুস্তক তালিকায় ঐ গীতা সম্বন্ধে মন্তব্য করে লেখা ছিল 'বিশ্বের একশতটি শ্রেষ্ঠ বইয়ের অন্যতম'। রিয়াল কিন্তু ঐ গীতা পড়ে কিছুই বুঝতে পারেন নি।

প্রভুপাদের বইটি পড়ে গীতার জ্ঞান তাঁর একটু একটু করে বাড়তে থাকে। অটোয়ার কৃষ্ণভাবনা সঙ্ঘের মন্দিরে যাতায়াত শুরু করতেও তাঁর দেরি হয় না। অটোয়া মন্দিরের কৃষ্ণভক্তরা ছিলেন খুব শিক্ষিত, রুচিবান, এবং জ্ঞানী লোক। কৃষ্ণচেতনা সম্বন্ধে তাঁদের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শুনে, তাঁদের জীবনধারা এবং লক্ষ্য সম্বন্ধে খুঁটিনাটি বিচার বিবেচনা করে রিয়াল গ্যাগনন মঠে যোগ দিলেন। ছ মাসের মধ্যে তাঁকে যেতে হলো আমেরিকার ওয়েস্ট ভার্জিনিয়াতে। সেদিন ছিল জন্মাষ্টমী তিথি—স্বয়ং প্রভুপাদ তাঁকে এবং অন্য অনেককেই দীক্ষা দিলেন। নাম হলো তাঁর ভক্তি-রাঘব। ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার নাম কৃষ্ণভক্তদের কাছে তখন নব বৃন্দাবন।

'এই ক্ষীণতনু ক্ষণজন্মা মানুষটি বিপুলদেহী আমেরিকানদের মধ্যে একটি

বিরাট আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন, প্রভুপাদ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে স্বামীজী বললেন, 'তাঁর নিকটতম ভক্তরা তখনও অনুমান করতে পারেন নি, পৃথিবীতে কি অসম্ভব পরিবর্তনের সূচনা তিনি করে গেলেন।'
দীক্ষান্তে ভক্তিরাঘর চলে এলেন মায়াপুরে—'কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল ভাববারও সময় হলো না, ভক্তিরাঘব স্বামী বললেন, 'রাতারাতি মায়াপুর আধ্যাত্মিক জগতের প্রাণকেন্দ্র হয়ে পড়ল।'

তৃতীয়বার মন্দির আক্রান্ত হলে ভক্তিরাঘব স্বামী আহত হন, শেষপর্যন্ত তাঁর ডান পা কেটে বাদ দিতে হয়। সেই প্রসঙ্গ তুলতেই স্বামীজী বললেন, 'আমি এই আক্রমণের কোনো গুরুত্ব দিই নি ; ওদের মতো লোক আক্রমণ করবে না তো কি ! আমার গায়ে বোমা ফাটল, আমি প্রাণপণে চেঁচিয়ে কৃষ্ণনাম করতে লাগলাম।'
'কৃষ্ণভাবনা সঙ্ঘের এখন অনেক প্রসার ঘটেছে', আমার এক প্রশ্নের জবাবে স্বামীজী বললেন, 'আমাদের মূলধনটি কি জানেন? ভগবদগীতা। তাছাড়া অবশ্য বেদ, উপনিষদ, ভাগবতম, চৈতন্য চরিতামৃত তো আছেই।'
'বিজ্ঞানভিত্তিক এই গ্রন্থগুলি মহত্তম, বাস্তবতম জ্ঞানের খনি, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম দর্শন। আমাদের ধর্ম সঙ্ঘ তাই পৃথিবীর সব জাত, সব ধর্ম, সব আচার সভ্যতা মেনে চলা মানুষদের আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। খৃষ্টান, ইহুদী, মুসলমান বলতে কোনো মানুষই বাদ নেই।'
'এবারের কুম্ভমেলাতে এই মহা সত্যটি আমি উপলব্ধি করে এসেছি। মন্দির আক্রমণকারী দস্যুরা সনাতন ধর্মের ধ্বজাধারী আমাদের কোনো দিন কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না।'
নিত্যানন্দ প্রভু আর শ্রীজীব গোস্বামী একদিন গভীর আবেগে মায়াপুর নিয়ে আলোচনা করছিলেন। সত্যদ্রষ্টা ঋষির মতো নিত্যানন্দ প্রভু বলেছিলেন, 'মায়াপুরে একদিন সুবিশাল মন্দির তৈরী হবে, সারা পৃথিবীর লোক এসে এখানে কৃষ্ণনাম করবে।' শতাধিক বছর আগে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মাঝে মাঝেই নিত্যানন্দ প্রভুর ভবিষ্যৎ বাণীটির উল্লেখ করতেন। তাছাড়া এ সম্বন্ধে তিনি লিখেও ছিলেন।

'আহা। যেদিন ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রুশিয়ায়, প্রুশিয়ায়, ও আমেরিকায় তদ্দেশস্থ ভাগ্যবন্ত পুরুষ সকল নিশান, ডঙ্কা, খোল, করতালাদি লইয়া মুহুর্মুহু নিজ নিজ নগরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম, উল্লেখ পূর্বক হরিনাম কীর্তনের তরঙ্গ উঠাইবেন, সেদিন কবে হইবে! আহা। যেদিন একদিক হইতে বিজাতীয় শ্বেতবর্ণ পুরুষ সকল 'জয় শচীনন্দন কি জয়' এই রূপ ধ্বনি করত; প্রসারিত বাহু হইয়া অপর দিকে অস্মদ্দেশীয় ভক্তবৃন্দের সহিত আলিঙ্গন পূর্বক ভ্রাতৃ ভাব করিবেন, সেদিন কবে হইবে। ···যেদিন পবিত্র বৈষ্ণব প্রেমই সর্বজীবের একমাত্র ধর্ম হইবে···এবং সমুদ্রে নদীগণের ন্যায় সমস্ত ক্ষুদ্র ধর্ম অনন্ত বৈষ্ণব ধর্মে আসিয়া মিলিত হইবে, সেদিন কবে আসিবে।'

ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এই সব কথা আমরা একাধিকার উল্লেখ করেছি। অন্য অনেক কৃষ্ণ ভক্তের মতো ভক্তিরাঘব স্বামীও তাঁর কথা উল্লেখ করে বললেন, 'পৃথিবীর সব দেশের কৃষ্ণভক্ত আগেই মায়াপুরে এসে গিয়েছেন, এবার সব শেষে এলেন রাশিয়ানরা। সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবীই মায়াপুরে এসে পড়ল। নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, জীব গোস্বামীর ভবিষ্যৎ বাণী সার্থক হলো। ঐ দেখুন সবাই এবার বাহু তুলে গাইছেন জয় শচীনন্দন। জয় গৌর হরি—'

স্বামীজী কিন্তু নিজেই এই বলে গান ধরলেন।

শঙ্খ গেস্ট হাউসের ত্রিতলে উঠতেই কানে এলো, 'উঃ, আমি বড় ক্লান্ত, আমার কথা বলারও শক্তি নেই, আমাকে মাফ করতে হবে।'

কথা কটি কীর্তিরাজ প্রভুর; একজন সদ্য আগন্তুককে বলছিলেন—

এবার এলেন আর একজন, একই কথা কীর্তিরাজকে উচ্চারণ করতে হলো, চোখ মুখে তাঁর আরও ক্লান্তি ফুটে উঠল।

তারপর আর একজন, আরও একজন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবাইকেই বিদায় নিতে হলো। উপায় নেই—শ্রান্ত ক্লান্ত উদভ্রান্ত লোককে কি আর বিরক্ত করা যায়।

কীর্তিরাজ প্রভুর ব্যস্ততার আঁচ পেলাম। রাশিয়ান সেকটরের কর্তা হিসেবে

নবাগত সোভিয়েৎ ভক্তদের থাকা-খাওয়া-নিরাপত্তা, তাঁদের গীতা-ভাগবতের ক্লাশ, বোম্বে-পুরী-বৃন্দাবন যাত্রা, মায়াপুর-নবদ্বীপ-শান্তিপুর পরিক্রমা, সাংবাদিক সাক্ষাতকারের ঔচিত্য চিন্তা, অর্থ সংস্থানের ভাবনা, পৃথিবীময় অন্য ইস্কন-সেকটরের সঙ্গে যোগাযোগ, সব শেষে সোভিয়েৎ ভক্তদের মস্কো পর্যন্ত পৌছে দেবার ব্যবস্থাপনা। কোন্‌টি তাঁর না দেখলে চলে? তার ওপর আবার সাক্ষাৎ প্রার্থী!

আমাকে বসতে বলে হরিপূজা দেবী অদৃশ্য হয়ে গেলেন তারপর এক প্লেট প্রসাদ নিয়ে এসে আমার হাতে তুলে দিলেন। ফল-সন্দেশ-রসগোল্লা। গিরিরাজকে নিবেদিত প্রসাদ। কীর্তিরাজের ঘরে শ্রীকৃষ্ণ গিরিরাজ রূপে নিত্য পূজা পান। এমনকি মায়াপুরের এই সাময়িক আবাসে।

সুইডেন থেকে তাঁর গৃহদেবতাকে কীর্তিরাজ সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন—সুইডেনের বাড়িতে একলা ঠাকুর তো আর ভূখা পড়ে থাকতে পারেন না—অন্তত পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যা-হোক কিছু একটা নিবেদনের ব্যবস্থা না থাকলে কি করে চলতে পারে।

মায়াপুরে রোজই তো কৃষ্ণ পূজা, কৃষ্ণ কীর্তন নিয়মিত ভাবে চলছে। তবু আপন আপন উপাস্য দেবতাটির কথা কিন্তু সকলেরই স্মরণ থাকে—কেউ পার্থসারথি, কেউ বংশীধারী, কেউ বা গিরিরাজ রূপে তাঁর আরাধনা করেন, কীর্তিরাজের মতোই তাঁকে সঙ্গে সাথে নিয়ে ফেরেন, অবশ্য বাড়িতে কেউ দেখবার না থাকলে।

ডেভিড ডি কাপুককো একটি পোল্যাণ্ডীয় নাম; তাঁর ঠাকুর্দা ঠাকুমা পোল্যাণ্ড থেকে আমেরিকার পেনসিলভিনিয়াতে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তী প্রজন্মের লোক কিন্তু চলে আসে নিউজার্সিতে। ডেভিড চলে আসেন কলকাতায়, কলকাতা থেকে আগরবাতি, গুগ্‌গুল, পূজার আতর ইত্যাদি সারা পৃথিবীতে তিনি রপ্তানি করতেন। কলকাতায় প্রভুপাদের সঙ্গে পরিচয় হলে তিনি বললেন, 'পোল্যাণ্ডে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হোক, কীর্তিরাজকে পাঠানো হোক সেইখানে।'

দীক্ষার পর ডেভিডেরই নাম হয়েছে কীর্তিরাজ।

এই শুরু, পূর্ব ইউরোপে কৃষ্ণ ভাবনা সঙ্ঘের জয়যাত্রার শুভারম্ভ, যার পুরোভাগে রইলেন কীর্তিরাজ প্রভু নিজে। কৃষ্ণভাবনা সঙ্ঘের সঙ্গে তাঁর পরিচয় উনিশ বছরের, তার সাত বছর কেটেছে শুধু সুইডেনের মন্দিরে।

'এই সঙ্ঘের সংস্পর্শে এসে পরমার্থের পথে আমরা অনেক দূর এগিয়েছি, কীতিরাজ প্রভু প্রথমেই মন্তব্য করলেন, 'জাগতিক দৃষ্টি ভঙ্গি দিয়ে বিচার করলে তার হিসেব মিলবে না।'

'যুধিষ্ঠির নারদকে বললেন, কলিকে হাতের কাছে পাওয়া সত্বেও কেন বধ করা হলো, না?'

নারদ জবাব দিলেন—

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্ত সঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ ॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজাত মেখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তমাৎ ॥

—হে রাজন, কলিযুগ দোষের সমুদ্র, কিন্তু তার মধ্যেও একটি মহৎ গুণ আছে—কৃষ্ণকীর্তন করে মুক্তি লাভ করা যায়।

সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, দ্বাপরে অর্চনার মধ্য দিয়ে যা লাভ হতো, কলিতে শুধু কৃষ্ণনাম করেই তা লাভ হতে পারে।'

'সেই কলিযুগের এখন সুবর্ণ অধ্যায়,' কীর্তিরাজ প্রভু ভাগবতের উপরোক্ত শ্লোক উদ্ধৃতির কারণ হিসেবে বললেন, 'রাশিয়াতে কৃষ্ণভাবনা সঙ্ঘের ব্যাপারে সোভিয়েৎ নীতির কোনো প্রতিকূল পরিবর্তন ঘটবে বলে মনে করি না। প্রভুপাদের রচনার মাধ্যমে ওদেশের মাটির গভীরে কৃষ্ণচেতনা প্রোথিত। এবার অঙ্কুরোদ্গম হয়েছে—বিরাট বনস্পতিতে পরিণতি লাভ করতেও দেরি হবে না।'

রাশিয়ায় সরকারি নীতির সম্ভাব্য পরিবর্তনে কৃষ্ণভক্তদের বিপদ আসতে পারে। আমার প্রশ্নে তেমন একটি ইঙ্গিত ছিল। উপরোক্ত কথাগুলো তারই জবাব।

সোভিয়েৎ দেশে ইস্কনের বৈধতা স্বীকার, কৃষ্ণভক্তদের কারামুক্তি, তাঁদের

ভারত আগমন, রাজকীয় সম্বর্ধনা ইত্যাদি নিয়ে কেউ কেউ আমাকে এমন কথাও বলেছেন, যে আমেরিকার কাছে রাশিয়ার পরাজয় ঘটেছে, আমেরিকার চাপে পড়েই রাশিয়া হরেকৃষ্ণদের মুক্তি দিয়েছে। সব শুনে কীর্তিরাজ প্রভু মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে মৃদু হেসে বললেন, 'রাশিয়ায় যা ঘটেছে, তা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই ঘটেছে। সুতরাং আমেরিকার কাছে রাশিয়ার পরাজয়ের কোনো প্রশ্নই নেই। প্রেসিডেন্ট গর্বাচভ এমন একজন বুদ্ধিমান নেতা, যাঁর সম্বন্ধে প্রেসিডেন্ট রেগন হাসতে হাসতে বলেছেন, খাস আমেরিকায় ভোট প্রার্থী হলেও গর্বাচভ হয়তো তাঁকে হারিয়ে দেবেন।'

আরও একটি কথা আমাকে তুলতে হলো, সোভিয়েৎ কৃষ্ণভক্তরা বোম্বের ইস্কন মন্দির দর্শন করতে গেলে স্থানীয় কবি, সাহিত্যিক, শিল্পপতি, রাঘব বোয়াল ব্যবসায়ী এবং অবশ্য আপামর জনসাধারণ নানা উপহার নিয়ে এগিয়ে এসে তাঁদের অভ্যর্থনা করেছেন। এমন কি সিন্ধিয়া জাহাজ কোম্পানীর কর্ণধার শ্রীমতী সুমতি মোরারজীও সেই অভ্যর্থনায় যোগ দিয়েছিলেন। কলকাতায় এবং মায়াপুরে আমার মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তি ছাড়া আর তেমন কেউ নাকি আগ্রহ দেখান নি। বাঙালীদের পক্ষে অভিযোগটি কিছু মারাত্মক।

'বোম্বাইয়ের ব্যাপারটি হচ্ছে স্থানীয় মানুষের ক্ষণ-উচ্ছ্বাস', আমার কথাগুলো শুনে কীর্তিরাজ প্রভু হেসে বললেন, 'তাঁদের সেই উচ্ছ্বাসের অনুভূতি আসলে বিষয় বুদ্ধির তুলাদণ্ডে নিরিখ করা। কলকাতাসহ সারা বাংলার মানুষের হৃদয়ে রয়েছে অকুণ্ঠ ভালবাসা। চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত বলে সোভিয়েৎ কৃষ্ণভক্তরা কৃষ্ণচেতনা জাগ্রত মানুষ, বাংলার আত্মার আত্মীয়। বাহ্যিক উচ্ছ্বাস প্রকাশের অবকাশটা এখানে কোথায়!'

আর বেশিক্ষণ যেন কথা বলার উপায় থাকছে না, জনাকয়েক নাছোড়বান্দা দর্শনার্থী ইতিমধ্যে দাঁড়িয়ে পড়েছে। তাদের সঙ্গে কীর্তিরাজের একটু কথা না বললেই নয়।

আমি হরিপূজার সঙ্গে আবার কথা শুরু করলাম, তাঁর বলার মতো কথা

অনেক আছে, শুধু সময়টার বড়ই অভাব। চেকোশ্লোভাকিয়ার লুথারিয়ান লোক হিসেবে তাঁর পরিবারের সবার ধর্মের সঙ্গে নিবিড় যোগ ছিল। স্বামীর ঘরে সনাতন ধর্ম এবার তাঁর প্রাণের ধর্ম। এই ধর্ম এবং সঙ্ঘ-প্রশাসন নিয়ে এখন তাঁর অনেক কাজ। তার ওপর গৃহদেবতার পূজো আছে, মায় ধুতি-পাঞ্জাবী ধোবীর হিসাব পর্যন্ত আছে। রাশিয়ান হরেকৃষ্ণ-দের ভারতে আসার পর কীর্তিরাজের সচিব হিসেবে কাজটা যেন তাঁর ডবল হয়ে গেছে!

আঠারো বছর বয়স থেকে হরিপূজা সত্য সন্ধানে ঘুরে ফিরছিলেন। মেরিল্যাণ্ডের ওশ্যান সিটিতে প্রচাররত এক সৌম্য দর্শন কৃষ্ণ সন্ন্যাসীর কাছে একদিন তিনি ব্যাক-টু-গড হেড নামে পত্রিকাটি কিনলেন। সন্ন্যাসী তাঁর হাতে একটি ক্ষীরের বরফী দিয়ে বললেন, 'আমাদের মন্দিরে গিয়ে একদিন ঠাকুর দর্শন কর, প্রসাদ খাও। ভালো লাগবে। শান্তি পাবে।'

মন্দিরে গিয়ে সত্যি তাঁর ভালো লাগল। প্রসাদ খেয়ে মনে হলো, জীবনে এত সুস্বাদু খাবার কখনও খান নি। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্রীবিষ্ণুর মূর্তি দেখে হরিপূজা ভাবলেন, ইনি ভগবান না হয়েই যান না। আত্মীয় আশঙ্কা করলেন, তিনি মস্ত একটি ফাঁদে পা দিয়েছেন।

ইস্কনে যোগ দিয়ে হরিপূজা ব্যাপক পড়াশোনা শুরু করলেন। ভগবদগীতা এ্যাজ ইট ইজ পড়ে তাঁর মনে হলো, এমন সব কথা আগে তো কেউ কোথাও লেখেন নি।

প্রভুপাদ তাঁকে ডাকযোগে দীক্ষা দিয়েছিলেন—বিয়ে হয়েছিল তার আগেই। কীর্তিরাজের দীক্ষা স্বয়ং প্রভুপাদের কাছে।

'নিউ ইয়র্কে মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে প্রভুপাদ এসেছিলেন', হরিপূজা বললেন, 'খুব কাছে থেকে তাঁকে দেখে মনে হলো, তিনি যেন এই পৃথিবীর মানুষ নন, ধূলির ধরণীর লক্ষ্যযোজন দূরের দেব লোক থেকে আমেরিকায় এসেছেন।'

'আমি তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লাম।'
